ইসলামে নারীর অধিকার

সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা

বাণী প্রকাশ
এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশক :

এস, এম, আখতার হোসেন
বাণী প্রকাশ
এ ১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী ২, ১৯৬৫

মুদ্রক :

শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার মান্না
বিশ্বকর্মা প্রেস
২/১এ, আশুতোষ শীল লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

আমার জান্নাত বাসিনী আম্মা

সাইয়্যেদা কানিজ বতুল কে

যিনি ধৈর্য্য, শিক্ষা ও ইসলামী ভাবধারার

এক মূর্ত চরিত্র।

।। নিবেদন ।।

করুণাময় কৃপাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি :

অবশেষে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এই গ্রন্থ শেষ করতে পারায় কৃতজ্ঞতা জানাই মহান আল্লাহ্‌র দরবারে, যিনি সকল প্রশংসার অধিকারী।

প্রায় দু দশক আগে যখন আমি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা অনার্স অধ্যয়নরতা তখনই 'ইসলামে নারীর অধিকার' প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন অনুভব করি। জীবনে চলার পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকেই এ গ্রন্থ রচনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে, রাজনৈতিক ও কর্মজীবনে বহু পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার ঘটেছে। ইসলাম সম্পর্কে অধিকাংশেরই দেখেছি একটা তাচ্ছিল্যের মনোভাব। ইসলামকে জানার তেমন কিছু নেই, ও একটা গোঁড়া মৌলবাদী ব্যাপার! নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখেছি মুসলমান নারীকে ইসলামের বাতাবরণ থেকে মুক্ত করে আনা এদেশের নারী আন্দোলনের একটা মহান কর্তব্য। মনে করা হয় ভারতের মুসলিম নারীজীবনের শোষণ-বঞ্চনার পিছনে ইসলাম ধর্মই দায়ী। দেখেছি ইসলামের অসাধারণ বৈপ্লবিক ভূমিকা ও তার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক চেতনার স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের অনুশীলন তো দূরের কথা সামান্যতম ধারণাও নেই। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এম. এন. রায় এ সম্পর্কে যথার্থ উক্তি করেছেন "পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মত ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে ঘৃণার ভাবও পোষণ করে না।"[১] তাঁর এই উক্তি যে কত সত্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পেয়েছি। গৃহাঙ্গণ ছেড়ে বহির্জগতের উন্মুক্ত চেতনার আলোকে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বেরিয়ে একটা জ্ঞান যথার্থ হয়েছিল যে এদেশের অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিতে আমি যে ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে এসেছি সেটা একেবারে পরিত্যাজ্য—গোঁড়া, সংকীর্ণ, মৌলবাদী ব্যাপার। জেনেছি আমার ঐ চারপাশের সুসংস্কৃত মানুষদের দৃষ্টিতে ইসলাম মানে বোরখা, ইসলাম মানে

---

১. এম. এন. রায়—ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান।

দাড়ি, টুপি, লুঙ্গি, ইসলাম মানে অশিক্ষা, তিন তালাক, চার বিয়ে ইত্যাদি। এই রকম চিত্র যার তাকে পরিত্যাগ করে যথার্থ আধুনিক মনস্ক হওয়ার মধ্যেই আছে প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এই ভ্রান্ত ধারণার বেড়াজালে জড়িয়েই তাঁরা ইসলামকে জানা থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ যে সময় গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতায় ঘূণ ধরেছে —জনসাধারণের জীবন যখন এক চরমতম দুর্দিনের মুখোমুখি সেই সময় ইসলাম নিয়ে এসেছিল এক আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাঁর অনুসারীগণ একদিকে ভারতের সীমানা থেকে অন্যদিকে আটলান্টিক সাগরের সীমা পর্যন্ত ইসলামের বিজয় পতাকা তুলে ধরেছিলেন। ইসলামের এই অভূতপূর্ব জয়যাত্রার পিছনে ছিল তার বৈপ্লবিক আদর্শ। নৈতিকতাপূর্ণ নূতন জীবন দর্শনের বাস্তব রূপ দিতে ও নূতন ভাবধারার আলোকে উজ্জ্বল এক বলিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য ইসলাম ধ্বংস করেছিল অত্যাচার অনাচারে জরাজীর্ণ, অন্ধ কুসংস্কারে দীর্ণ ক্ষতবিক্ষত পুরাতনকে। তৈরী করেছিল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে পালনীয় একটি সুশৃঙ্খলাময় জীবনবিধান। ইসলামের এই অবদানের কাছে পৃথিবীর উন্নত আধুনিক সভ্যতা যে সর্বাংশে ঋণী ভারত ব্যতীত সর্বত্র তা স্বীকৃত। ইসলামের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও অধ্যাত্ম চিন্তা ছাড়াও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ও সমাজদর্শন ব্যতীত কিছু নয়। সে দর্শনকেও এদেশের পণ্ডিতসমাজের জানতে অনীহা ও ঘৃণার ভাব কেন সেটাই বিস্ময়কর।

এতো গেল এদেশের বৃহত্তর সমাজ মানসের চিত্র। নিজ সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত সাধারণ গ্রাম ও শহরবাসী মানুষের মধ্যে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আর এক বিস্ময়কর অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে আমার সামনে। সেখানে দেখেছি ইসলামের বৈপ্লবিক আদর্শ সম্পর্কে কি সীমাহীন অজ্ঞতা! মুসলমানদের অধিকাংশই ইসলামের যুক্তিবাদ-নির্ভর জীবন বিধান ও ইসলামের বৈপ্লবিক আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের কোন খবর রাখেন না। আর তাই তাঁদের জীবনাচরণের ক্ষেত্রে পদে পদে লঙ্ঘন করে যান ইসলামী আদর্শকে। ফলে এদেশে নারীর পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারকে

পুরুষ সমাজ নানা কৌশলে হরণ করেন, পাত্রপক্ষ বিভিন্নভাবে ইসলামী নীতিবর্জিত বরপণ চাপিয়ে দেন কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় পিতামাতার উপর। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি বিসর্জন দিয়ে যে মুসলমান পুরুষ স্ত্রীর অধিকারকে ছিনিয়ে নেন, তিনিই আবার কোরআনের দোহাই দিয়ে একাধিক বিবাহ, যথেচ্ছ তালাক সমর্থন করেন। এদেশের অধিকাংশ পুরুষ মানসিকতা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকার আচরণে অভ্যস্ত। যে ইসলাম মধ্যযুগের সর্বব্যাপী অন্ধকারে নারীকে উচ্চ শিক্ষার উদার প্রাঙ্গণে অভিষেক করেছিল, যে ইসলামের মহানবী সাধনা-আরাধনা, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমানাধিকার ঘোষণা করেছিলেন মুক্ত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে, তাঁরই অনুসারীর অধিকাংশই এদেশে নারীর সামনে সেই জ্যোতির্ময় দরজাটাই বন্ধ করে দিয়েছেন। এদেশের মুসলমান সমাজের জীবনাচরণ ও ইসলামী আদর্শের সঙ্গে পার্থক্য দুস্তর। এর একটি জ্বাজ্বল্য প্রমাণ এদেশে ঈদ, জুমআ কিংবা অন্য নামাযের জামাআতে শরীক হওয়ার অধিকার নারীর নেই। অথচ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মহিলাগণকে বিশেষভাবে ঈদের জামাআতে যোগদান করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বোখারী শরীফের হাদিস থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ ছিল সব বয়সের মেয়েদের নিয়ে ঈদের জামাআতে যোগদান করার। আর একটি হাদিস থেকে জানা যায় জামাআতে যোগদানের জন্য উপযুক্ত আচ্ছাদন কোন মহিলার না থাকলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কারও কাছ থেকে তা ধার করেও জামাআতে আসতে বলেছেন। বোখারী শরীফের আর একটি হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ঈদের নামায শেষে মহিলাদের কাছে গিয়ে হযরত বেলালের মারফৎ চাঁদা আদায় করতেন। আজও মহিলাগণ বহু পথ পাড়ি দিয়ে হজ যাত্রা করেন ও লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষ একত্রে কাআবা ঘর তাওয়াফ করেন, মিনা ও আরাফাতে অবস্থান (ওকুফ) করেন, মদিনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাযার যিয়ারাত করেন। কিন্তু নিজ দেশে আপনজনদের সঙ্গে নামায পড়ার অধিকার তাঁদের নেই। হাদিসে আছে একবার হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এশার নামাযে দেরী করে এলে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে জানালেন যে মহিলা ও

শিশুরা অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আরও উল্লেখ আছে যে মহিলাগণ চাদর গায়ে দিয়ে ফজরের জামাআতে যোগ দিতেন, নামায শেষে অন্ধকার থাকতে থাকতেই বাড়ী ফিরে যেতেন। বোখারী শরীফে স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে, "আল্লাহ্‌র দাসীদের মসজিদে আসতে বাধা দিও না।"

ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ নামাযের জামাআতে দাঁড়ানোর যে বিধি রচনা করেছেন তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ইমামের পরেই পুরুষদের, তারপর বালকদের এবং শেষভাগে মহিলাদের সারি থাকবে। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় মহিলাদের জামাআতে অংশ গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে ইসলাম সম্মত।

মক্কা, মদিনার মসজিদে আজও মহিলাগণ নামায পড়েন। মসজিদে নবাবীর একটি দরজার নামই **বাবুন্নেসা** অর্থাৎ-মহিলাগণের প্রবেশদ্বার। কিন্তু আমাদের এখানে মহিলাদের জন্য ঈদের জামাআতেও মসজিদের দরজা রুদ্ধ। মুসলমান নারীর তো সর্বাগ্রে এই অধিকারটি পাওয়ার দাবি তোলা উচিত। নামাযের জামাআত শিক্ষালাভের এক বিরাট ক্ষেত্র স্বরূপ। এখানে মহিলাগণ নিজেদের সমস্যার আদান প্রদান করতে পারেন, বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্না মহিলাদের সাহচর্য লাভের সুযোগ পেতে পারেন। নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য মসজিদের পাঁচ ওয়াক্তের সম্মেলন এক বিরাট সুযোগ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে মুসলমান সমাজের চিত্র অনেকটাই পাল্টেছে। কিন্তু নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য সর্বোপরি ইসলামের বিজ্ঞান ভিত্তিক জীবনাচরণের মূল স্বরূপ জানার আকাঙ্ক্ষা কারও মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। আজ যে মহিলাগণ শিক্ষালাভে সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যেও নিজ ঐতিহ্যকে জানার এই ক্ষুধা নেই। ফলে প্রতিনিয়তই তাঁদের আকৃষ্ট করে পাশ্চাত্যের বাঁধন-হারা স্বাধীনতার হাতছানি। তাদের জীবনযাত্রাই এঁদের কাছে স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক এ আত্মবিস্মরণ। নিজ সমাজ, ধর্ম, অতীত ইতিহাসকে যাঁরা জানলেননা, তাঁদের অন্যকে জানার দাবীতো ঔদ্ধত্যের নামান্তর। যে নিজেকে জানে, নিজেকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই পারে অপরকে জানতে, সেই পারে অন্যকে সম্মান দিতে। বর্তমানের প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান নারীপুরুষের পড়া উচিত মধ্যযুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। দেখতে পাবেন মধ্যযুগে সর্বব্যাপী অত্যাচার আর

কুসংস্কারের দানবীয় মুষ্টি যখন অসহায় মানুষকে পিষে মারছে, অসহায় নারীজাতির গুমরানো কান্না সমগ্র ইউরোপের আকাশবাতাসকে ভারি করে তুলেছে—সেই বিশ্ব পটভূমিতে উষর মরুর বুকে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী কী অনাবিল স্বাধীনতার প্লাবন এনে ধৌত করেছিলেন সমস্ত অত্যাচার, অনাচার আর কুসংস্কারের বদ্ধ বালুকারাশি। এতই বিজ্ঞানভিত্তিক এতই ভারসাম্যময়' সর্বকালোপযোগী সে জীবনবিধান যে তার থেকে অপসারণ কেবল ডেকে আনতে পারে মানবসমাজ ধ্বংসকারী এইড্‌স্-এর মত বিভীষিকা, আর কিছু নয়। এই মহাসত্যটিকে আজ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে ইসলামী আদর্শ-বিরোধী পাশ্চাত্ত্য জীবন-যাপনের উদ্দাম মানসিকতা।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা নারীর সমাজ-জীবনে সংকট বহুমুখী। যে সন্তানকে লালন করতে গিয়ে তাঁরা নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নীরবে হত্যা করেন সেই সন্তানও বড় হয়ে পুরুষ হয়ে, তাঁকে করুণা করে। এই ট্রাজেডি নিয়েই আমাদের নারীদের সুস্থ জীবনবোধ আর জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে হয়। নারীর হাতে ইসলাম যে দুর্মূল্য অধিকারগুলি প্রদান করেছিল সেগুলি সম্পর্কে নিজে সচেতন হতে হবে—অন্যকে সচেতন করতে হবে, দরকার হলে নিজ অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে—নিজেদেরকেও গড়ে তুলতে হবে ইসলামসম্মতভাবে সভ্যতা, শালীনতা ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি করে। উচ্ছৃঙ্খলতা কোন নারীকে মহিমা দান করেনা, মহিমা দান করে আত্মসম্ভ্রমবোধ। আত্মসম্ভ্রমবোধকে আশ্রয় করেই প্রয়োজনে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।

আমার সমস্ত চেতনা, অনুভূতি ও সর্বোপরি যুক্তিবাদী মানসিকতা দিয়ে যে সত্যকে অনুধাবন করতে পেরেছি, তাকেই তুলে ধরতে চেয়েছি মুসলমান ও অমুসলমান সকল শ্রেণীর অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে। ইসলামকে না জানার জন্য দায়ী অমুসলমান যতটা, তার থেকে অনেক বেশী দায়ী মুসলমান। আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে আমি এ গ্রন্থে সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞ আলেম সমাজের পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে একে আরও সমৃদ্ধ করার বাসনা রইল।

বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত এই বইটি লিখতে গিয়ে যাঁর কথা কোনো

মুহূর্তেই ভুলতে পারিনি তিনি আমার জান্নাতবাসিনী আম্মা। তাঁর, অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তীব্র শিক্ষানুরাগই আমাকে লেখনী ধরার মত যোগ্যতা দান করেছে। আর এই যোগ্যতা লাভের পিছনে যাঁর প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা আমাকে বিভিন্ন ভাবে বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে তিনি আমার আব্বা। আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্তরালে রয়েছে তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগ ও তিতিক্ষা। আমার সাফল্যের সকল পুরস্কার তাঁদেরই প্রাপ্য।

এই গ্রন্থ রচনার পিছনে যাঁর নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ সাহচর্য বিশেষভাবে সক্রিয় তিনি আমার স্বামী এস. এম. আখতার হোসেন। তিনিই পাণ্ডুলিপি সংশোধন, পরিমার্জন, পুনঃসংস্থাপন ও তথ্য সরবরাহ ও সংযোজন করে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। তাছাড়াও তিনি বিষয়টির উপর এক ধারাবাহিক 'প্রসঙ্গ কথা' লিখে দেওয়ায় বিষয়টি আরও তথ্যানিষ্ঠ হয়েছে। তাঁর ঋণ অনস্বীকার্য। এছাড়াও সংসারের ব্যস্ততার মাঝে নানা ভাবে সাহায্য করে লেখার সময় করে দিয়েছে যে সে আমার কন্যা রায়হানা বেগম।

ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, হাদিস ও কোরআনের বিশাল অবদানের জগতে আমার এমন করে প্রবেশের সুযোগই হয়ত হতোনা যদি আমার বাড়ীতে ইসলামী গ্রন্থরাজির সমৃদ্ধ সংগ্রহ না থাকত। এ গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশ বিদেশের যে সকল মনীষীর গ্রন্থরাজির সাহায্য নিতে হয়েছে তাঁদের সকলকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা।

শিক্ষিত মুসলমান নারীসমাজ যাঁদের জানা দরকার ইসলাম কোন্ সুস্থ স্বাধীনতার দুয়ার তাঁদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, তাঁরা যদি এ গ্রন্থ থেকে নিজেদের অবস্থানের পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন তবেই আমার পরিশ্রম, আমার আবাল্যের স্বপ্ন সার্থক হবে।

সবশেষে এই গ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য সর্বস্তরের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পরামর্শ ও সংশোধনীর আবেদন রাখছি ও অসাবধানতা বশতঃ ভুল ত্রুটির জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা

ইসলামে নারীর অধিকার

সূচীপত্র

॥ প্রসঙ্গ-কথা ॥

বিগত কয়েক দশক ধরে মহিলাদের সম্পর্কে ইসলামী ব্যক্তিগত আইন-গুলো নিয়ে সারা দেশে দারুণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতের জনসাধারণের বিশেষতঃ মুসলমানদের ইতিহাস-অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। ফলে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের কাছে সম্মান ও আত্মমর্যাদা হারিয়ে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত হচ্ছেন। নিজ আদর্শের স্বপক্ষে মুখ খুললে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে অপদস্ত অপমানিত হচ্ছেন। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে এই উপমহাদেশে মুসলমানরা কেবল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন তাই নয়, তাঁরা এদেশের মাটিকে মানুষকে, সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছেন, মিলেছেন মিলিয়েছেন। এই ভূভাগে এসে এখানকার জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন সেই ছয় শতাব্দী থেকে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' দেওয়া আর নেওয়ার সেতুবন্ধনের মধ্যে গড়ে তুলেছেন এক মহান সংস্কৃতি। নিজ নিজ স্বকীয়তা নিয়েই গড়ে উঠেছে ভারতবাসী। একের মধ্যে বহুর মিলনে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতি। ভারতকে লুণ্ঠন করে ভারতের মানুষকে শোষণ করে এঁরা পালিয়ে যাননি। ভারতকে ভালোবেসে থেকে গিয়েছিলেন এর স্নিগ্ধছায়ায়। সেই ভালোবাসার কাব্যরূপ পেয়েছিল আমীর খসরুর লেখনীতে, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার প্রেমে, দানে। "দেশকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ" ইসলামের এই আদর্শকে মেনে বাবর, হুমায়ুন ভারতকে নিজ মাতৃভূমির আসনে বসিয়েছিলেন বলেই তাঁদেরই ভবিষ্যৎ বংশধর বাহাদুর শাহ্ স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে জীবন দিয়ে পরিশোধ করেছিলেন দেশ ও জাতির ঋণ।

এইভাবে ইসলাম প্রচারের সময়কাল থেকে এদেশে একটা সম্মানিত জীবনধারা গড়ে উঠেছে। এদেশে একজন আর একজনের সংস্কৃতিকে সম্মান করেছে, প্রণতি জানিয়েছে। বহু জনগোষ্ঠী ইসলামের মহান সাম্যমৈত্রী নীতির কাছে আত্মনিবেদন করেছে—ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার অধিকাংশই আদি ভারতবাসী। এরা বহিরাগত নয়—ভারতের

মূল জনগোষ্ঠীরই অংশ। এই বোধটাই আজও বহু ভারতবাসীর নেই। বিশেষতঃ বহিরাগত আর্য বংশোদ্ভূত বর্ণহিন্দুরাতো ভারতের মূল জনগোষ্ঠীর মুসলিম ধর্মাবলম্বী অংশকেই বহিরাগত হিসেবে আখ্যায়িত করে ফেলেছেন নির্দ্বিধায়। আর তাই আজ ভারতের আকাশবাতাস একে অপরের প্রতি সন্দেহের বিষ বাষ্পে আচ্ছন্ন। একে অপরকে জানার ও চেনার চেতনা থেকে সরে আসছে। মুসলমানদের বিদেশী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এই জানা চেনার পরিপূর্ণতা ঘটলেই কিন্তু এমনটি আর হয় না।

মহিলাদের অবস্থান নিয়েই কি কম গোলযোগ। এমন ধারণা জনমানসে দৃঢ়প্রোথিত যে মুসলিম মহিলাদের জীবনই কেবল নির্যাতনে পরিপূর্ণ এবং এর জন্মদাতা হলো ইসলাম ধর্ম। ইসলামী নীতিই ভারতীয় মুসলমান মহিলাদের বঞ্চনার জন্য দায়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গী কত ভ্রান্ত ধারণার উপর দাঁড়িয়ে তা বুঝতে হলে আমাদের জানতে হয় সভ্যতার ইতিহাসকে। এই গ্রন্থের **প্রসঙ্গ-কথা** বলতে গিয়ে তাই ফেলে আসা যুগগুলোর একটা চিত্র তুলে ধরতে হচ্ছে। যুগে যুগে দেশে দেশে নারীদের অবস্থান, মর্যাদা ও অধিকারের স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ইসলামের দেওয়া নারীর অধিকারের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব। আমি বইটির আলোচ্য বিষয়গুলির ভিত্তিতে সমগ্র সমস্যাকে দুভাবে বিশ্লেষণ করে তারই একটা প্রসঙ্গ-কথার অবতারণা করেছি। প্রথমতঃ প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে নারীসমাজের প্রকৃত চিত্র। যথাঃ ১. **'যুগে যুগে বিশ্ব-নারীর সামাজিক অবস্থা ও ইসলামী নীতির অবদান'**—এই অংশে স্পষ্ট হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও মর্যাদা। ২. **'বর্তমান যুগে নারী নির্যাতনের স্বরূপ ও নারী মুক্তির ভাবনা'**—এতে স্পষ্ট হয়েছে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হলেও কত বিচিত্র পথে নারীর নির্যাতন চলছে তারই একটা চিত্র।

১. যুগে যুগে বিশ্ব-নারীর সামাজিক অবস্থা ও ইসলামী নীতির অবদান :

আদিম সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও সমাজে মেয়েদেরই ছিল প্রাধান্য। ভবঘুরে জীবন থেকে মানুষকে মুক্তি

দিয়ে নারীই গড়ে তুলেছিল প্রথম বাসগৃহ। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উদ্ভাবন ঘটেছিল নারীর হাতে। নিজেদের প্রস্তুত করা এই সব দ্রব্য নারী বিনিময় করত, বাণিজ্যের জন্য স্থানান্তরে নিয়ে যেত, বাজারের নিয়মকানুন তৈরী করত। আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি দেশে আজও উপজাতিদের ছোটবড় বাসগৃহগুলি তাঁদের মেয়েরাই তৈরী করে। লিডিয়ার কারুকার্যময় বাসগৃহগুলি বেশীর ভাগ অংশ মহিলা শিল্পীগণ তৈরী করেন। আদিম যুগের নারীগণ চামড়ার কাজ ও সূচীশিল্পে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। রেড ইণ্ডিয়ান, মধ্যএশীয় ও তাতার উপজাতিদের মেয়েরা চামড়ার উপর শুধু অপূর্ব কারুকার্যই করতনা, এই কারুকার্য খচিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও তৈরী করত। বৃক্ষের তন্তু দিয়ে তারা অপূর্ব বস্ত্র বয়ন করত। আধুনিক যুগে মণিপুরী বস্ত্র শিল্পে তাদের নারীদেরই আধিপত্য এই ঐতিহ্যের সাক্ষর বহন করছে। ঝুড়ি বুনন ও মৃৎশিল্প তৈরীর গোটা শিল্প কৌশলটি আদিম যুগে মেয়েরা আবিষ্কার করেছিল ও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। পটারি শিল্প উদ্ভাবন করেছিলেন একজন নারী। আদিম যুগে এই বৃত্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে নারী-শিল্প হিসেবে পরিগণিত হতো। মৃৎশিল্পের উপর বিশ্বের সর্বত্র মেয়েদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। পরবর্তীকালে এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে পুরুষগণও মেয়েদের সঙ্গে যোগ দেয়।

যেহেতু আদিম নারী প্রত্যেকটি ব্যবহার্য দ্রব্যের উদ্ভাবক ও প্রস্তুতকারক ছিল সেজন্যেই নারীই হয়ে উঠেছিল বাজারে বিনিময় প্রথা ও বাণিজ্যের প্রধান নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রথম রূপরেখা তৈরী করেছিল নারী, নারীই ছিল তার পরিচালিকা। আফ্রিকা, উঃ আমেরিকা, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, বার্মা এবং অন্যান্য বহু দেশের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ছিল নারীর তত্ত্বাবধানে। আজও কোথাও কোথাও সেই ঐতিহ্য চলে আসছে। নারী বাসস্থানের চারপাশের বনজঙ্গল থেকে শাকসবজী, লতাগুল্ম, মূল ইত্যাদি আহরণ করতে করতে এদের ওষধিগুণ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিল। এইভাবে মেয়েদের মধ্যেই জন্ম হয়েছিল প্রথম চিকিৎসকের। মেয়েদের নরম পেলব আঙুল ক্ষতস্থান সেলাই ও ড্রেসিংয়ের জন্য এত উপযুক্ত ছিল

যে নারীই হয়েছিল বিশ্বের প্রথম শল্য চিকিৎসক। আদিম যুগে নারী শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্পক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ভারতের বৈদিক যুগে দার্শনিক ও কবি হিসেবে বহু নারী খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আরবের নারীগণও শিক্ষাদীক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন। খানসা কবি হিসেবে সর্বোচ্চ আসন লাভ করেছিলেন। কাব্য সমালোচক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন উম্মে জয়নাব।

একমাত্র লড়াই ও যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে একেবারে অনুপস্থিত কখনই ছিলনা। সেবাশুশ্রূষা, প্রয়োজনে যোদ্ধ হিসেবেও নারী যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়েছে—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। গোটা আদিম সমাজব্যবস্থায় সভ্যতা ও জীবনাচরণের অগ্রগতির ক্ষেত্রে মেয়েদেরই প্রাধ্যন্য ছিল—পুরুষের নয়। পরিবার ও সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের চেয়ে বহু উঁচুতে। স্বাভাবিক মাতৃসুলভ কোমলতা, স্নেহ-মমতা, ও চরিত্র মাধুর্য্যের জন্য নারী শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পুরুষের চেয়ে উন্নতি করেছিল। পৃথিবীতে যে প্রথম বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিল সে নারী, নারীই আবিষ্কার করেছিল বীজ থেকে গাছের জন্মরহস্য, প্রথম শিল্পের বীজ যে বুনেছিল সেও নারী। নারীই নিরবচ্ছিন্ন কঠোর শ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছিল শান্তির নীড়—গৃহ। E. Reclus যথার্থই বলেছেন, "মানুষ যে মানুষ হতে পেরেছে, সেই মানবগোষ্ঠীর পুরোটাই নারীর কাছে ঋণী, সেইই গৃহের প্রতিষ্ঠাত্রী, শিল্পের আবিষ্কর্ত্রী।" তিনি আরও বলেছেন, "নারীই সভ্যতার আদি রূপকার।" ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "নারী জ্ঞানী ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে পারে কিন্তু পুরুষ নারীকে পরাজিত করে ফেলে।"

সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল যে নারী—সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানবিচ্যুতা হতে থাকে। যে পুরুষকে নারী গর্ভে ধারণ করেছিল, লালনপালন করেছিল, স্নেহমায়ামমতা আর শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছিল সভ্য হিসেবে, সেই পুরুষই সভ্যতার জন্মদাত্রী নারীর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল সব ক্ষমতা—করেছিল গৃহবন্দিনী। নারীকে নিষ্ক্রিয় করে তারই আবিষ্কৃত প্রতিটি বিজ্ঞান, তারই উদ্ভাবিত নির্মাণকৌশল নিয়ে পুরুষ শুরু

করেছিল আপন আধিপত্যের সূচনা এইভাবে পুরুষের শারীরিক শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছিল নারীর ধীশক্তি। পুরুষ নিজ প্রভুত্বের প্রয়োজনে নারীর শিক্ষাদীক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। করেছিল গৃহে অন্তরীণ। এডওয়ার্ড ওয়েস্টমার্ক বলেছেন, "সভ্যতার অগ্রগতি নারীর অবস্থানের উপর অশুভ প্রভাব ফেলেছিল।" প্রভুত্ব করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পুরুষ তার পাশবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিল। নারী তার জন্মগত মাতৃস্বভাবের জন্য কখনই পাশবিক শক্তি অর্জন করতে পারেনি। পরবর্তী পুরুষ যেভাবে নারীর উপর আধিপত্য করেছে, আদিম সমাজে নারী সে ভাবেই পুরুষের উপর আধিপত্য করত। নারী আধিপত্য করত তার মমতা, ভালোবাসা ও পরার্থপর মানসিকতা দিয়ে। আর পুরুষ আধিপত্য করেছে বুদ্ধিশক্তি ও শারীরিক শক্তি দিয়ে। সভ্যতার উন্নততর স্তরে পৌঁছেই পুরুষ নারীকে প্রকৃতিদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তার জ্ঞান আহরণের পথ বন্ধ করে—বুদ্ধিবৃত্তির শক্তিকে উন্নত করার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। চীন; বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের ভারত, গ্রীস এবং অন্যান্য দেশে নারীর বিরুদ্ধে পুরুষরা সহানুভূতিহীন কঠোর হয়ে ওঠে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের নারীগণ ছিল স্বাধীন, সম্মানিত ও উচ্চাসনে আসীন। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারী পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীন হয়ে পড়ল। ভারতেও নারী তার বৈধ আসন থেকে চ্যুত হতে থাকে। তাকে সমস্ত রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়—তার জন্য বৈদিক শ্লোক আবৃত্তি করা এমনকি শোনাই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মনু বলেছিলেন, "দিবারাত্রি মেয়েদের পুরুষের অধীনে রাখা উচিত। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। একজন মহিলা কখনই স্বাধীন হওয়ার যোগ্য নয়।"

ইউরোপে মেয়েদের জীবনের অবনতি শুরু হয়েছিল গ্রীস থেকে। J. P. Mahaffy তাঁর The Greek Life and Thought গ্রন্থে লিখেছেন "সভ্যতার যুগে প্লেটো ব্যতীত প্রায় সব চিন্তাবিদই মত প্রকাশ করেছেন যে নারীদের শিক্ষাবিমুখ করে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের দাসত্বে পরিণত করতে হবে এবং গৃহে আবদ্ধ রাখতে হবে। গ্রীসের স্পার্টাতে নারী স্বাধীন ছিল। প্রায়

দুশো বছর আগের একজন রোমান লেখক বলেছেন, "সকল পুরুষই নারীর উপর প্রভুত্ব করে, আমরা রোমানরা মানুষের উপর প্রভুত্ব করি এবং আমাদের স্ত্রীরা আমাদের উপর প্রভুত্ব করে।" কিন্তু তাঁর এই উক্তির স্ববিরোধও আছে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "যদি তোমার স্ত্রী যৌনঅপরাধ করে তবে তুমি তাকে বিবেচনাহীন ভাবেই হত্যা করতে পার কিন্তু যদি তুমি নিজে যৌন অপরাধগ্রস্ত হও তোমার স্ত্রী তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা।"

এ্যারিস্টটল দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে নারী পুরুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের। চার্চের ফাদার এবং খ্রীষ্টীয় মতবাদ মধ্যযুগে কোনভাবেই নারীর সম্মান ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব নামক প্রথম গ্রন্থের দৃষ্টিতে মানবের স্বর্গ থেকে পতনের জন্য কেবলমাত্রনারীই দায়ী। টারটুলিয়ন মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরাই শয়তানের প্রবেশ দ্বার।" গ্রেগরী (৩২৬—৩৯০ খ্রী.) মন্তব্য করেছেন, "ড্রাগন হলো ভয়াবহ দানব এবং বিষধর সরীসৃপ হল ধূর্ত। কিন্তু নারী হলো এই উভয়েরই প্রতিমূর্ত্তি।" St. Gerome-এর (৩৪৬—৪২০ খ্রী.) মতে "নারী থেকে সমূহ মন্দের উৎপত্তি।" খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী যাবত সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতে নারী ছিল দাসী ও পশুতুল্য। তাদের না ছিল কোন অধিকার না ছিল কোন সম্মান। The Mothers গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠার ফুটনোটে উল্লিখিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যণ্ডে অসংখ্য স্ত্রী বিক্রির ঘটনা ঘটেছে। মাত্র পাঁচ শিলিং ছিল একজন মহিলার দাম। রাশিয়ায় সাধারণ প্রবাদ রয়েছে, "মুরগী পাখী নয়, আর নারী মনুষ্যজাতি নয়।" G. R. Taylor মন্তব্য করেছেন, "দীর্ঘকালব্যাপী ইউরোপীয় সমাজে বিবাহের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যই ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজে অর্জিত নারীর বিষয় সম্পত্তিতে অধিকার অর্জন করা।" ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত ইউরোপে মহিলাদের স্বামীর নির্দেশের বাইরে সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকারই ছিল না। Miss E. A. Heckers তাঁর A Short History of Women's Rights গ্রন্থে ১৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "১৯৪১ সালেও স্ত্রীকে প্রহার করা ইংল্যাণ্ডে একটি সাধারণ ঘটনা ছিল।" D. L. Hobman তাঁর Studies in the Emancipation of Women (London) গ্রন্থে বলেছেন, "স্ত্রীদের টুলে

বেঁধে জলে চুবানো হতো। এবং তারা সম্পূর্ণ নির্বাক ও নিরুত্তর না হলে তাদের মুখে অশ্বশাবকের লাগাম ঢুকিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো।" মধ্যযুগে রাশিয়াতেও একই অবস্থা বিরাজ করত। রাশিয়ায় বিবাহের পূর্বেই কন্যার পিতা জামাতাকে নূতন চাবুক প্রদান করতেন। ঐ চাবুককে 'ডুরাক' বলা হতো এবং নববধূর শয্যাগৃহে তা ঝুলানো থাকত। অতি সামান্য কারণেও এই চাবুক দিয়ে স্ত্রীকে প্রহার করা হতো। আর বলা হতো এটা স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া। F. W. Halle তাঁর Woman is Soviet Russia গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "যদি কোন স্ত্রী অনুগতা হতে অস্বীকার করে এবং স্বামীর নির্দেশের প্রতি যত্নবান না হয়, তাহলে তার অপরাধের পরিমাণমত তাকে চাবুক মারার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রহার অন্যের উপস্থিতিতে না হয়ে নির্জনে হতে হবে। এবং তাকে সরাসরি মুখে বা কানপটিতে মারা হবেনা। বুকের উপর মারার সময় যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। আর এই প্রহারের জন্য কাঠের লাঠি বা লোহার রড ব্যবহার হবো না। আর যদি সে এই প্রহারে শ্রবণশক্তি হারায় বা দৃষ্টিশক্তি হারায় অথবা তার হাড় ভেঙে যায় তা হবে দুর্ভাগ্যজনক। চাবুক দিয়ে কোথায় মারবে তা নিজে ঠিক করে নেবে। এই প্রহার হবে যথেষ্ট কার্যকরী, পরিচ্ছন্ন ও উপকারী। কিন্তু যদি অপরাধ গুরুতর হয় তাহলে তাকে উলঙ্গ করে এবং হাতকড়া লাগিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রহার করা যাবে যাতে সমস্ত ক্রোধ চরিতার্থ হয়।"

পবিত্র কোরআনেও স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি রয়েছে "স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর, এবং তাদেরকে প্রহার[১] কর। যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় তাহলে কোন পথ অবলম্বন করোনা।[২]

কোরআন এবং পয়গম্বর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নারীদের সঙ্গে কোমল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন স্ত্রীদের প্রহারের জন্য দাঁতন বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

১. স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহলে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এগুলো তালাকের পূর্বাবস্থায় প্রয়োজ্য, এবং দাঁতনের অনুরূপ ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা সরু গাছের ডাল ব্যবহার করা যায়। ২. আলকোরআন-সূরা নিসা, আয়াত ৩৪.

Hobman তাঁর Studies in the Emancipation of Woman গ্রন্থে বলেছেন, "অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালেও মহিলা ছাত্রী ভর্তি হতে পারত না, এমনকি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও না। দীর্ঘ এক শতাব্দী সংগ্রামের পর তবেই মহিলাগণ বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরে ভর্তির অনুমতি পেয়েছে। আমেরিকাতেই প্রথম মহিলাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ার দাবী ওঠে এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই দাবিই প্রতিধ্বনিত হয় ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু ১৮৬৫ সালের আগে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপই গৃহীত হয়নি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাগণ পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার লাভ করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তি হয় এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রীদের পুরুষের সমান মর্যাদা স্বীকৃত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাগণ কেবলমাত্র পরীক্ষা দিতে পারতেন। ক্লাসের হাজিরা খাতায় তাঁদের নাম থাকত না। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গিরটন ও পিউনহাম কলেজের ছাত্রীদের কেবলমাত্র সার্টিফিকেট দেওয়া হতো, কোন ডিগ্রী দেওয়া হতোনা। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রইউনিয়নের ছাত্রদল ছাত্রীদের সদস্যপদের অনুমতি দেয়নি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ছিল। তবে নিউ-ক্যাসল বিজ্ঞান কলেজে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ও ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নারীপুরুষ বিভেদ ছিলনা। চিকিৎসাবিদ্যালয়ে প্রবেশ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠের অধিকার লাভের জন্য সমগ্র ইউরোপে মহিলাদের দুরূহ বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মহিলাদের চিকিৎসাবিদ্যায় ভর্তির অনুমতি দেয়। কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্রীরা ওয়ার্ডে ছাত্রদের সঙ্গে প্রবেশ করতে পারতনা। কলেজের সভাপতি, শল্যচিকিৎসক ও চিকিৎসক সকলেই ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণে অস্বীকৃতি জানান। অ্যানাটমিতে ছাত্রছাত্রীদের যৌথ ক্লাস চালু হলে ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে। মহিলারা Midwifery লাইসেন্স দাবি করায় মিডওয়াইফারী বোর্ডের সকল পরীক্ষকই পদত্যাগ করেন। পার্লামেণ্টে যখন বিল পাশ হলো যে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীকোর্সে ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবে,

তারপরও অন্ততঃ কুড়ি বছর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের ভর্তি করা থেকে বিরত ছিল।

ফ্রান্স ও জার্মানীতেও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। গৃহশিক্ষাই ছিল মেয়েদের শিক্ষার একমাত্র সম্বল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই চিত্র বিরাজ করছিল। আর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বিশ শতকের গোড়া পর্যন্তই নারীর জন্য রুদ্ধ ছিল। প্রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহিলাগণ প্রবেশাধিকার পেয়েছেন।

সেক্সপীয়র, মিলটন, রুশো সহ তৎকালীন ইউরোপের কোন কবি, দার্শনিক, সংস্কারক কেউই যে নারীর জীবনের চরম অবমাননার অন্ধকার সরিয়ে মুক্তির পথ করে দিতে এগিয়ে আসেননি, তেমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এই গ্রন্থে যে সকল উদাহরণ ও উক্তি সংযোজিত হয়েছে তাতে ঐ সময়কার ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ইত্যাদি মহাদেশের নারী জীবনের চরম অবস্থা বোঝার জন্য যথেষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অবধি যে ঐসব দেশগুলিতে নারী মর্যাদা, নারী-স্বাধীনতা ও নারীর সামাজিক, পারিবারিক কোন অধিকার স্বীকৃত ছিলনা তা ঐসব দেশের তৎকালীন বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক রাষ্ট্রনেতা শিক্ষাবিদ সকলের মানসিকতাতে স্পষ্ট। তাঁরা নারীদের এত নিম্নমানের কল্পনা করতেন যে নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে কোন বোর্ড, কমিটি কিংবা ইউনিয়নে সহ্য করতে পারতেন না। Zimmern-এর Women Suffrage in Many Lands গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে দাসবিরোধী সম্মেলন কমিটিতে মহিলা সদস্যা থাকায় পুরুষ সদস্যগণ প্রতিবাদে পদত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয় ইংল্যাণ্ডে যখন ঐ বছরে সম্মেলন বসে তখন আমেরিকাকে তার নারী প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের পরও ইউরোপে নারীর কোন সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৮৩২—১৮৪২ সালের দিকেও বিভিন্ন কমিটির সামনে নারী শ্রমিকদের যেসব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা ভয়াবহ। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে দীর্ঘকালব্যাপী নারীদের প্রতি এত অত্যাচার, অবিচার সত্ত্বেও নারীসমাজ তাদের অপরিসীম ধৈর্য, সহনশীলতা ও স্নেহমমতা নিয়ে পুরুষের সঙ্গে বসবাস করেছে, সংসারজীবন নির্বাহ করেছে,

নিজেই ভাবি পুরুষকে মাতৃস্নেহে স্তন্য দিয়ে লালনপালন করে মানুষ করে তুলেছে। সত্যিই নারী মহিয়সী, মহিমময়ী। দুর্বিসহ অবিচার অত্যাচার সত্ত্বেও সে পুরুষের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা মায়ামমতা প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। অসীম ধৈর্যের মধ্য দিয়ে তারা সমাজ পরিবার ও কর্ম-জীবনে সংগ্রাম চালিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে এক আদরণীয় সম্মানের আসনে। আজ সভ্যতার আর এক ধাপে বসে দেখতে পাচ্ছি নারীকে সেই মর্যাদার আসন থেকে টেনে নামিয়ে বিশ্বপুরুষের লালসা তাকে অন্যপথে অন্যভাবে শোষণ করতে চাইছে, নিজেদের উপভোগের পণ্যে পরিণত করতে চাইছে। এই সর্বনাশা অন্ধকারে নিমজ্জনের হাত থেকে বাঁচাতেই আমাদের মুখ ফেরাতে হবে পনেরো শত বছর আগে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তার দিকে। নারীর প্রতি অসীম মর্যাদা বোধের এই চেতনা জাগ্রত করেছিল, প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইসলাম। ইসলামের শ্রেষ্ঠতম নবী মধ্যযুগের নারীজীবনের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ঘোষণা করেছিলেন "মায়ের পায়ের নীচে রয়েছে স্বর্গ।" মা নয় দুধমাকেও বসবার জন্য বিছিয়ে দিয়েছিলেন নিজের মস্তকাবরণ। নারীর কষ্ট লাঘব করতে বইতে চেয়েছিলেন তাঁর মাথার কাঠের বোঝা। অন্যদিকে পবিত্র কোরআনে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "নারীদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার কর"। (৪ ঃ ১৯) "তারা (স্ত্রী) তোমাদের অঙ্গাবরণ, তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ।" (২ ঃ ১৮৭) "তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন সঙ্গীনী, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন।" (৩০ ঃ ২১) "নারীদের তেমনই ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের ; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।" (২ ঃ ২২৮)

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি মধ্যযুগে হযরতের আগমনের পূর্ব থেকেই আরব দেশের নারীগণ গ্রীস, প্রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড সহ সমগ্র ইউরোপের নারীদের চেয়ে অনেক বেশী সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ইহুদী ও আরব মহিলাগণই তৎকালীন বিশ্বে অনেকখানি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আরবের নারীসমাজ স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য পশু খামারের মালিকানা,

বিষয়সম্পদের মালিকানা পরিচালনা করতেন। শান্তিরক্ষায় বীরাঙ্গনার বেশে কংকন পরিহিতা আরব মহিলার হাতে শাণিত অস্ত্র ঝলসে দিয়েছে দৃষ্টি। বিবাদমান গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে অবগুণ্ঠনবতী আরব মহিলার ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা পুরুষকে পরিচালিত করেছে। 'তাই' গোত্রের আল হারিসের বেদুঈনকন্যা বুহায়সা, অদম্য আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বামী 'যুবিয়ান' গোত্রের দলপতিকে বাধ্য করেন যুবিয়ান ও আবস গোত্রের দীর্ঘ চল্লিশ (৫৬৮-৬০৮ খ্রীঃ) বছরের যুদ্ধাবসান ঘটাতে। স্বামী যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বে সদ্যবিবাহিতা মরুকন্যাকে স্পর্শ করতে পারেননি।[১] তবে ইসলাম আগমনের পূর্বে আরবের বহু গোষ্ঠীর মধ্যে নারীজাতি সম্পর্কে বিরূপ মানসিকতা ছিল। বহু গোষ্ঠী কন্যাকে শৈশবেই হত্যা করত। পুরুষরা নারীদের নীচু চোখে দেখত। কোন কোন গোত্রের মধ্যে স্ত্রীকে বিক্রি করা ও বন্ধক দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রীকে ভাড়া করার প্রথা সাধারণ নিয়মের মত গণ্য হতো।[২]

নারীজাতির অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বৈপ্লবিক স্বীকৃতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক নীতি নারীজীবন থেকে সকল নির্যাতনের অবসান ঘটায়। সমগ্র অঞ্চলের নারীসমাজের এক উজ্জ্বল সম্মান ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা ঘটে। কোরআনের অমোঘ বাণী সমগ্র দেশে কন্যা হত্যা, কন্যা বিক্রি ও যৌতুক প্রদান সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নারীকে এক মহিমময়ী আসনে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের সর্বশেষ সংস্কারক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সদা সতর্ক নির্দেশ ও নীতির দ্বারা নারীদের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার এক দুর্লভ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলাম নারীকে পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে অধিকার দান করেছে কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করেছে পুরুষকে। কন্যার বিবাহের পর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে গেলেও তার পৈতৃক সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার বলবৎ থাকার বৈপ্লবিক নীতি বিশ্বে ইসলামই প্রথম প্রচলন করেছে। স্বামী-স্ত্রীর

১. Ancient Arabian Poetry—London, 1885 p. p. 107-110.

২. Kinship and Marriage in Early Arabia.

পরস্পরের স্বাধীন অধিকারের এক বিরল নীতিও ইসলামই ঘোষণা করেছে। ইসলাম যেমন নিজ স্ত্রীর সঙ্গে কোমল স্নেহমমতা শ্রদ্ধার সম্পর্ক রক্ষার কথা বলেছে তেমনি সমগ্র নারীজাতির প্রতি পুরুষকে অনুরূপ আচরণের কঠোর নির্দেশ দিয়েছে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম"।[১] তিনি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছেন, "স্ত্রীদের সঙ্গে ভাল আচরণ করবে।"[২] বলেছেন, মুসলমানের "ঈমান (বিশ্বাস) সম্পূর্ণ হবে তখনই যখন তার আচরণ হবে অত্যন্ত ভাল" এবং "স্ত্রীর প্রতি ধৈর্য্য প্রদর্শন করবে।"[৩] তিনি বলেছেন, "নারীই তার স্বামী গৃহের সর্বময় কর্ত্রী ও পরিচালিকা।"[৪] তিনি আরও বলেছেন, "তোমার যদি চারটি দিনার (আরবীয় টাকা) থাকে তাহলে প্রথমটি খরচ কর দেশ-ধর্ম ও জীবনরক্ষার যুদ্ধে (পবিত্র যুদ্ধ); দ্বিতীয়টি খরচ কর দাসকে মুক্ত করার জন্য, তৃতীয়টি খরচ কর সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং চতুর্থটি খরচ কর স্ত্রীর জন্য। আর এই শেষেরটি আল্লাহর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের যোগ্য।" (মেশকাত শরীফ)

বিখ্যাত আরব দার্শনিক আলী বিন হাযেম (৯৯৪-১০৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর 'তাওকুল হামামা' গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন যে বহু ক্ষেত্রেই নারীগণ পুরুষের তুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিণী। শুধুমাত্র আলী বিন হাযেমই নন অন্য অনেক আরব বুদ্ধিজীবীই এই মত প্রকাশ করেছেন। এঁরা বলেছেন সাংসারিক পরিমণ্ডলে অবশ্যই কাউকে চূড়ান্ত নির্দেশ দানের অধিকারী করতে হয়। পারিবারিক বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে স্বামীকে স্ত্রী অপেক্ষা এক ধাপ উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা অনেকে যেভাবে পুরুষকে নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ কল্পনা করেন তা কোনভাবেই ইসলাম সম্মত নয়। সাংসারিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তো যে কাউকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করতেই হবে। এটিও একটি সংগঠন। যে কোন সংগঠনে সব সদস্যের মতামত দানের অধিকার থেকেও তো একজনকে চূড়ান্ত

---

১. আলহাদিস—মেশকাত শরীফ
২. " মুসলেম শরীফ
৩. আলহাদিস—তিরমিজি শরীফ
৪ " বোখারী শরীফ

সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পারিবারিক প্রয়োজন, শান্তিশৃঙ্খলা ও আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব যাঁর উপর বর্তায় তাঁকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কর্তা বা প্রধান ঘোষণা খুবই সঙ্গত হয়েছে। নারী পুরুষের তুলনায় অনুন্নত, নিজেদের রক্ষায় অক্ষম, ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনায় অযোগ্যা ইত্যাদি মতকে ইসলাম কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেয়নি। বরং ইসলামে মানসিক, শারীরিক, ধীশক্তি সব ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষের সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

শারীরিক শক্তির দিক থেকেও ইসলাম নারীকে পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী করেছে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধেও নারীকে সমমূল্য দেওয়া হয়েছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নিজে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধে নারীগণ অংশ নিয়েছিলেন। বিশেষতঃ ওহোদ, ইয়ামামা যুদ্ধে বহু নারীই বীরত্ব-সহকারে অংশ গ্রহণ করেছেন। এই যুদ্ধে এক মহিলা দারুণ আহত হন ও হাত দুটি হারান। 'তারিখে তাবারি' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে ইয়ারমুকের যুদ্ধে নারীসৈন্য এত বীরত্ব প্রদর্শন করে যে পুরুষদের হিংসার কারণ হয়। আজ নাদানের (৬৩৪ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই) যুদ্ধে নারীবাহিনী শরনিক্ষেপ ও অস্ত্রচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। এই যুদ্ধে উম্মে আবান যখন জানলেন যে তাঁর স্বামী শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছেন তিনি তখনই স্বামীর যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নজিরবিহীন সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। সিফ্ফিনের যুদ্ধে (২৬শে জুলাই ৬৫৭ খ্রীঃ) হযরত আলি ও মাবিয়ার মধ্যে শান্তি স্থাপনে বহু নারী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এস. এম. মিত্রের ১৯১১ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত The Position of Women In Indian Life গ্রন্থের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আব্বাসীয় যুগে বাইজান-টাইনের যুদ্ধে খলিফা আলমনসুরের দুই জ্ঞাতি বোন সশস্ত্র যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। খারেজীদের সঙ্গে যুদ্ধকালে একজন মহিলাযোদ্ধা দুহাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম হাজার বছর পর্যন্ত অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বহু যুদ্ধেই নারীবাহিনী ছিল এবং তাঁরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।

আমরা গোটা বিশ্বইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে যখন নারীরা অত্যাচার, অবিচার, অবমাননার চরম অন্ধকার

জগতে সম্পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা বিহীন হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন তখন ইসলামের ছত্রছায়ায় নারী পূর্ণমর্যাদায় শিক্ষা সংস্কৃতি, ব্যবসাবাণিজ্য, রাষ্ট্রপরিচালনা ও যুদ্ধপরিচালনায় উজ্জ্বল ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিতা। যেসময় ইউরোপীয় দেশে নারী কেবল শিক্ষালয়ে প্রবেশের অধিকার অর্জনের জন্য মাথা কুটে মরছে তার অনেক আগেই মুসলমান নারী শিক্ষাদাত্রীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিতা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র যে বৃটিশজাতি মহিলাদের লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ক্লাসে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে তারা কি নির্লজ্জ ভূমিকা নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানকে 'Orthodox' আখ্যা দান করতে পেরেছে। একবারও তাদের বিবেকবোধ মনে করেনি জাহানারা, জেবুন্নেসা, নূরজাহান কিংবা সুলতানা রিজিয়াদের কথা। শুধুমাত্র বহিঃআবরণের (বোরখা) দোহাই দিয়ে আজও ইসলামকে মৌলবাদীতার বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করা হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্য স্বাধীনতার প্রতি মোহমুগ্ধতায় যাঁরা অন্ধ তাঁরা কি করে ইতিহাসের প্রতি অন্ধ থাকেন জানিনা। যাঁরা নিজেদের মুসলমান বলেন ও ভাবেন তাঁদের ভূমিকা আরও বেদনাদায়ক। যে কাউকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে তার ইতিহাস তো জানতে হবে। যার সঙ্গে তুলনা করছি তার ইতিহাসও জানতে হবে। আমরা মুসলমানরা নিজেদের চরম অবমাননাময় জীবনে নির্বাসিত করেছি তার জন্য তো ইসলাম দায়ী নয়, দায়ী তো আমরা। আমরা মুসলমানরা এতই হীনমন্যতা বোধের শিকারে পরিণত হয়েছি যে নিজেদের ইতিহাস জানতে চাইনা, খুঁজিনা এবং নিজেদের আদর্শ মতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ভয় পাই। আর তাই মনে করি সত্যিকার মর্যাদা ও স্বাধীনতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বিস্তারিত আছে পাশ্চাত্ত্যের উন্মত্ত জীবনযাপনের লীলাভূমিতে। শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। ইসলাম নারীপুরুষ সবার জন্য সেই স্বাধীনতা ও অধিকার দান করেছে। উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কোন অধিকার অর্জন করা যায়না নিজেকে টুকরো টুকরো করে নষ্ট করা যায়—গোটা পাশ্চাত্ত্য সমাজ আজ তার জীবন্ত উদাহরণ। ইসলাম তার নির্দিষ্ট জীবনবিধানের কাঠামোর মধ্যে কোথাও এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। নির্দিষ্ট জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে ইসলামই জন্ম দিয়েছিল বহু মহিলা দার্শনিক, কবি, কাব্যসমা-

লোচক ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রপরিচালিকা, অধ্যাপিকা, যোদ্ধা ; স্বীকৃতি দিয়েছিল কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতাকে। পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে এ ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইতিহাসের পাতায় একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিলেই সকলের ভ্রান্তি ঘুচবে। প্রয়োজন তাই গড্ডালিকাস্রোতে প্রবাহিত না হয়ে একটু ইতিহাস মনস্ক হওয়া।

শিক্ষাঙ্গন থেকে রণাঙ্গন পর্যন্ত যেমন ইসলাম নারীর ভূমিকাকে এক বিরল মর্যাদার আসন দান করেছিল তেমনি অধ্যাত্মবিদ্যা ও অধ্যাত্ম দর্শনের জগতেও তার অবাধ প্রবেশাধিকারে কোন বাধা দান করেনি। বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইবনে হাযেম কোরআনের বিভিন্ন আয়াত বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ইসলামী দর্শন অনুযায়ী নারীগণ নবীও হতে পারেন। তিনি বলেছেন অন্ততঃ চারজন মহিলার পয়গম্বর মর্যাদার বিষয়টি কোরআন স্বীকৃত। এঁদের প্রথমজন মুসা আলাই-হেস সালামের মা, দ্বিতীয়জন ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া (আঃ), তৃতীয় জন হযরত ইসহাক আলাইহেস সালামের মা, চতুর্থজন হযরত ঈসা আলাই-হেস সালামের মা হযরত মরিয়ম (আঃ)। অধ্যাত্ম সাধনার চরমতম স্থানে বহু মুসলিম মহিলাই চরম সিদ্ধিলাভ করেন। আমরা জানি হযরত রাবেয়া বসরীর (রাঃ) কথা, যিনি অধ্যাত্ম সাধনায় বিশেষ সিদ্ধিলাভ করেন। মুসলমান মহিলাগণ তৎকালীন আরব দেশের বিভিন্ন অংশে ইসলামী বিজ্ঞান, হাদিস ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক দর্শনের পঠন-পাঠনের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। এই মঠগুলির প্রধান অধ্যক্ষা সবসময়ই মহিলা হতেন। ৭১৪ হিজরীতে বাগদাদে এইরকম একটি মঠের কর্ত্রী ছিলেন ফাতেমা নাম্নী এক মহিলা। তিনি উচ্চশিক্ষিতা ও পার্থিব যাবতীয় আকর্ষণ বর্জিতা ছিলেন। তিনি সারাজীবনই কঠোরভাবে ইসলামী বিধিনিষেধ মেনে জীবনযাপন করেছেন। দামেস্ক ও কায়রোর বহু মহিলা তাঁর শিষ্যা ছিলেন। সুফীতত্ত্বে তিনি অসাধারণ পর্যায়ে পৌঁছান। স্বামীহারা বহু মহিলা পুনঃবিবাহ না হওয়া পর্যন্ত উন্নত চরিত্রমাধুর্য বজায় রাখার জন্য এই সকল মঠে আশ্রয় নিতেন।

ইসলাম কোন পেশা গ্রহণের ব্যাপারে নারীদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি। ইবনে জাবীর, আল তাবারী ও ইমাম আবু হানিফার মত

বিখ্যাত ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বিচারকপদে মহিলাদের নিয়োগ যুক্তিযুক্ত বলেছেন। এটা সর্বজনবিদিত যে হযরতের প্রথমা স্ত্রী খাদিজা বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। ওতবার কন্যা হিন্দা খলিফা ওমরের সময় তাঁর ব্যবসার প্রয়োজনে রাজকোষ থেকে চার হাজার দিনার ধার নিয়েছিলেন এবং ব্যবসার সংকট কাটিয়ে উঠে সেই ঋণ পরিশোধ করেন। আবদুল্লাহ্ কন্যা শিফাকে হযরত ওমর একটি বাজারের মুখ্য পরিচালিকার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন।

শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে অসাল্লামের কর্মময় জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমাজ, রাষ্ট্র ও অধ্যাত্মজগতের ক্ষেত্রে তাঁকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল জ্ঞানবানদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি কেবলমাত্র মহিলাদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পবিত্র হেরা গিরিগুহায় যখন প্রথম কোরআনের বাণী তার কাছে অবতীর্ণ হলো তখন তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন। কি করবেন, কি এর তাৎপর্য তাই ভেবে তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়েছেন তখন স্ত্রী খাদিজার সঙ্গে আলোচনা করেছেন ও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরই মত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়। সন্ধির শর্ত, সন্ধির প্রস্তাব ও মক্কা অভিযানকে কেন্দ্র করে এই সময় সংকট সৃষ্টি হয়। এইসময়ও তিনি সংকট নিরসনে আলোচনা করেন স্ত্রী আয়েশার (রাঃ) সঙ্গে। ইসলামের ইতিহাসের এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বয়ং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মহিলাদের মতামতকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিলেন তা অবিস্মরণীয়। দুটি বিষয়ই এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সিদ্ধান্তে সামান্যতম ভুল হলে ইসলামের ইতিহাসের গতিই বদলে যেতে পারত।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সৈন্যবাহিনীতে একটানা কার্যকালের মেয়াদ ও ছুটির সীমা নির্ধারণের জন্য ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর একজন নারীর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ কন্যার

সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর অভিমত অনুসারে সমগ্র রাষ্ট্রে সৈন্যবাহিনীর ছুটি সংক্রান্ত আইন রচনা করেন।

শুধু আরব কেন যখন বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন চলছে তখন ভারতভূমিতে মুসলমান শাসকগণও নারীকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করে ইসলামের বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণ করেছেন। আমরা জানি মালাবার[১] অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমন ঘটে ইসলামের প্রথম যুগেই। ঐ অঞ্চলে বহু আরব বণিক স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। মালাবারের সুলতান গিয়াসুদ্দিন তাঁর রাজ্যের বিদ্যালয়, বাণিজ্যক্ষেত্র, অফিস রাজদরবার সর্বত্র নারীদের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। 'তারিখে ফেরিশতা' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে দেখা যায় তিনি প্রায় ১৫ হাজার মহিলাকে ঐ সব বিভাগে নিয়োগ করেছিলেন। মধ্যযুগে যখন সমগ্র বিশ্বে মহিলাগণ পাশবিক আচরণের শিকারে পরিণত হয়েছেন তখন এই ভারতেরই দক্ষিণভাগের এক মুসলিম রাজা নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি দানের এক চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গুজরাটের রাজা মোহাম্মাদশাহ এই সময় নির্দেশ পাঠাচ্ছেন মহিলাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে। তিনি সব দফতরেই মহিলাকর্মী নিয়োগ করেছেন। তাঁর শাসনকালে প্রায় ১২ হাজার মহিলাকে করসংগ্রাহক, সাহিত্য, বিজ্ঞান, হস্তশিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন। এদের অনেককেই তিনি পুলিশবাহিনী, বিচারক, হিসাবরক্ষক, কোরআন মুখস্ত করা ও কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিয়োগ করেন। তাছাড়া তিনি বিভাগীয় নিয়ম অনুসারে মহিলাদের জন্য পুরুষের সমপর্যায়ের পোশাক পরিধানও অনুমোদন করেন। History of Gujrat-এ পাওয়া যায় বহু মহিলা অসিচালনা ও তীরনিক্ষেপের জন্য সজ্জিত হয়ে শিকারে যেতেন।

অবিভক্ত বাংলার ফয়জুননেসা চৌধুরাণীর নাম বাংলা সাহিত্য জগতে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে জমিদারী পরিচালনার মত দুরূহ কাজের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সাধনাও করতেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'রূপজালালা'র

---

১. মালাবার—শব্দটি আরবী মাআবার শব্দ থেকে এসেছে। মাআবার অর্থ সংযোগস্থল। ষষ্ঠ শতাব্দীতেই এই অঞ্চলে মুসলিম বণিকদের আগমন ঘটে ও এখানে ইসলামী ভাবধারা গড়ে উঠে।

জন্য বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চির অক্ষয় থাকবে। জমিদারী পরিচালনার মত কঠিন কাজে তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ও অন্যান্য যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন ভারত সরকার ১৮৮৯ সালে তাঁকে নওয়াব উপাধিতে ভূষিতা করেন। শাহিদ সুরাবর্দীর মাতা বেগম সুরাবর্দীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ-র পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। এম. এ-র প্রথম মহিলা পরীক্ষক হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম মুদ্রিত আছে। ভারতীয় মুসলমান সমাজে বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে পরবর্তীকালে ইসলামী আদর্শ বহির্ভূত যে কঠোরতার জন্ম হয়েছিল তাকে ভেদ করেও আলোক রশ্মির মত বেরিয়ে এসেছিলেন নুরুননেসা খাতুন, রোকেয়া সাখাওয়াত, শামসুননাহার বেগমের মত বহু উজ্জ্বল নারী ব্যক্তিত্ব।

বর্তমানে এই উপমহাদেশে ইসলামের ও ইসলামধর্মাবলম্বীদের যে পরিচয় বিরাজমান তা ইসলামের প্রকৃত পরিচয় নয়। এ চিত্রের বহু কিছুই ইসলামের নীতি নিয়মের সীমানার অনেক দূরে। ভারতে আগত ইসলামী বিধি বিধানগুলি প্যারস্য, তুর্কী ও অন্যান্য নানা দেশের সামাজিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত। সম্ভবত এজন্যেই আরব, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডে পুরুষের সঙ্গে নারীর সর্বক্ষেত্রে যে সম-মর্যাদা ছিল ভারতে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। ভারতীয় উপমহাদেশে কোন মহিলাকেই জনসমাবেশে বা ধর্মসভায় প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার অনুমতি যে দেওয়া হয়নি তা ঐ প্রভাবেরই পরিণতি। (মধ্যযুগের ভারতে মুসলিম নারীর শিক্ষার অধিকার বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাও কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ পরিবারের মধ্যেই এই সীমাবদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বাকি অংশ ক্রমশ অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে। অথচ দক্ষিণ ভারতের যে অংশে সরাসরি আরবগণ বাণিজ্য করতে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন সেখানে নারীপুরুষের শিক্ষার অধিকারের এই ব্যবধান পরিলক্ষিত হতোনা। এই অঞ্চলে নারীপুরুষ একত্রে বিদ্যালয়ে কোরআন শিক্ষা করেছেন, হাফেজি বিদ্যালয়গুলোতে নারীপুরুষ উভয় শিক্ষার্থীই একত্রে শিক্ষালাভ করতেন। পাঞ্জাব, দিল্লী, আকবরাবাদ, লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে উচ্চ ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবারগুলিতে নারীশিক্ষা যথেষ্ট গুরুত্ব পেত।)

ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যে ধারণা ভারত ও ইউরোপে প্রচলিত তা একেবারেই ভ্রান্ত।

(বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবনে রুশদ যিনি সমগ্র ইউরোপে এভরোজ নামে পরিচিত, ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে আজও যাঁর গ্রন্থ পাঠ অপরিহার্য তিনিও নারী-পুরুষকে দৈহিক ও মানাসক দিক থেকে সমক্ষমতাসম্পন্ন, বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করতেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে মাত্রার, তার বেশী নয়। এই খ্যাতনামা মুসলিম চিকিৎসক ইবনে রুশদ ছিলেন এ্যারিষ্টটলের মতবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার। ইনিই প্রথম পুরুষ ও নারীর সম-অধিকারের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন।)

পর্দা, একাধিক বিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক প্রথার জন্য ইসলাম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু ইতিহাস ও বিশ্বের সামাজিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর কোনটাই ইসলাম প্রবর্তিত প্রথা নয়। বহু বিবাহ প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত ছিল। বিশ্বব্যাপী বহুবিবাহের যে সর্বনাশা কুপ্রথা ছিল তাকে দারুণ ভাবে নিয়মতান্ত্রিক করেছে ও সর্বযুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যদিও চারটি বিবাহের সুযোগ রয়েছে কিন্তু তা এত কঠিন ও কঠোর নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কখনই একাধিক বিবাহ ইসলামে প্রাধান্য পাওয়ার কথা নয়। ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীগণ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বহুবিবাহ প্রচলনের দায়দায়িত্ব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয়েছে।

পর্দার ব্যাপারও তাই। ভারত, গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি দেশে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই কঠোর পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। অবশ্য ইসলাম নারীকে পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার অনুমতি দেয়নি। যথোপযুক্ত পোশাকে আবৃত থাকা, শালীনতা বজায় রাখা, নৈতিক চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করার উপর ইসলাম বিশেষ জোর দিয়েছে। তবে ইসলাম কখনই নারীকে অবরোধের অন্তরালে নির্বাসন দেয়নি, নারীর মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের পাতা উন্মুক্ত রেখে বাকি অঙ্গ আবৃত করার নীতি প্রবর্তন করেছে। তাছাড়াও ইসলাম এই শালীনতা এই চরিত্রমাধুর্য রক্ষার আদর্শ কেবল নারীর উপর আরোপ করেনি পুরুষের উপরও সমভাবে করেছে। এইভাবে পুরুষ ও নারীর যৌথ শালীনতাবোধের মধ্য দিয়ে ইসলাম নারীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক মর্যাদার আসনে, দিয়েছে সর্বোত্তম সম্মান, অধিকার, সর্বোপরি স্বাধীনতা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমরা দেখছি কাগজেকলমে নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও এক ভিন্নতর পথে সে নির্যাতিতা ও

শোষিতা হচ্ছে। এই নির্যাতন ও শোষণ আরও ভয়াবহ পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে। সভ্যতা আর প্রগতির মুখোশ পরিহিত সেই নির্যাতন ও শোষণেরই চিত্র পর্যালোচনা করা হল পরবর্তী "নারী নির্যাতনের স্বরূপ ও নারী মুক্তির ভাবনা" অংশে।

২. নারী নির্যাতনের স্বরূপ ও নারী মুক্তির ভাবনা :

একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় পৌঁছেও প্রতিদিনের পত্রপত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নারীসমাজের বিচিত্র সমস্যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত। নারীনির্যাতন, নারীঅপহরণ, নারীধর্ষণ ও বধূহত্যার লোমহর্ষক ঘটনা বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ ঘটনার মত সংবাদপত্রে স্থান পাচ্ছে। কেবলমাত্র আমাদের দেশ নয় প্রতিটি অনুন্নত দেশেরই এটি দৈনন্দিন চিত্র। উন্নত দেশগুলোতেও নারীর নির্যাতন ও অবমাননার অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে তবে অন্যতর রূপে। অনুন্নত দেশের ঘটনাগুলির সঙ্গে উন্নত দেশের ঘটনাগুলির পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। উন্নত দেশগুলিতে নিজ সন্তান, সংসার ও সমাজের প্রতি দায়িত্বকে অস্বীকার করে চরম উচ্ছৃঙ্খল জীবন নির্বাহের ফলে নারীজীবনে নেমে এসেছে নিরাপত্তাহীনতার এক করুণ যন্ত্রণা। মানবজীবনকে ভোগ্যবস্তুর মত যথেচ্ছ ও বিকৃত পথে উপভোগ্য করে তোলার পরিণতিতে এইডস-এর মত জীবনসংহারক ব্যাধি উন্নত দেশগুলোকে শংকিত করে তুলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন ৭ই অক্টোবর ১৯৮৮তে সোলে এক ঘোষণায় জানিয়েছে, সমগ্র বিশ্বে এখন রেজিষ্ট্রীকৃত এইডস্ রোগীর সংখ্যা—১,১৯,৮১৮। ঘোষণায় বলা হয়েছে ১৪২টি রাষ্ট্র জানিয়েছে তাদের দেশে এইডস্ রোগী আছেন। ৩৫টি দেশ জানিয়েছে তাদের দেশে কোন এইডস্ রোগী নেই। বর্তমানে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৩,৩৯৪ জন, ফ্রান্সে ৪২১১, উগাণ্ডায় ৪০০৬, ব্রাজিল ৩৬৮৭, তানজানিয়ায় ৩০৫৫ জন রেজিষ্ট্রীকৃত এইডস্ রোগী রয়েছেন। একথা অনস্বীকার্য যে মোট রোগীর সামান্য সংখ্যাই এখনও রেজিষ্ট্রীকৃত হয়েছে। সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইডস্ রোগীর সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে কোটিতে পৌঁছানর আশংকা আজ আর অমূলক নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অবিরত চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে এই সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোক তার দেশে ঢুকে না পড়ে। বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় কেবলমাত্র ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত দেশ ব্যতীত সব দেশেই এইডস-এর মত সংক্রামক ব্যাধি সৃষ্টির কারণগুলি অতি সাধারণভাবে ঘটে

চলেছে। মস্কো থেকে প্রকাশিত "সোভিয়েত নারী" পত্রিকার আগষ্ট ১৯৮৮ সংখ্যার ১৯ পৃষ্ঠায় এইডস প্রসঙ্গে এক বিশেষ প্রতিবেদনে সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান একাদেমির ভিন্‌নিৎস্কি এক আলোচনায় বলেছেন : "রোগ কি ভাবে সংক্রামিত হয় আমরা খুবই সঠিক ভাবে জানি— যৌন সংসর্গের মাধ্যমে এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে।" আর এর প্রতিষেধ সম্পর্কে তিনি বলেছেন "আকস্মিক যৌন সম্পর্কের বিপদ রোধই এইডস-এর একবারে প্রাথমিক প্রতিষেধ ব্যবস্থা, বিশেষতঃ সেই উদ্দেশ্যে গর্ভনিরোধকের আশ্রয় গ্রহণ না করা। এইডস্-এর সমস্যা অবশ্যই সর্বপরি চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা, তবে তার সামাজিক, নৈতিক এবং শিক্ষামূলক—এইরকম অন্যান্য দিকও আছে। সে সব দিকে কাজ করলে এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রীতিমত সাহায্য হতে পারে।" দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত এই সব ঘটনাকে যেমন প্রতিরোধ করা দরকার—তেমনি দরকার নারী পুরুষের মধ্যে বিকৃতি যাতে সংক্রামিত না হয় তেমন মানসিক স্তর গড়ে তোলা।

পত্রপত্রিকায় সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়তে অসংখ্য যুক্তিবাদী সব প্রবন্ধ, রাষ্ট্রনেতা, বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞানীদের সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করে উচ্ছৃঙ্খল যৌনমানসিকতার অব্যাহত বিজয় অভিযানই এর উত্তরোত্তর সংখ্যাধিক্য ঘটাচ্ছে। নারীজীবনের লাঞ্ছনাময় পরিণতি থেকেও যে এই ধরনের বাস্তব সংকট সৃষ্টি হচ্ছে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা দেখছি সর্বত্র নারী নির্যাতন, নারীলাঞ্ছনা, নারী অবমাননার বিরুদ্ধে নারীসমাজও সোচ্চার হয়েছেন, সংগঠিত হচ্ছে নারীদের ধিক্কার মিছিল, সেমিনার, কনভেনশন এবং যুক্তিবাদী পুরুষগণও নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। সরকার নারীদের সপক্ষে প্রচুর কল্যাণমূলক আইন তৈরী করছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি এত সব মঙ্গলচিন্তা সত্ত্বেও দিনের পর দিন নারীর উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন সহ বধূহত্যা, নারীহত্যা, হরণ, ধর্ষণ, যৌতুক ক্রমান্বয়ে বাড়ছে বৈ কমছে না। সমাজের সর্বস্তরের, সর্বমহলের প্রতিবাদ, নিন্দাবাদ, সমালোচনা, ঘৃণা সত্ত্বেও নারীসমাজ এসব জীবনযন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। বরং নারীজীবনের এই অভিশাপ বিস্তার লাভ করছে শহর থেকে গ্রামে। ঘটনার এই ব্যাপকতাই প্রমাণ করছে যে এমন কোন কারণ রয়েছে যার জন্য সমস্যার গভীরে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। অথবা সমস্যার প্রকৃত উৎসগুলিকেই স্বীকার করা হচ্ছে না। আর প্রকৃত কারণের এই অস্বীকৃতির জন্যই এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না।

সমগ্র মানব প্রজাতির প্রায় অর্ধেকেই নারী। শুধু তাই নয় সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ রয়েছে। এবং এই স্ত্রী-পুরুষের মধ্য দিয়েই সুশৃঙ্খলভাবে সচল রয়েছে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি। সমগ্র পৃথিবীর উন্নতি কখনই শুধুমাত্র পুরুষ বা স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল নয়। স্ত্রী-পুরুষের যৌথ জীবনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সচল থাকার মূলে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য পৃথিবীর কোথাও নেই। পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠতম জীব যদি পৃথিবীর নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তবে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক। মানবসমাজের স্বেচ্ছাচারিতা ও মানসিক বিকৃতি সমগ্র বিশ্বের নারী সমাজকে এক অসহনীয় অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশাময় জীবনে ঠেলে দিচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ আধুনিক চিন্তাবিদগণ মেনে নিয়েছেন নারী সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির উপরই নির্ভর করে যেকোন জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের উন্নতি ও অগ্রগতি। নারীসমাজের পশ্চাৎগামীতা ব্যাহত করে যে কোন সম্প্রদায়ের অগ্রগতি।

আমাদের সমগ্র সমাজ আজ বিবাহবিচ্ছেদ, বধূহত্যা, কিশোরী ধর্ষণ, বিধবা ধর্ষণ, নারী অপহরণ ও যৌতুক সমস্যায় আতঙ্কিত। এরমধ্যে একটা আশার কথা প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা, আদর্শ ও নীতিনৈতিকতা যে অংশে বিরাজমান সেখানে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে অসংখ্য ঘটনা ঘটছে তার অতি সামান্যই আমরা জানতে পারি। সমগ্র সমাজই যে নিদারুণ সংকটাপন্ন তা প্রতিটি নাগরিকই টের পাচ্ছেন। নারীর জীবন আজ গৃহকোণেও নিরাপদ থাকছে না। সেখানেও মানুষরূপী পশুর আক্রমণে নারী জীবন ক্ষতবিক্ষত। অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরী, হাসপাতালের মহিলা রোগিনী, চাকুরিজীবী, গবেষণারতা মহিলা, মাতা, বধূ কেউই পাশবিক অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। এঁদের কারুরই আব্রু, ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই। পিতামাতা কন্যাকে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। আইনরক্ষক পুলিশের হেফাজতেও নারী সম্ভ্রম বজায় থাকার নিশ্চয়তা নেই, গৃহশিক্ষকের কাছে ছাত্রী নিরাপদ নয়, অসহায় ভিখারী কিংবা ফুটপাথবাসিনী, অর্ধোন্মাদ ভবঘুরে নারী, কারুরই ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা নেই। কি বিকৃত মানসিকতার শিকারে পরিণত হতে চলেছে আমাদের সমগ্র সমাজ। শুধুমাত্র আইন তৈরী করে এই সব অপরাধ প্রবণতা থেকে সমাজকে মুক্ত করা যাবে কি? কিংবা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তি, উন্নতি ও স্বাধীনতা নারী জীবনে অবিকৃত

সুস্থ চেতনা আনবে কি? যদি তা হত তাহলে তো অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশ কিংবা সমাজতান্ত্রিক দেশে এ সমস্যা থাকত না। তথ্য কিন্তু অন্য কথা বলে। সমাজতান্ত্রিক চীনের সমাজও সমকামিতা ও পতিতাবৃত্তিতে আক্রান্ত. ছাত্ররা অবাধ যৌনতার দাবি তুলছে। চীনের কঠোর সরকারী আইনগত বাধা থাকা সত্ত্বেও এসব ঘটে চলেছে কেন এটা তো বিরাট প্রশ্ন। এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে আত্মপ্রতারণা আছে—সত্যকে স্বীকার করার মানসিকতা নেই।

আমরা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে ইসলাম পূর্ব যুগের দিকে নজর দিলে দেখতে পাব সে যুগে নারীর যে মর্যাদাহীন চিত্র ছিল তারই প্রকাশ সর্বত্র ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। যাঁরা ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের বৈপ্লবিক ও নৈতিক অনুশাসনকে মুক্ত মনে বিশ্লেষণ করেন তাঁদের অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়না যে, ইসলাম নারীকে কতবড় মর্যাদা দিয়েছে, কত অপরিসীম ইজ্জত ও আব্রুর নিরাপত্তা সৃষ্টি করেছে। ইসলামপূর্ব যুগে পিতামাতা সমাজে অবমাননা ও লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেতে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত সমাধি দিত, হাটেবাজারে অবোধ কন্যা সন্তানদের বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতো। একই ঘটনা তো আমাদের দেশে এখন ঘটে চলেছে। গ্রামেগঞ্জে কত অসহায় পিতা নিরাপত্তাহীন ভবিষ্যতের চিন্তায় শিশু কন্যাদের বিক্রি করে দিচ্ছেন, হত্যা করে নিজেও আত্মঘাতী হচ্ছেন! সেই সুদূর মধ্যযুগে কঠোর সংগ্রামময় মরুভূমির বুকে ইসলাম তার বৈপ্লবিক ও নৈতিক বাণীর সাহায্যে এ ধরনের বহু অনাচার প্রতিরোধ করেছিল অত্যন্ত সার্থক ভাবে। সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যেই নারী সবরকম অত্যাচার, অনাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ, হরণ ও যৌতুকের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিল; সমগ্র সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল এক অনন্য সাধারণ শৃঙ্খলা। নারীর প্রতি প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মমতা ও শ্রদ্ধায় ভরা অভূতপূর্ব নিরাপত্তা। আপন অধিকারে মর্যাদাময়ী মুসলমান নারী সমাজ বিশ্বের নির্যাতিত অধিকারহীন নারীদের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারই প্রভাবে সমগ্র ইউরোপে সেদিন থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল অধিকার, নিরাপত্তা ও মুক্তির দাবিতে নারী আন্দোলন। এইসব আন্দোলন বহু দেশের শাসককে নারীকল্যাণ আইন করতে বাধ্য করেছে; এইসব আন্দোলনে সব ছিল, ছিল না কেবল শুচিসুন্দর নীতি নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। আর তাই এক নির্যাতন ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে *সমগ্র নারীসমাজ অন্য এক অন্ধকারে নিমজ্জিতা। ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত* নারীর অধিকার সংরক্ষণে আকৃষ্ট হয়ে দেশের পর দেশ যে আন্দোলন শুরু

করেছিল আজও আদর্শহীন পথে চলছে সে আন্দোলন। আদর্শবিহীন এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সৃষ্টি করছে অসংখ্য সমস্যা। ফলে নারী জীবনের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

বর্তমানে এই নারী আন্দোলন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সমগ্র বিশ্বের বিবেকবান বুদ্ধিজীবীগণ সোচ্চারে নারীর অসম্মান, নারী-নির্যাতন ও নারীমর্যাদার অবমাননার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন, প্রকাশ্যে জনসভা করছেন, গঠিত হচ্ছে অসংখ্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। যাঁদের হঠকারী আচরণ ও উক্তি নারীমর্যাদাহানী ঘটাতে সর্বাধিক সহায়তা করেছে তাঁরাও এসব ব্যাপারে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এইসব দৃষ্টান্তই সমস্যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা প্রমাণ করে। এসবের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার, সমস্যাকে গভীর সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, বাস্তবকে উপলব্ধি করতে বাধ্য করছে।

এখন প্রশ্ন হলো সমস্যা দেখে উদ্বিগ্ন হলে কিংবা বাস্তবকে স্বীকার করলেই কি সমাধানে পৌঁছানো যাবে? সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে তার উচ্ছেদ ঘটাতে পারলেই স্থায়ী সমাধান সম্ভব। নারীসমাজের সর্বকালীন দুর্দশা ও দুর্গতির ধরন ও প্রকৃতির বিশ্লেষণ করে প্রতিকারে অগ্রসর না হলে কখনই নারী সমাজের কল্যাণ হতে পারেনা।

নারীর অবমাননার প্রকাশ্য ও আইনসিদ্ধ চিত্র আমাদের সামনে সদা বিরাজমান। এর অন্যতম একটি হলো পতিতাবৃত্তি। ভারতে পতিতাবৃত্তি বৈধ ও আইনসিদ্ধ পেশা। আইনের চোখে রাষ্ট্রের চোখে পতিতাবৃত্তি অপরাধ নয়। অবশ্য সরকারের কাছ থেকে পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স না নিলে তা অপরাধ বলে গণ্য হয়। এই পতিতাবৃত্তির পিছনে কত নারীর করুণ যন্ত্রণা, কত নারীর অপরিসীম লাঞ্ছনা রয়েছে তার সীমাপরিসীমা নেই। এ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত ও নারীকল্যাণ সংগঠনগুলির বিস্ময়কর নীরবতা বিরাজমান। এটুকুই স্বস্তি যে বিশ্বমানবতার দৃষ্টিতে পতিতাবৃত্তি আজও নারীর জন্য একটি চরম অমর্যাদাকর পেশা।

নিরূপায় অসহায় মেয়েরা নানাভাবে কুচক্রীদের চক্রান্তজালে জড়িয়ে এপথে আসতে বাধ্য হয়। একশ্রেণীর লোক অর্থলালসার শিকার হয়ে হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত আব্রু জীবনযৌবন নিয়ে ব্যবসা চালায়। এইসব হীন কুচক্রী দলে সমাজের সর্বস্তরের লোক ছড়িয়ে রয়েছে। পতিতালয়ে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে একশ্রেণীর পুরুষ মা-বোনদের ইজ্জত আব্রু নিয়ে আমোদ-প্রমোদের প্রশিক্ষণ পায়, পাপাচারে অভ্যস্ত হয়। ফলে নারী

যে মাতৃসমা, এই শ্রদ্ধাবোধ নিজে হারায় এবং অন্যকে হারাতে প্ররোচনা যোগায়। পথে ঘাটে স্কুলে কলেজে অফিসে আদালতে গ্রামেগঞ্জে সর্বত্র এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পতিতালয়ের নারীসমাজই পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক ঘৃণ্য লাঞ্ছনা ভোগ করে। নির্যাতিত নারীর তালিকায় এদেরই স্থান সর্বাধিক ঊর্ধ্বে।

নারী নির্যাতনের দৃষ্টান্তের আরও করুণ চিত্র সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। নিম্নপেশার লোকজন অহরহ সন্তান সহ স্ত্রীদের পরিত্যাগ করেন। এই শ্রেণীর নারীদের নির্যাতনের এখানেই শেষ নয়। এরপর শুরু হয় আর এক জীবন যন্ত্রণার অধ্যায়। এরা অসহায় হয়ে পরিচারিকা, ছাদপেটাই, কাগজ বাছাই, কাগজ ভাঁজাই, সেলাই ও আয়া ইত্যাদির কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কর্মস্থলে সহকর্মী পুরুষগণ কিংবা মালিক তাদের অসহায় অবস্থার কথা জানতে পারে। নানা ছলছুতো ও প্রলোভনে ফেলে লুণ্ঠন করে তাদের ইজ্জত। এদেরকে কেন্দ্র করে সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হচ্ছে। বিবাহ আইনের কড়াকড়ি করে এদের জীবনের নিরাপত্তা আনা যাচ্ছে না।

দেশে প্রকাশ্য লাইসেন্সধারী পতিতা ছাড়াও আর এক পথে পতিতা-বৃত্তির ঢালাও ব্যবসা চালু রয়েছে। শহরের বিলাসবহুল হোটেল, ক্লিনিক নামের এক বিচিত্র চিকিৎসাক্ষেত্রগুলিতে খোঁজ নিলে দেখা যাবে নারীর আত্মসম্ভ্রম কিভাবে সেখানে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। দিনের পর দিন নারীর ইজ্জত আব্রু নিয়ে এই খেলার অন্তরালে যে কি নিদারুণ নারী নির্যাতন চলছে, কত নারীর হৃদয়বিদারক যন্ত্রণার কাহিনী এর পশ্চাতে লুকিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। নারীসমাজের এই ব্যাপক অংশের অবমাননার মুক্তি ঘটানোই হওয়া উচিত নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম লক্ষ্য।

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজেও কান পাতলে নারীজীবনের গুমরানো কান্না শোনা যাবে। এই শ্রেণীর চাকচিক্যময় জীবন, ও উচ্চসভ্যতার তকমা অসংখ্য নারীর দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত। উদার ও প্রগতির পূজারীগণ অনেকেই পরকীয়া প্রেমে মত্ত। এটা তাঁদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। অসংখ্য চরিত্রহীন পরকীয়া প্রেম অথবা দ্বিতীয় প্রেমে বিভোর স্বামীর সংসারে অমানবিকভাবে নির্যাতিতা হচ্ছে নারী। নারী পুরুষের অশ্লীল অবাধ মেলামেশায় আকৃষ্ট পুরুষ সমাজ, অশ্লীল চলচ্চিত্র, পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ, তাঁদের সুসজ্জিত ড্রইংরুমের পর্দার আড়ালে স্ত্রীর প্রতি চরম উপেক্ষা ও অবহেলা প্রদর্শন করে

থাকেন। কি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার শিকার এইসব শিক্ষিতা মর্যাদা-সম্পন্না নারীগণ। এই নির্মম যন্ত্রণার পাথরে মাথা কুটে কত নারী আত্মাহুতি দিচ্ছেন আগুনে পুড়ে, জলে ঝাঁপ দিয়ে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে তার পরিসংখ্যান কে করবে! কে এবং কিভাবে ঘটাবে এদের চরম মুক্তি! এখানেই শেষ নয়, বহু ঘরেই পরিচারিকার প্রতি আকৃষ্ট গৃহস্বামী স্ত্রীর জন্য অসহনীয় যন্ত্রণা ও নির্যাতনের কারণ সৃষ্টি করেন। চাকুরিরতা মহিলাদের অনেককেই বসের কিংবা মালিকের লালসার শিকার হতে হয়। জীবিকার প্রয়োজনে তারা সবরকম পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হন। এখানে তাঁদের নারী সম্মানের, নারী অধিকারের সামান্যতম নিরাপত্তাও রক্ষিত হয়না।

চলচ্চিত্রের যাঁরা শীর্ষস্থানীয়া তাঁদের জীবনযন্ত্রণার চিত্রও আজ অস্পষ্ট নয়। অথচ প্রগতি ও আধুনিকতায় তাঁরা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। এঁদের জীবনে ঘন ঘন স্বামী পরিবর্তন কিংবা স্ত্রী পরিবর্তন কি নারীমর্যাদা ও নারীসম্মানের পরিচয় বহন করে? এতে কি নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? আকাঙ্ক্ষিত প্রগতির পথে নারীদের এই সর্বব্যাপী লাঞ্ছনা যন্ত্রণা, অবমাননা দূরীকরণ সম্ভব কিনা তার মূল্যায়নের সময় হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোতে শুধু মাত্র যৌনস্বাধীনতার ভিত্তিতেই নারী-স্বাধীনতার কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা দেহকেন্দ্রিক হয়ে ওঠায় সমাজে সৃষ্টি হয়েছে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা। গৃহসংসার সন্তান সন্ততির দায়িত্বশূন্য এক উদ্দাম মানসিকতা তৈরী হয়েছে মেয়েদের মধ্যে। গড়ে উঠেছে স্নেহ মায়ামমতাশূন্য এক হতভাগ্য শিশুসমাজ। এ সমাজে শিশুর প্রতি পিতামাতার নেই যেমন মমতা ও কর্তব্যবোধ—সন্তানেরও তেমনি পিতামাতার প্রতি নেই কোন শ্রদ্ধাবোধ। এধরনের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, এহেন সামাজিক উন্নতি মানবসমাজের জন্য কতটা সহায়ক তারই বিশ্লেষণ সর্বাগ্রে হওয়া প্রয়োজন। গোটা বিশ্বব্যাপী এক অস্থিরতা সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশকে দ্রুত গ্রাস করছে। এই ঘনান্ধকারে সন্তান হারিয়েছে পিতৃমাতৃ স্নেহবিজড়িত সুমধুর গৃহকোণ, স্ত্রী হারিয়েছেন গভীর প্রেম বিজড়িত স্নেহের স্পর্শ, স্বামী হারিয়েছেন স্ত্রীর শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রগাঢ় ভালবাসার কোমল স্পর্শ, বৃদ্ধ পিতামাতা হারিয়েছেন সন্তানের কাছে প্রাপ্য মর্যাদা। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সমাজে আজ নারী পুরুষের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে পরস্পরের দৈহিক প্রয়োজনের উপর। ফলে অবাধ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আর তার পরিণতিতে সমগ্র সমাজ আজ 'এইডস'-এর ছোবলের কবলে।

আমাদের দেশের নারীস্বাধীনতা অন্দোলনকারীদের মধ্যে নারী-স্বাধীনতার কোন চিত্র কাম্য তা আজও জনসাধারণের মধ্যে স্পষ্ট নয়। কি চাইব আমরা! আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কি পেতে চাই, সামাজিক স্বাধীনতা থেকে কি পেতে চাই, মানসিক স্বাধীনতা থেকে কি পেতে চাই তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

নারীনির্যাতন বলতে শুধু স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর নির্যাতন যে নয় এ ধারণাটিই সর্বাগ্রে স্পষ্ট হওয়া দরকার। নারীজীবনের অবমাননা, নারী-নির্যাতনের সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজ সংসারে প্রতিনিয়ত ঘটমান নির্যাতনে কত ভাগ্যহীনা যন্ত্রণায় নির্বাক হয়ে যাচ্ছেন। আবার কেউ-বা উচ্ছৃঙ্খল জীবনব্যবস্থায় আকৃষ্ট হয়ে উদ্দাম স্বাধীনতার খোঁজে মুক্তবিহঙ্গের মত সর্বত্রগামী হচ্ছেন। নিজেদেরকে বিকিয়ে দিচ্ছেন বিকৃত স্বাধীনতা-বোধের পায়ে। এই মানসিক বিকৃতির কবলে পড়াও কিন্তু নির্যাতিত হওয়ার নামান্তর। এতে আত্মনির্যাতন ঘটে এবং যতই সাময়িক আনন্দ পাওয়া যাক না কেন শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যেতে হয়।

এই সমস্ত রকম কুৎসিৎ অসামাজিক জীবনযাপন থেকে মুক্তির মধ্যেই আছে নারীসম্মান প্রতিষ্ঠার মূল পটভূমি। এগুলি থেকে মুক্তিই প্রকৃত নারীমুক্তি। মানুষ যতক্ষণ না নীতি ও নৈতিকতার বাঁধন মেনে নেয়, নৈতিক শিক্ষার সুফল স্বীকার করে ততক্ষণ কোনভাবেই এই কুৎসিৎ সামাজিক সংকট থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নৈতিক অনুশাসন রচনা করেছে। প্রতিটি নৈতিক অনুশাসন মেনে চলাই ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ। ইসলাম ধর্মের বিধান ও নৈতিক বাঁধন নারীকে কল্যাণময়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীকে এক সুমহানজীবন ধারা সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নারীর প্রতি পুরুষের আচরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক অধিকারের এক অনন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নির্মল পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে তোলার জন্য ইসলাম ধর্ম একটা ভারসাম্যময় জীবনব্যবস্থার রূপরেখা তৈরী করেছে বিশ্বনারী সমাজের জন্য।

আমাদের মত অনুন্নত দেশে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছে যে দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ। কিন্তু আসলে কি তাই। সবকটি উন্নত দেশেই তো রয়েছে নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার সবরকম সুযোগ। কিন্তু সেইসব দেশে নারীজীবনের অবমাননা কি কম? ইংল্যাণ্ড, আমেরিকায় শিক্ষা ও অর্থাভাবমুক্ত নারীজীবনের কোন

চিত্র দেখা যাচ্ছে? সেখানে মিনিটে মিনিটে ঘটে চলেছে ধর্ষণ ও যৌন-অপরাধের ঘটনা। পশ্চিমী সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যের ঝলকে মুগ্ধ মন অনেক ক্ষেত্রেই অন্ধ অনুকরণের শিকারে পরিণত হচ্ছে। নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে বিপরীতমুখী করে দিচ্ছে। নীতিনৈতিকতাশূন্য পশ্চিমী জীবন দর্শনের ধারক-বাহকগণ যে চরম পরিণাম ভোগ করতে শুরু করেছেন তা দেখে আমাদের দৃষ্টি উন্মোচিত হওয়া উচিত। স্বাধীনতার নামে নারীজীবনকে যে নগ্ন বেহায়াপনার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে আমরা আমাদের নারী সমাজকে সে পথে নিয়ে যাব কিনা সে বিশ্লেষণ এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী। সমগ্র পশ্চিমী নারী সভ্যতা আজ অবাধ মেলামেশা, নগ্নধর্ষণ, হত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ ও অবাধ যৌননেশায় বিভোর। নিউইয়র্ক শহরে কয়েকমিনিট বিদ্যুৎ বন্ধ থাকলে হাজার হাজার ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যায়। এ কি নারীমর্যাদা ও নারীসম্মান প্রতিষ্ঠায় সাফল্যের পরিচয়? সমগ্র নারীসমাজকে মানবতা বর্জিত দুর্গতি ও নির্যাতনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে প্রগতির নামে আদর্শহীনতাই এসবের জন্য সর্বাধিক দায়ী। আধুনিকতা আর প্রগতির যে নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলতা ও যৌন স্বাধীনতার উন্মোচন হচ্ছে ইসলাম ধর্মের নীতিতে তা একেবারেই অনুমোদিত নয়। তাই বলে ইসলামী নীতি নারীর মানবিক অধিকার, সাহসিকতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের অন্তরায় নয়। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মুক্তমনে ইসলামী আদর্শের মূল্যায়ন না করেই ক্রমাগত ইসলামের বৈপ্লবিক আদর্শের বিরুদ্ধে অসার যুক্তিজাল বিস্তার করছেন। ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অকারণ উন্নাসিকতাই যে এর কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামী আদর্শকে কুৎসিৎভাবে আক্রমণের মধ্যে যে বিশেষ কোন মঙ্গল নেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তার প্রমাণ। গত কয়েক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশেও যৌনতা, ব্যাভিচার, অবাধ ও অবৈধ প্রেমের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সমাজকে বেষ্টন করে ফেলছে। মূল্যবোধের এই অভাবই সমাজে নারীনির্যাতনের উৎস তৈরী করছে।

নারীজাতির বর্তমান দুর্গতি সমগ্র মানবতার দুর্গতি। এ দুর্গতি থেকে মুক্তি দিতে পারে বিশ্বস্রষ্টার নির্দেশিত নীতির উপর গভীর আস্থা। মহান আল্লাহ্‌ নারী ও পুরুষের স্বভাবধর্ম ও প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের স্ব স্ব জীবনদর্শন তৈরী করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র ঘোষিত সেই জীবনদর্শন ও নীতি থেকে বিচ্যুতিরই পরিণাম এটা। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিই চলছে এক সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে। সামান্যতম ব্যতিক্রম হলে বিশ্বপ্রকৃতির

সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়, সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। সেই সৃষ্টির এক অংশ মানুষও যদি নীতি বহির্ভূত হয়ে পড়ে, স্বেচ্ছাচারী নীতির মধ্য দিয়ে অবাস্তবতার পথে পা বাড়ায় তাহলে তাকে নিশ্চয় সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। আজ নারীপুরুষ উভয়ের জীবনের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ছে। তার পরিণতি স্বরূপ জন্ম নিচ্ছে ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধি থেকে শুরু করে বহু নিদারুণ সামাজিক সংকট।

মানবসমাজে শান্তিশৃঙ্খলা, নীতিনৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানকে কার্যকরী করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মানুষেরই উপর। আল্লাহ্ মানুষকে কোনভাবে তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য করেন না বরং তাকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকেই। আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার রোধ করার জন্যে আল্লাহ্ মানুষকে সীমারক্ষা করে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। সীমালঙ্ঘন করে মনগড়া নিয়মনীতি সৃষ্টির দ্বারা মানুষ সমাজের মঙ্গলসাধনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। হচ্ছেও তাই। আজ সৃষ্টির সেরা মানুষ এগিয়ে চলেছে পশুত্বের পথে। গোটা নারীসমাজ সহ গোটা মনুষ্যসমাজ শৃঙ্খলা ও সীমা হারিয়ে নিমজ্জিত হচ্ছে দারুণ অশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে। এই সকল বিষয় গ্রন্থটির বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

যখন সারা পৃথিবীতে নারী নির্যাতনের এই চেহারা তখন এই দেশে একটি প্রচার অভিযান অত্যন্ত জোরের সঙ্গে চালানো হচ্ছে যে মুসলমান নারীই আজও অবহেলিত ও নির্যাতিত এবং ইসলামের নীতিই তাদেরকে এই শোষণ ও বঞ্চনার জগতে ঠেলে দিয়েছে। এই ভ্রান্ত প্রচারাভিযান একদিকে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক বিকৃত ভ্রান্ত ধারণাকে বদ্ধমূল করছে অন্যদিকে সম্প্রীতির ক্ষেত্রকে দারুণভাবে আঘাত করছে।

ভারতে ইসলামের আগমন ঘটেছে তেরোশত বছরের বেশী সময়। অথচ এখনও এ ধর্মের নীতি নিয়ম আদর্শ সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একেবারে অজ্ঞ। এর জন্য অবশ্য তাঁরা একাই দায়ী নন। দায়ী মুসলমানরাই সর্বাধিক। যাঁরা শিক্ষার আলোকে সমুজ্জ্বল তাঁরাও কেবলমাত্র ইসলামী নাম বহন করছেন কিন্তু অধিকাংশই বিশেষ করে বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীগণ ইসলামের বৈপ্লবিক ইতিহাসকে জানারই চেষ্টা করেননি, অন্যকে জানানো তো দূরের কথা। ফলে তাঁরাও তথাকথিত প্রগতিশীলতার তকমা পাওয়ার লোভে ইসলামকেই দোষারোপ করে দায়িত্ব মুক্ত হচ্ছেন। আবার অনেকে জানেন ইসলামপ্রদত্ত অধিকারগুলি সম্পর্কে মুসলমান নারী অবহিত হলে, কিংবা সেই আইনগুলি কার্যকরী হলে তাদের সমূহ ক্ষতির

সম্ভাবনা। নিজ কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইতিহাসকে না জানা আত্মবিস্মৃতির সামিল। শিক্ষিত সমাজের কি করে এই আত্মবিস্মরণ ঘটে তা সত্যই বিস্ময়কর। এ বোধহয় একমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালীদের পক্ষেই সম্ভব। আর ইসলাম তো কোন সংকীর্ণ মতবাদ নয়। এটি একটি বিশ্ববরেণ্য বিশ্বস্বীকৃত বিরাট দর্শন। শান্তির পথে মধ্যযুগে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, যে বিপ্লব একটা যুগের যাবতীয় অনাচার, অন্ধকার ও কুসংস্কারকে সরিয়ে এক উজ্জ্বল জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা হল ইসলামী বিপ্লব।

সেই উদার নীতিকে অকারণে আঘাত করে বিচ্ছিন্নতাবোধের বীজ রোপণ করা হচ্ছে বর্তমান ভারতে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থায়ীভাবে গড়তে হলে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরস্পরের ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও জ্ঞানার্জন। যথার্থ প্রগতিশীল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারই এটি করা সম্ভব। কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবে সোচ্চার হয়েই এই বিরাট কর্মযজ্ঞে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। সমগ্র মধ্যযুগে ভারতে কোন ব্যপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। কারণ সেদিন যতই অস্পৃশতা, জাতপাতের বিচার থাকুকনা কেন একে অপরের ধর্মের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল ছিল।

মহিলা বিষয়ক ইসলামী আইনকে কেন্দ্র করে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরী হচ্ছে—তা ইসলামী নীতিকে না জানার জন্যই। এই গ্রন্থে নারীকে দেওয়া ইসলামের অধিকারের প্রকৃত স্বরূপই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। ইসলামের এই আদর্শকে ত্যাগ নয় একে নূতন করে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই যে নারীর মুক্তি সম্ভব তা ইতিহাসের বিস্মৃত ধারা থেকে গ্রন্থের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয় লেখিকা ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে কোরআন, হাদিস, ফেকাহশাস্ত্র ও ইতিহাসের আলোকে খুবই তথ্যনিষ্ঠ করে এইবইটি লিখেছেন। বিষয়টি বর্তমান বিশ্ব-সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বক্তব্যের চমৎকার উপস্থাপনায় সাধারণ থেকে বিদ্বৎ সমাজ খুবই উপকৃত হবেন। বইটিকে তথ্যবহুল করার কাজে লেখিকাকে যৎকিঞ্চিত সাহায্য ও সহযোগিতা করার ভিত্তিতে তাঁরই অনুরোধে মূল বিষটির উপর এই ধারা বাহিক 'প্রসঙ্গ-কথা'র সংযোজন।

বর্তমান সময়ের জন্য সর্বস্তরের মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসার একান্ত কাম্য।

আলহাজ এস. এম. আখতার হোসেন এম. এ
আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

।। পর্দা ।।

পর্দার মর্মকথা ঃ

পর্দা শব্দটি অতি পরিচিত। বর্তমান যুগে গৃহসজ্জা ও গৃহস্বামীর সম্ভ্রান্ত-তার পরিচয় বহন করে পর্দা। সেক্ষেত্রে এটি মর্যাদার প্রতীক—আভি-জাত্যের দ্যোতক। এই পর্দা সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহু আলোচিত একটি বিষয়। সেক্ষেত্রে এটি হয়েছে সমালোচনার শিকার। মনে করা হয়েছে নারীর সমস্ত রকম স্বাধীনতা অপহরণ করে তাকে অবরোধবাসিনী করে তোলাই হলো পর্দার উদ্দেশ্য এবং এটি সম্পূর্ণ অমানবিক ইসলামী বিধান। এই ধারণার পথ ধরে মুসলমান নারী জীবনের পর্দা ব্যবস্থাকে এবং সেইসঙ্গে ইসলামী প্রথাকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে জর্জরিত ও সমালোচনার কুঠারাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল ইসলাম ধর্মে পর্দা শব্দটি বিশেষ অর্থবহ। পবিত্র কোরআনে পর্দা বলে কোন শব্দ নেই। পর্দা আরবী শব্দ নয়। আরবীতে হেজাবের প্রতিশব্দ হিসাবে পর্দা শব্দ ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরআনে 'আহযাব' নামক সুরাতে পর্দা সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরআন নির্দেশিত সেই পর্দার স্বরূপ ও ইসলামী শরীয়ত সম্মত পর্দা কি সেটাই আমার মুখ্য আলোচ্য। এই পর্দাপ্রথা সমাজ-উন্নয়ন ও নারী-প্রগতিতে কতটা প্রতিবন্ধক তাও আলোচ্য।

ভারতীয় উপমহাদেশে পর্দা বলতে মুসলমান মহিলাগণের অবরোধ প্রথাকেই ধরে নেওয়া হয়। সত্যিই কি পর্দাপ্রথা মানে অবরোধ? পর্দাপ্রথা কি নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে? পর্দা কি নারীর প্রগতির অন্তরায়? কোরআনে নির্দেশিত পর্দার প্রকৃত স্বরূপ কি। সে পর্দা গ্রহণ না বর্জন কোন্‌টি বর্তমান সমাজে শ্রেয় তা বিচার করার সময় হয়েছে। কারণ মানুষ দাবি করে সে দিনে দিনে উন্নততর সভ্যতার শিখরে আরোহণ করছে। তা যদি করে তাহলে মানুষ নিশ্চয়ই সেই উন্নততর

সভ্যতার আলোকে শুচিসুন্দর সুখী সমাজজীবনও গড়ে তুলবে। কাজেই তাকে নির্বাচন করতে হবে—সভ্যতা ও আধুনিকতা রূপ বর্বরতা—এ দুটির কোন্‌টি সে গ্রহণ করবে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তি ও নির্দেশক পবিত্র কোরআন (আল্লাহ্‌র বাণী) ও হাদিস (রাসূলের বাণী)। বিশ্বের কোন ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে কোরআনকে এক পংক্তিতে বসানো চলেনা। কোরআন পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়ে আত্ম-প্রকাশের শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে: "এই সেই গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই। সাবধানীদের জন্য এটা পথ নির্দেশক।" (২ : ২)।[১] এরপরই বিশ্ব-মানবের কাছে সরাসরি চ্যালেঞ্জ, "আমি আমার দাসদের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা উপস্থাপিত কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাক্ষীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা (উপস্থাপন) না কর এবং কখনই তা করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন; সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।" (২ : ২৩-২৪)।[২] বিগত চোদ্দশত বছর আগে আল্লাহ্‌-তাআলা মর্ত্যবাসী সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন অনুরূপ একটি সূরা তৈরীর জন্য। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের কোন পণ্ডিত ও বিদগ্ধজন আজও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাড়া দিতে সফলকাম হননি। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এ সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ ধরনের কমপিউটার দ্বারা অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনার বিষয়ে অনুসন্ধান চালান। ঐ কমপিউটার যন্ত্রটি অনুসন্ধানকারীদের উত্তর দিয়েছে যে ৬২৬-এর সঙ্গে চব্বিশটি শূন্য প্রয়োগ করে যে সময়কাল দাঁড়ায় তার মধ্যে পৃথিবীর মানুষের পক্ষে অনুরূপ কোন গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে কোটি বছরে গণনা করা সম্ভব এমন একটি আগামী যুগের মধ্যে এমন গ্রন্থ রচনা সম্ভব হবে না এই

---

১. আল কোরআন—সূরা বাকারা : আয়াত ২

২. ঐ ঐ ঐ ২৩-২৪

হলো ঐশী গ্রন্থ কোরআন। রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে কোরআন সুনির্দিষ্ট পথরেখা মানবসমাজের হাতে তুলে দিয়েছে। একটা সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশই মানুষ কোরআন থেকে পেতে পারে। আরও বড়কথা কোরআনের দেওয়া প্রতিটি নির্দেশ সুদৃঢ় যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ কোরআন নারীপুরুষ উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক গঠনের পার্থক্য অনুসারে তাদের চলার স্বাধীন পথ ঠিক করে দিয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত নারীপুরুষের সমানাধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়: একই মানবদেহের দুটি অঙ্গ হাত ও পা যেমন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্বকীয় অধিকার ভোগ করে বলে হাত কখনই পায়ের অধিকার দাবী করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গের নিজস্ব স্বকীয়তা স্বীকৃত। তেমনি দুটি মানবদেহ নারীও পুরুষ। এ দুই ক্ষেত্রেও নিজ নিজ স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ভোগ করে। তাই নারী পুরুষের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার অধিকারিণী নয়, আবার পুরুষ ও নারীর স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার অধিকারীনয়। কোরআনের অনুশাসন কোথাও কেবলমাত্র নারী কিংবা কেবলমাত্র পুরুষের উপর প্রযোজ্য হয়নি। উভয়ের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। পর্দা সম্পর্কে কোরআন থেকে আমরা যা পাই তা একা নারীর জন্য নয় পুরুষের জন্যও। শালীনতা বা পর্দার ব্যাপারে কেবলমাত্র নারীদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়নি; বরং প্রথমেই পুরুষদের জন্য কোরআন নির্দেশ দিয়েছে—"বিশ্বাসী দিগকে (পুরুষদের) বল: তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনঅঙ্গের হেফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয় অবহিত।" (২৪ : ৩০)[১]। নারীগণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে; (ব্যভিচারগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্ত রাখে) তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আভরণ যেন প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষোদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর

১. আল কোরআন—সূরা নূরঃ আয়াত ৩০

পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌনকামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।" (২৪ : ৩১)[১]

এই দুটি অংশ থেকে আমরা বুঝতে পারছি কেবলমাত্র নারীজাতির উপর পর্দা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এমন পর্দার কথা বলা হয়নি যাতে কোন নারীকে গৃহবন্দিনী থাকতে হবে।

ইসলামের সর্বশেষ সংস্কারক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে বিশ্বজনমণ্ডলীর সামনে তাঁর শেষ যে ভাষণ দেন তাতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন নারীজাতির সম্মানের উপর।

ইসলামের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। কোন অসুন্দরকে ইসলাম প্রশ্রয় দেয়নি। অসংযত পোশাকপরিচ্ছদ, নগ্নতা দ্বারা আর যাই হোক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সৌন্দর্য সৃষ্টি করা অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে।" অর্থাৎ সৌন্দর্য ও সংযম একে অপরের পরিপূরক। পর্দার সঙ্গে এই সৌন্দর্যবোধের সম্পর্ক নিতান্ত কম নয়। পরিমিতিবোধের মধ্যে যাতে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং কোন-রকম অশালীন দৃষ্টি দ্বারা তারা যাতে বিব্রত না হয় সেজন্য কোরআন নির্দেশ দিয়েছে, "হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদিগের রমণীগণকে বল তারা যেন তাদের চাদরের কিছুটা অংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৩৩ : ৫৯)[২]

এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে কোরআনে কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত করার কথা বলা হয়নি। কোথাও গৃহবন্দিনী হয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শালীনতা রক্ষা করতে। বলা হয়েছে অপরকে আকর্ষণ করার মতো অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যেন উন্মুক্ত নগ্নতা দ্বারা প্রকাশ না করা হয়। সেগুলি আবৃত রাখতে বলার অর্থ কারও পায়ে অবরোধ-বেড়ি

১. আল কোরআন—সূরা নূর, আয়াত ৩১
২. " আহযাব আয়াত ৫৯

পরানো নয়—শালীনতাবোধ বজায় রাখা। কাজের সুবিধার জন্য মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীর কেশসৌন্দর্য পুরুষের কামনা-বাসনার খোরাক যুগিয়েছে যুগে যুগে। তাই নারীর কেশকে আবৃত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোরআনে। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কোরআন বারবার সংযমের বাণী উচ্চারণ করেছে—যে কোনরকম যৌন ব্যভিচারের হাত থেকে সমাজকে সুরক্ষিত ও মুক্ত করার জন্য। সেজন্যই নরনারীর যে বয়সে এটি ঘটার সম্ভাবনা থাকেনা সেক্ষেত্রে কোরআনের নির্দেশ তত কঠোর নয়। বৃদ্ধা নারী যাঁদের বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাঁদের ক্ষেত্রে কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—"বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের বহির্বাস খুলে রাখে ; তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" তবুও বেপর্দা থেকে বিরত থাকা উত্তম বলা হয়েছে এই জন্য যে পর্দা প্রত্যেকেরই আভিজাত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করার যে এখানেও মুখমণ্ডল ঢাকার কথা বলা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিমিতিবোধ, যৌন আকর্ষণের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একটি অস্ত্র বিশেষ—এ তো সর্বযুগে সমান সত্য।

সমাজের দর্পণে পর্দার স্থান ঃ

মরুভূমির অধিবাসীদের প্রাকৃতিক কারণে দেহকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করা পোশাক প্রয়োজন। প্রখর সূর্যতাপে সেখানে শরীরের কোন অংশ নিরাবরণ রাখা সম্ভব নয়। তাঁদের পোশাক একাধারে সূর্যতাপ ও অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি থেকে একটি আবরণের কাজ করত। ইসলাম আরব দেশ থেকে বহির্গত হয়ে সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। এই সব অঞ্চলে আবহাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। সেক্ষেত্রে অনাত্মীয়, অপরিচিত পুরুষের সামনে বের হওয়ার জন্যই মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা একটি বহির্বাস পরিকল্পিত হয়েছিল। ঐ বোরকা কলকাতা বা এই ধরনের শহরের দরিদ্র,

নিরক্ষর, অজ্ঞ মুসলমান বস্তী অঞ্চলে প্রচলিত বোরকা নয়। এখানে বোরকা কোন আব্রু রক্ষা করে না···বরং হাসির খোরাক যোগানোর মত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ বোরকা উচ্চতম সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত আছে। যেখানে প্রকৃতই কোরআন নির্দেশিত পথে এটির ব্যবহার প্রচলিত। সেইসব পরিবারে বোরকা নিয়ে মেয়েদের বিব্রত হতে দেখা যায়না। বরং জনাকীর্ণ ট্রামেবাসে শাড়ির আঁচল কিংবা ওড়না নিয়ে বিব্রত হওয়া থেকে রক্ষা করে ঐ বহিরাবরণটি। কলকাতার পথেঘাটে কিছু অবাঙালী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া ভগিনীদের সংযত সৌন্দর্যমণ্ডিত স্বচ্ছন্দ বিচরণ ইসলামের সর্বযুগো-পযোগী দৃষ্টিকেই মনে করিয়ে দেয়।

ইসলাম ধর্মের সুশৃঙ্খল জীবনপদ্ধতির মধ্যে সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে নারীজাতিকে। নারীকে মহামূল্যবান রত্নের মত রক্ষণাবেক্ষণ করা ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের আদর্শ। এটি ছিল তাদের মর্যাদার স্মারকস্বরূপ। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পচর্চা এগুলি থেকে নারীকে বঞ্চিত করার চেষ্টা ইসলামে কোথাও পাওয়া যাবেনা। ইসলামের আদর্শ ও ইতিহাস আলোচনা করলে এ বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

আধুনিক যুগেও রাসূলের (সাঃ) জন্মভূমি সৌদি আরবের নারীদের স্বকীয়তা স্বীকৃত। ইসলামের দুই প্রধান নগরী এবং অন্যান্য শহরে মেয়েরা মসজিদের নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণ করেন। তবে ইসলামের শালীনতা, সৌন্দর্যবোধ ও পরিমিতিবোধের অনুশাসন তাঁদের আচরণে প্রয়োগ করেই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করেন। উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাধীনতা নয়। তাই জামা-আতের সারিতে নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়ানোর মত উগ্র আধুনিকতা মনস্ক স্বাধীনতা ভোগ করার দাবি সে দেশের নারীসমাজ করেননি। মসজিদের চত্বরে তাঁদের জন্য পৃথক একটি স্থান করা আছে। ভারতের মত দেশের বিশৃঙ্খলভাবে বেড়ে ওঠা মুসলমান সমাজ ও জাতির আদর্শ দিয়ে ইসলামকে বিচার করা নেহাৎই অর্বাচীনের কাজ।

স্বাধীনতা কি বেপরোয়া চলাফেরার মধ্যে সীমায়িত না স্বাধীনতা মানস-মুক্তির উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত। প্রজ্ঞায়, জ্ঞানে নারীর মহিমাময় হওয়ার পথে ইসলাম পর্দা দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। ইসলাম এমন একটি

পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত পোশাকের ইঙ্গিত দিয়েছে—যে পোশাকে সব কাজই করা যায়।

এবার প্রশ্ন তাহলে মুসলমান নারী কেন কর্মক্ষেত্রে তেমনভাবে উপস্থিত নন। পর্দাকে এর জন্য দায়ী করা হয়। কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের অনুপস্থিতি। তার জন্যও নাকি ইসলামের পর্দা চেতনা দায়ী। কি হাস্যকর ধারণা। এ ধারণার পিছনে অজ্ঞতা ছাড়া আর কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

প্রথমতঃ নারীর কায়িক পরিশ্রমে পরিবার প্রতিপালন এটি যে কোন জাতিধর্মের সম্ভ্রান্ত পরিবারই পছন্দ করেন না। সেইভাবেই মুসলমানগণও তা পছন্দ করতেন না বা আজও করেন না। এ প্রথা তো বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে এবং বহু উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও আচরিত হয়। এ আদর্শ মেনে চলার অর্থ নারীকে পরাধীনতার নিগড় পরানো নয়। সবযুগেই নারীর মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, বেশভূষা পরিবারের মর্যাদার স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়। মধ্যযুগে নারীর প্রতি যে কোন আক্রমণকে পুরুষ তার মর্যাদার প্রতি সরাসরি আক্রমণ বিবেচনা করত। ইউরোপে এটাই ছিল শিভালরি। এযুগে সে শিভালরির বোধ আর নেই। নারীর মর্যাদা আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে নারী মর্যাদাও সম্ভ্রান্ততার পরিচয় বহন করে।

অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নারী ছিল শ্রমের অখণ্ড অংশীদার। পুরুষের পাশাপাশি শ্রম বিক্রয় করে নারী সংসার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পুরুষের অংশীদার হয়েছে। এই যে স্বাধীনতা এ কী সত্যই নারী জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করে। একেবারেই নয়। তাকে ঘর সামলাতে হয়। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে হয়। তার সন্তান থাকে মাতৃসঙ্গ বঞ্চিত। চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের জন্যই তারা এই কায়িক শ্রম করতে বাধ্য হয়। চূড়ান্ত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভের পরম লক্ষ্য নিয়েই তারা কাল যাপন করে। এই কঠোর পরিশ্রমের পিছনে নিয়ত যে আশা জাগ্রত থাকে তা হলো কবে এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও নিম্নমানের কাজ থেকে মুক্ত হয়ে সুখী গৃহকোণে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। যখনই বাবা, স্বামী অথবা পুত্র সেই স্বচ্ছলতা একক পরিশ্রমে আনতে পারে তখনই মেয়েরা

বহির্জগৎ ত্যাগ করে। বাইরের সকল রকম কাজকর্ম ত্যাগ করে ঘরের চার দেওয়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ায় তারা আদৌ দুঃখিত কিনা সন্দেহ হয়। কায়িক শ্রমের ফলে তারা যে হীনমন্যতাবোধে ভুগত তা থেকে মুক্তি পায়। ঘরে বসতে সমর্থ হওয়ার যে নূতন মর্যাদা তার জন্য তারা গর্ব বোধ করে। গৃহকোণে নূতন অবস্থান আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে। অলস দিন গুজরান করে। পাশাপাশি তাদের পূর্বতন কর্মের মাঝে ফেলে আসা অভাগা বোনেদের জন্য করুণা বোধ করে।

এই উঠতি শ্রেণীর মধ্যেও পর্দা ছিল সম্ভ্রান্ততার প্রতীক। অভিজাত শ্রেণীর কষ্টকর নকল করতে গিয়ে এই উঠতি শ্রেণীর পরিবার-গুলিতে পর্দা অনেকবেশী কঠোরতর আকার ধারণ করে। কারণ এই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার কোন স্পর্শ ছিল না। অভিজাতশ্রেণীর বাইরের ব্যাপারটাই এরা নকল করেছিল। এতই অধ্যাবসায়ের সঙ্গে পর্দাকে তারা লালন করত যে অট্টালিকার বহির্ভাগে একটি ছিদ্র থাকাও সম্ভব ছিল না। এ চিত্র সমাজে আগেও ছিল এখনও আছে। অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও নিম্নপেশাসম্পন্ন সমাজেই পর্দার এ ধরনের কড়াকড়ি দেখা যায়। পর্দা সম্পর্কে ইসলামী ধারণা ও আদর্শ সম্পর্কে এই শ্রেণী একেবারেই অজ্ঞ। আর ভারতে এই সমাজের জীবনযাত্রাকেই ইসলামী জীবনাদর্শ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এখানেই শুরু হয়েছে প্রধান ভ্রান্তি।

অভিজাত সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ পরিবারের নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যুদ্ধকালে কোথাও জয়ের অনিশ্চয়তা থাকলে তাঁরা মেয়েদের সঙ্গে নিতেন না। জয় নিশ্চিত হলে তবে মেয়েদের পাঠানো হতো। জাহাঙ্গীর পত্নী নূরজাহান শিকারে স্বামীর সহযাত্রী হতেন—রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করতেন। জাহাঙ্গীরের ডায়েরি থেকে জানা যায় নূরজাহান একদিনে দুটি বাঘ শিকার করে স্বামীর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করেন। ইবন বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায় তুরস্ক রমণীগণ ঘোড়ায় চড়তেন। কিন্তু তাঁদের পোশাক ছিল সংযত। বিবাহোৎসবে কনে জাঁকজমকপূর্ণ পালকিতে যেতেন। বাড়ীর অন্যান্য মহিলাগণ বরানুগমন করতেন ঘোড়ার পিঠে।

পর্দার আক্ষরিক অর্থ আবরণ। এ আবরণ সেই আবরণ যা আব্রু রক্ষা করে। ইসলাম ধর্মে এই আব্রু রক্ষা জীবনের অন্যতম প্রধান আদর্শ হিসেবে স্থান পেয়েছে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ইসলাম আব্রু রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই। নারীর সামনে নারীর বা পুরুষের সামনে পুরুষের আব্রু রক্ষাও ইসলাম ধর্মে পর্দার অঙ্গ। চার দেওয়ালের মধ্যেই হোক আর বাইরেই হোক সর্বত্র এ আব্রু রক্ষা মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পালনীয় বিধান। গভীর অন্ধকারে বা গৃহ অভ্যন্তরে থাকা কালেও কারো নিরাবরণ হয়ে থাকার বিধান ইসলামে নেই। একান্ত নির্জন বদ্ধ গৃহ কোণেও উলঙ্গ হয়ে নামায পড়া বৈধ নয়। সতর অর্থাৎ নারী বা পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট পোযাকাবৃত অংশ উন্মুক্ত রাখা ইসলামের ধর্মীয় বিধানে পাপ বিশেষ। কোন পুরুষের গৃহেও কোন পুরুষের অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুতরাং পর্দা আসলে আব্রু ও শালীনতা রক্ষা করার মত একটি উন্নত সভ্যতা। এই অভিজাত সুলভ আচরণ দিয়ে মানুষকে বিভিন্ন অশ্লীল কাজ থেকে সরিয়ে রেখে উন্নত মানসিকতা সৃষ্টিই পর্দার মূল লক্ষ্য। তবুও ভারতীয় উপমহাদেশে অদ্ভুতভাবে ইসলামী পর্দার সঙ্গে অবরোধ প্রথা একাকার হয়ে গেছে। ভারতের আপামর জনসাধারণের বদ্ধমূল ধারণা যে এ উপমহাদেশে প্রচলিত নারী অবরোধ প্রথা মুসলমান বিজয়ের প্রত্যক্ষ ফল। প্রথমতঃ মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য জাতিগণ মুসলমান পরিবারের মহিলাগণকে অন্তরালবর্তিনী দেখে নিজেদের সমাজেও তার প্রচলন করে। দ্বিতীয়তঃ বিজয়ী জাতির পুরুষদের কামনার অগ্নি থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের নারীগণকে অন্দর মহলে অবরোধ করেন। বাইরে বের হতে হলে তাঁরা ভাল করে চাদর জড়িয়ে বের হতেন, যাতে তাদের সৌন্দর্য, বিজয়ী শাসকদলের পুরুষগণের নজরে না পড়ে। এই অপমানজনক অবাস্তব কাহিনী গড়ে তুলেছিল বৃটিশরা। পরবর্তীকালে বৃটিশদের তৈরী করা কাহিনীকে চিরস্থায়িত্ব দান করেছেন উগ্র মুসলিম বিরোধী সংকীর্ণ ভারতীয় লেখক ও ইতিহাসবিদগণ। আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারব এই কাহিনীটি নেহাৎই মনগড়া অবাস্তব গল্প ব্যতীত কিছুই নয়।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সেযুগে

সারা পৃথিবী নারীগণের অবরোধ প্রথার সঙ্গে কমবেশী পরিচিত ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রন্থ থেকে জানা যায় পারস্যের নারীগণ নিজেদেরকে পুরুষ দৃষ্টির আড়ালে অন্দরমহলে আবদ্ধ রাখতেন। লারুস নামক জনৈক ফরাসী লেখক তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়াতে লিখেছেন গ্রীক মেয়েরা ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় এক ধরনের আবরণী দ্বারা নিজের চেহারাকে ঢেকে নিতেন। আসিরীয় মেয়েদের মুখাবরণ পরিধান ও অন্দরমহলে থাকার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। প্রাক ইসলামিক যুগের আরবের ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখা যায় আরবের মরু বেদুঈনগণ সর্বত্র ভ্রমণ করলেও শহরের নারীগণ নিজেদের অন্তরালবর্তী করে রাখতেন। চীন জাপানেও মেয়েদের বিচরণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। এক কথায় বলা যায় তাদের সারা জীবন পুরুষ জাতির উন্নতি ও সুখের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। লারুসের গ্রন্থ থেকে জানা যায় রোমীয় স্ত্রীলোকগণ পর্দা ছাড়া বাইরে বের হতেন না।

(ভারতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত নারীগণ সর্বত্র গমনাগমনের স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তার অব্যবহিত পরেই ভারতের নারী সমাজের উপর অবরোধের প্রথা বলবৎ হয়। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে তা কঠোরতর হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীজাতির স্বাধীনতাকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। মনুর শাসনকে অনুসরণ করে কৌটিল্য নারীকে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন মূল্য দেননি।) নারীচরিত্রের মধ্যে তিনি কেবল সংহতিনাশক শক্তিই দেখেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনভাবে নারীর ভূমিকা তাঁর স্বীকৃতি পায়নি। বরং তাঁর মতে নারীর ভূমিকা সেখানে সর্বনাশ ডেকে আনে। সম্রাট রাত্রে বিশ্রামে যাওয়ার আগে তাঁর কক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করার নিয়ম তৈরী করেন কৌটিল্য। সম্রাটের কক্ষে গুপ্তভাবে কোন নারী যাতে অবস্থান না করতে পারেন তাই এ ব্যবস্থা। তিনি মেয়েদের পুরোপুরি ভাবে অন্দরমহলে অন্তরীণ করেছিলেন। দিবালোকে বহির্গতা নারীদের শাস্তিস্বরূপ জরিমানা ধার্য করেছিলেন কৌটিল্য। নিশীথে বাড়ির বাইরে বের হলে জরিমানার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল দ্বিগুণ। কোন পুরুষের কাছে যাওয়ার অপরাধে এ জরিমানা তারও দ্বিগুণ হয়ে যেত। জ্ঞাতিগণের গৃহে যাওয়ার অনুমতি ছিল

শর্ত সাপেক্ষ। মৃত্যু, ব্যাধি ও অন্যান্য বিপদাপদের সময়। মহিলাগণ সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে অন্য একটি মহিলা সঙ্গীকে নিয়ে তবেই বাইরে বের হতে পারতেন। ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে মুসলমান আগমনের বহু পূর্বে ভারতে শুধু পর্দাপ্রথা নয় কঠোর অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতের নারী অবরোধ প্রথা কোনভাবেই মুসলমান বিজয়ের পরিণতি নয়। ইসলাম নারীর উপর থেকে প্রাচীনকালের কঠোর অবরোধপ্রথা তুলে দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার স্বাধীনতার অধিকারকে। স্বীকৃতি দিয়েছিল তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে। প্রতিষ্ঠিত করেছিল আত্মসম্ভ্রমমণ্ডিত ভূমিকায়। ইসলাম নারীজাতির শিক্ষা ও কর্মজীবনের অন্তরায়কারী কোন আইন তৈরী করেনি। বরং জ্ঞানচর্চায় নারীর পরিপূর্ণ অধিকারের কথা ঘোষণা করেছিল। ইসলাম নারীকে সর্বযুগে শালীনতাপূর্ণ পোষাকে আবৃত করার বিধান প্রচলিত করেছে।

একদিকে কৌটিল্যের অনুশাসনের ফলে এদেশের মেয়েরা ছিল কঠোরভাবে গৃহবন্দিনী। অন্যদিকে নবাগত মুসলমান পরিবারের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে বের হতেন, শিকারে যেতেন, শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে এই সামাজিক দৃষ্টান্ত ছিল একটি অভিনব ব্যাপার। কারণ ভারতীয় নারীগণ তার বহু পূর্ব হতেই গৃহে অন্তরীণা। ফলতঃ সেই পরিবেশে নারীগণের এই অবাধ বিচরণ আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে যে ফিরোজ শাহ তুঘলকই প্রথম মুসলমান মেয়েদের সঙ্গী ব্যতীত বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন।

এই সময় থেকে মুসলমান সমাজ জীবন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মেয়েদের স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্ররূপে এলো অন্দরমহল। এই অন্দরমহলগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। সারাক্ষণ সেগুলি প্রাণোচ্ছলতায় ভরপুর থাকত। মুঘল আমলে নারীগণ এই অন্দরমহল বা জেনানা মহলগুলির মধ্যে পূর্ণ মর্যাদা ও স্বাধীনতার সঙ্গে জীবনযাপন করতেন। পুরুষগণ খাওয়া ঘুমানো বাদে বাকি সময় কাটাতেন বহির্মহলে। অন্দরমহলগুলি ছিল যেন এক একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য।

ভারতের অধিকাংশ মুসলমান পরিবার এই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত

হয়ে উঠলেও এর ব্যতিক্রমও ছিল। কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁরা এদেশেও কোরআন নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করতেন এবং আজও করেন। এইসব পরিবারের পুরুষগণ দূরে কর্মক্ষেত্রে গমন করলে মহিলাগণই কৃষিকর্ম, সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। আবার ঐ একই এলাকায় যেসব পুরুষগণ বাড়ীতে থাকতেন তাঁদের পরিবারের মহিলা-গণের বাইরের কাজ করার প্রয়োজন হতো না তাই করতেন না বা এখনও করেন না। এর অর্থ এই নয় যে পরিবারে তাঁদের মত প্রকাশের বা অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল না বা নেই। শিক্ষাদীক্ষা শিল্পচর্চা সব কিছুতেই এঁরা অংশগ্রহণ করেন। বাইরের কাজে বের হলেই স্বাধীনতা উপভোগ করা যায় এই মনোভাব এঁদের মধ্যে কাজ করে না।

ভারতে ইংরেজ আগমনের ফলে এদেশের জনসাধারণ একটি নূতন জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। ইংরেজ রমণী কেবলমাত্র মুখমণ্ডল নয় বক্ষ উন্মুক্ত করা পোষাক এই উপমহাদেশের মানসিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কিছু সময়ের জন্য এদেশের জনসাধারণ এই নূতন জীবনধারার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চললেও এই সম্পূর্ণ অপরিচিত জীবনযাপন পদ্ধতি, অত্যন্ত ধীরগতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এদেশের মানসিকতায় শিকড় গাড়ছিল। বুদ্ধিজীবীগণ দেখলেন ইংরেজদের মোকাবিলা করতে হলে তাদের ভাবধারা ধ্যানধারণা গ্রহণ করেই তাদের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার হলো দেশের অর্ধেক সংখ্যক মানুষকে গৃহবন্দী রেখে কোনমতেই স্বাধীনতা আনয়ন সম্ভব নয়।

এইভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন মেয়েদের বাইরে নিয়ে এলো—এটাই বৃটিশ শাসনের পরোক্ষ ফল। কিন্তু ইংরেজ রমণীগণ বাইরে উন্মুক্ত পোশাকে বের হতেন বলেই সমক্ষমতা ভোগ করতেন তা একেবারেই নয়। তবুও মেয়েদের অন্তরালে রাখাটা তাদের প্রতি ঘৃণারই প্রকাশ এই ধারণা পাশ্চাত্যে প্রচলিত ছিল। শাসককুলের লক্ষ্য ছিল এদেশে অনুসৃত পর্দা অপসারণ করা। মুসলমান পরিবারে পর্দার সঙ্গে সম্মান, পবিত্রতার ধারণা ওতপ্রোত-ভাবে যুক্ত ছিল। তাই তাঁরা বিশেষ পদ্ধতিতে বহির্জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্দরমহলে তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। তাই তাঁদেরকে

বাইরে বেরোনোর মত উপযুক্ত হওয়ার জন্য কোন প্রস্তুতি নিতে হয়নি। লেডি ওয়াজির হাসান, লেডি আব্দুল কাদের, লেডি মোহাম্মাদ সফি, বেগম শাহ নওয়াজ, লেডি ইমাম, তায়েবজী পরিবারের মহিলাগণ, রহিমতুল্লাহ্ পরিবারের রমণীগণ বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হলেন। শহীদ সুরাওয়ার্দির মাতা বেগম সুরাওয়ার্দি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা পরীক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। বাঙালী মহিলা পরীক্ষক হিসাবেও তিনি প্রথম স্থানাধিকারী। বহু রাজন্য শাসিত প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে মেয়েদের উৎসাহিত করেন। স্যার মির্জা ইসমাইলের পত্নী লেডি ইসমাইল ছিলেন মাইশোর গার্লস গাইডের প্রধান কমিশনার। হায়দ্রাবাদের নিজাম মেয়েদের স্কুলকলেজীয় ডিগ্রী গ্রহণে উৎসাহিত করেন। ১৯২৯ সালে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা বাইরের অনুষ্ঠানে পিতার সঙ্গী হয়ে কলকাতায় আসেন। হায়দ্রাবাদের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের স্ত্রীকন্যাগণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন। কিন্তু তাঁরা ইসলামীয় মতে মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে সম্পূর্ণ শরীর আবৃত রাখতেন। ' ভূপালের নবাব সুলতান জাহান বেগম প্রদেশের শাসনকার্য দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন। সারা ভারতে তিনি নানান কাজে ঘুরতেন। এমনকি লণ্ডনে বাকিংহাম প্রাসাদের ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলেন বোরকা পরে। তাঁর কন্যা ও পুত্রবধূগণ উচ্চতম শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ইসলাম অনুসারী পোশাক প্রগতির অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি ইসলামে নারীকে পরাধীনা করার জন্য ও করার মত কোন পর্দা প্রয়োগ করা হয়নি। সমাজকে সুন্দর করার জন্য, নিয়মশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বিশেষ জীবনপদ্ধতির প্রচলন করতে চেয়েছে মাত্র। সেজন্য কেবল নারী নয় পুরুষের জন্যও অনুশাসন রচনা করেছে। শালীনতা বজায় রেখে প্রয়োজনীয় সকল কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার স্বীকার করেছে। পর্দা দ্বারা নারীকে অন্তরীণ করা হয়ে থাকলে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ঘোষণা করতেননা, "প্রত্যেক নারীপুরুষের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)।" অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পার্থক্য ইসলাম করেনি। পুরুষ ও নারীর স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা ইসলাম মেনে নিয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীতে নারীআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে কোথাও এমন শপথ উচ্চারিত হয়নি—আমরা মেয়েরা নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হয়ে জীবন গড়ে তুলব—কোথাও শোনা যায়নি এমন প্রতিজ্ঞা আমরা মেয়েরা পুরুষের পাশে সমান তালে পা মিলিয়ে গড়ে তুলব এক নূতন পৃথিবী। পরিবর্তে শোনা গেছে—ছিঁড়ে ফেল পর্দা, ঘুচিয়ে ফেল আবরণ। কী চমৎকার মুক্তিবোধ! নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে আবাহন করা হলো না মানসিক বলিষ্ঠতাকে। আবাহন করা হলো এমন এক পোশাকের যে পোশাকে নারীদেহের প্রতিটি রেখা উৎকটভাবে রেখায়িত হতে পারে। আধুনিকতা ও প্রগতির অগ্রগতির সঙ্গে নারীর পোশাক পুরুষের পোশাককে ব্যঙ্গ করে আরও নগ্ন হয়েছে। পুরুষজাতিও নিজের পা দেখাতে লজ্জা পায় কিন্তু নারীর আবরণ হাঁটু ছাড়িয়ে জঙ্ঘায় উঠে পড়েছে। কোন মার্জিত পুরুষকে আজ পর্যন্ত হাত কাটা, পেট উন্মুক্ত করা সার্ট পরে অফিস আদালতে স্কুলকলেজে যেতে দেখা যায়নি। কিন্তু নারীর ব্লাউজ হ্রস্ব হতে হতে কাঁচুলিতে পরিণত হয়ে নারীপ্রগতির ধ্বজা উড়িয়েছে। বর্তমান দশকে এসেছে সালোয়ার কামিজের নগ্ন স্বাধীনতা। পাশাপাশি পুরুষের পোশাক যত উদ্ভট রূপেই আসুক না কেন কখনই নগ্নতা প্রকাশ করেনি। এই যে নিজের শরীরকে দেখানোর মনোভাব—এমন কুৎসিৎ পোশাকের ব্যবহার একি কেবল রুচিবোধের অভাবে হয়? মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এর পিছনে রয়েছে এক সর্বনাশা ও ভয়ংকর কারণ। মনস্তত্ত্বে বলে প্রদর্শনীবৃত্তি মনোবিকারকে প্রকাশ করে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে যৌনঅঙ্গের প্রদর্শনীর মনোভাব বিকৃতির পরিচায়ক।

নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক শরীরগত পার্থক্য প্রকৃতির নিয়মেই রয়েছে। এই পার্থক্য গুলো ছাড়াও আরও অনেকগুলি পার্থক্য রয়েছে যা বিজ্ঞান সম্মত। যেমন পুরুষের দৈহিক গঠন নারী অপেক্ষা বৃহৎ। নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক বাকপটু, পুরুষের কণ্ঠস্বর জোরালো ও নিরস কিন্তু নারীর কণ্ঠস্বর কোমল ও সরস। পুরুষ অপেক্ষা নারীর শারীরিক বৃদ্ধি দ্রুত। চিকিৎসা শাস্ত্রের কল্যাণে আমরা এও জেনেছি যে বালক ভ্রূণ অপেক্ষা বালিকা ভ্রূণের বৃদ্ধি দ্রুত। আবার নারী অপেক্ষা পুরুষের পেশীর বৃদ্ধি বেশী

পুরুষ অপেক্ষা নারী অল্প বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং কম বয়সে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। বালক অপেক্ষা বালিকারাই দ্রুত কথা বলতে শেখে। সাধারণতঃ মস্তিস্ক নারী অপেক্ষা পুরুষের বেশী কিন্তু শারীরিক গঠন অনুসারে নারীর মস্তিষ্ক বেশী। পুরুষের ফুসফুস নারী অপেক্ষা বেশী বায়ু ধারণ করতে পারে। পুরুষ অপেক্ষা নারীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার গতি দ্রুত। এ সব থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে বিধাতা নারীকে এক ধরনের পরিবেশ উপযোগী আর পুরুষকে অন্য ধরনের পরিবেশ উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম এই পার্থক্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঘোষণা করেছে প্রত্যেকে স্ব স্ব পরিধিতে, পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। তবে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজ নেতারা যে নারী স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন তার সঙ্গে ইসলামী শরীয়তের ঘোষণা এক নয়। এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে হাত আর পায়ের পার্থক্যের মত, যেমন একই মানব দেহের দুটি অঙ্গ যদি হঠাৎ সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে যায় তাহলে যে ধরণের বিভ্রাট দেখা দেবে ঠিক তেমনি নারী যদি পুরুষের সঙ্গে সম অধিকার নিয়ে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাতেও সমাজ বিভ্রাট ঘটবে বলেই ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান মনে করে। তাই প্রত্যেককে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের পূর্ণ অধিকার দিয়েও নারী পুরুষের সম অধিকারী বলে স্বীকার করে না। এই পার্থক্য বাহ্যিক নয় গুণ-গত ও দেহগত। একে মেনে নিয়ে নারী স্বাধীনতা কল্পনা করলে ইসলামী বিধানের সঙ্গে সামান্যতম পার্থক্য দেখা যাবে না।

অশালীন বেশভূষার সাহায্যে যৌনঅঙ্গের নির্লজ্জ প্রদর্শন করে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের আর একটি গভীর কারণ অবাধ যৌনতার প্রতি আকর্ষণ। উৎকট পোষাকপরিচ্ছদের মাধ্যমে শরীর প্রদর্শন করে এঁরা কি পেতে চান?

ইউরোপ আমেরিকার নারী স্বাধীনতা যে নগ্নতায় পৌঁছেছিল তার পরিণতি আজ গোটা বিশ্বের সামনে এক ভয়াবহ সমস্যা আকারে আত্ম প্রকাশ করেছে। ঐ দেশগুলিতে নারী স্বাধীনতার নামে প্রায় নগ্ন পোষাকই নারীর সৌন্দর্য বিকাশের উপকরণ হিসেবে প্রচলিত হয়েছিল। আর তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অবাধ ও উচ্ছৃঙ্খল দেহ ভোগের কামনা বাসনা। অবশেষে তা এই বিংশ শতকে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে ঐ সকল উন্নত দেশও

দিশেহারা এবং সমগ্র বিশ্ব শঙ্কিত। এর থেকেই এসেছে মানব দেহে এক ভয়াবহ ও সংক্রামক জীবন সংহারক ব্যাধি। তাই ঐ সব দেশের সমাজ বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্র নেতারা বিভ্রান্ত হয়ে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে শেষে "নারী-দের কর্মক্ষেত্র গৃহ এবং সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ রচনা" এমন একটি বিধান সমাজে প্রচলনই এর একমাত্র প্রতিকার বলে নারীদের জন্য পৃথক গৃহভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা করছেন। এতো দেখি এতকাল পরে হযরত মোহাম্মাদের (সাঃ) নির্দেশ মান্য করা! "নারীদের কর্মক্ষেত্র গৃহ, তারা গৃহের সর্বময় কর্ত্রী।"[১] তিনিতো ১৪০০ বছর পূর্বেই এ ঘোষণা করেছেন।

পবিত্র কোরআনে বহু পূর্বেই এই উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নারীপুরুষকে যৌননেশাগ্রস্থ করবে এবং এই যৌন নেশা মারাত্মক ব্যধির সৃষ্টি করবে। প্রসঙ্গত পৃথিবীর এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী প্রাচীন জাতির পরিণতির কথাও বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। সে দেশের নারী-পুরুষরাও এক যুগে এমনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়েছিল আর তার পরিণতিতে এইডস এরই মত কোন মারাত্মক যৌনব্যাধি সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখনও আল্লাহ্ ঐ জাতির কাছে নবী পাঠিয়ে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু ঐ সামাজিক কাঠামোকেই তারা উন্নত সভ্যতা আখ্যা দিয়ে নবীর কথা অমান্য করেছিল। ঐ সভ্য জাতির ধ্বংসের ইতিহাস ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন। আজকের পৃথিবীর আরব মানচিত্রের 'বাহ্‌রে মাইয়্যেত' যাকে ইংরাজীতে 'ডেডসী' বলা হয় সেটাই এক কালের কৃষ্ণসাগরের পূর্ব উপকূলের ভূখণ্ডে গড়ে ওঠা সেই জাতিরই ধ্বংসস্তূপ। ১৯৩৯-৪০ সালের ভূতাত্ত্বিক খননেও ঐ সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে। ঐ সমগ্র ভূখণ্ডটি আজও বিষাক্ত সালফার লবণে আবৃত, যা সবরকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য মারাত্মক। কোরআনে বর্ণিত ঐ বিধ্বস্ত বিষাক্ত এলাকা আজও অবাধ যৌনকামী ও যৌনাচারীদের পরিণতির জন্য এক অমোঘ হুঁশিয়ারী সংকেত ঘোষণা করছে সভ্য দুনিয়ার সভ্য মানুষের কাছে।

১. হাদিস

আমাদের সমাজও আজ সর্বনাশা এইডস রোগের দুর্বার আক্রমণের মুখে এসেছে। এইডস তার সর্বগ্রাসী আক্রমণের উদ্ধত ফণা নিয়ে দুর্বার গতিতে সমাজকে আক্রমণ করেছে, কোরআনে এই রোগ সৃষ্টির যা যা কারণ ও পরিণতি ও প্রতিফল উল্লিখিত হয়েছে ঠিক সেই ভাবে। তাইতো আমেরিকার কম্পিউটার বিজ্ঞান কোরআনের সৃষ্টি রহস্যের আবিষ্কার করার চেষ্টা করে দেখেছে। দেখেছে এধরনের একটা গ্রন্থ রচনায় মানুষ পৃথিবীর সবকিছু বিসর্জন দিয়ে সচেষ্ট হয়ে ৬২৬ এর পিঠে আরও ২৪টি শূন্য দিয়ে যত বছর হবে ততদিনেও এর কিনারায় পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

দেশকাল অনুসারে শালীনতাবোধ সম্পন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিতা নারীকে যে কোনরকম জীবিকা গ্রহণে ইসলাম কখনই বাধা দেয়নি : ইসলাম ধর্মের নিয়মনীতি সম্বলিত জীবন ব্যবস্থায় নারীজাতির সুরক্ষা ছিল ধর্মের মত মূল্যবান। নারীর প্রতি আক্রমণ ও নারীর অবমাননাকে পুরুষ তার নিজের অপমান বলে মনে করত। শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিহিতা নারী হয়ে উঠেছিলেন পারিবারিক মর্যাদার স্মারক। আমাদের দেশের নবজাগরণ আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরালে দেখব ব্রাহ্ম মেয়েরা দলে দলে শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, পত্রিকা প্রকাশনার আসরে বের হয়েছিলেন—অন্দরমহলের বন্দীত্ব ভেঙে। কিন্তু মাথার উপর ঘোমটাটি ছিল তাঁদের পারিবারিক মর্যাদার দ্যোতক। সেটিকে ফেলে দেওয়ার মত বিকৃতি তাঁদের মধ্যে ঐ সময় দেখা যায়নি। শতাব্দীর পদপ্রান্তে এসে প্রগতির অগ্রগতির প্রতীক হয়ে উঠল পোশাকের সংকোচন।

ইসলামের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিবারের প্রতিটি মহিলার স্থান ও মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। সে সময় মহিলাদের সমস্তরকম অপমান, কলঙ্ক থেকে রক্ষা করে তাদের সম্মানকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারে জাগ্রত দৃষ্টি ছিল সমাজের। এই আদর্শই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল আদর্শ। সেই যুগেও মহিলাগণ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক, সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টি মূলক ও নারী জাতির উন্নতিমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। নিজেদের কাজের দ্বারা অন্যদেরও সমাজসেবার কাজের মধ্যে নিয়ে আসতেন। একই নামের দুজন মহিলা এর

জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। তাঁরা হলেন জয়নাব। তাঁরা দরিদ্র মানুষের সেবার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও খলীফাদের শাসনকালে বহু মহিলা সাহিত্যিক কবি প্রকাশ্য জনসমাবেশে শালীনতা-পূর্ণ পোষাকে আবৃত হয়ে ভাষণ দিতেন ও যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, পুরুষদের সঙ্গে বিতর্ক সভায় যোগ দিতেন। এক মহিলার নিজেই এসে হযরতের কাছে নিজের বিবাহ প্রস্তাব দেওয়াতো হাদিস স্বীকৃত।[১] এজন্য কেউ তাকে তিরস্কার করেনি। এতেই বোঝায় ইসলামের চেষ্টায় নারীর মর্যাদা কত উচ্চপর্যায় পৌঁছেছিল।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুগে যুদ্ধে হতাহতদের শুশ্রূষার প্রয়োজন হতো। রাসূল (সাঃ)-এর সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌র সাহাবী আনাস বর্ণনা করেছেন ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও তাঁর মাতা উম্মে সোলায়েম বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে পিঠে করে পানির মশক বহন করেছিলেন। আহতদের সেই পানি পান করিয়েছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে আরও যারা এ কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের একজন হলেন উম্মে সালীৎ। মোআওয়েজের কন্যা রোবাইয়ে (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সঙ্গে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতাম। লোকদের পানি পান করাতাম। তাদের আবশ্যকাদির ব্যবস্থা করতাম। আহতগণের ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতাম এবং নিহতদের লাশ ও আহতদের মদিনায় পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতাম।"

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা যখন বয়ঃপ্রাপ্তা তখন ওহোদের যুদ্ধে সশরীরে উপস্থিত হয়ে পিতার শুশ্রূষা করেছিলেন। মদিনা অবরোধের সময় রুফায়দা নাম্নী মহিলা সাদ ইবনে মুয়াজ আহত হলে শুশ্রূষা করেছিলেন। খাইবার যুদ্ধে মুসলমান মহিলাগণ যুদ্ধে হতাহতদের শুশ্রূষা করার জন্য মদিনা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। এই যুগের প্রতিটি যুদ্ধে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয় তিনি মেয়েদের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেছিলেন। ইসলামের অনুশাসন

---

১. বোখারী শরীফ : হাদিস নং ২০২৩

২. হাদিস

অনুযায়ী প্রত্যেকেই পর্দার বিধান মেনে এই ভাবে যুদ্ধে যোগদান করতেন, হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে বিশ্ব সমাবেশে উপস্থিত থাকতেন। ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা মেয়েদের এসব কাজে মোটেই বাধা সৃষ্টি করেনি।

দেখা যাচ্ছে কোনক্ষেত্রেই নারীসমাজকে অবরোধের অন্তরালে ইসলাম নিক্ষেপ করেনি। এবং ইসলামে পর্দা অর্থ অবরোধও নয়। পরিচ্ছদ ও আচার আচরণের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যে বিশুদ্ধ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি-ফলন ঘটে ইসলামে তার নাম পর্দা। এ পর্দা কোনভাবেই নারীর স্বাধীনতা অপহরণ করে তাকে গৃহভ্যন্তরে নিক্ষেপ করেনি। শিক্ষা, সমাজ-সেবা, রাষ্ট্রপরিচালনা সর্বক্ষেত্রে নারীর শালীনতাপূর্ণ বিচরণ ইসলামে স্বীকৃত। এই শালীনতার শর্ত ইসলাম পুরুষের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োগ করেছে।

বর্তমান যুগে আমরা যে নারী স্বাধীনতার জোয়ার দেখতে পাচ্ছি—তা মানসিক বলিষ্ঠতার প্রকাশ নয়। সচেতন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এ আন্দোলনে সামান্য। চিন্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা এখানে অনুপস্থিত, নেই কোন সুস্থ মূল্যবোধ। একটা অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে কেবল উৎকট পোশাক—শারীরিক নগ্নতার মাধ্যমে নিজেদের জাহির করে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার ধ্বজা ওড়ানো হচ্ছে। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবনচর্যার ধর্ম। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার বাতাবরণ দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ বা নিষ্ক্রিয় করে রাখার ধর্ম নয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সুস্থ মূল্যবোধকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম। আর সেগুলোও ইসলামের ধর্মাচরণেরই অঙ্গ। কারও স্বাধীনতা অপহরণ করে নয়, নারীপুরুষ প্রত্যেকের স্ব স্ব জীবনচর্যার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে একটি কলুষমুক্ত সমাজ গড়ার পথের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। যাঁরা সে সুস্থ জীবনবোধ মানতে চাননা বা অনুসরণ করতে চান না তাঁদের তা করার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তখন তাদের নিজেদের ইসলাম মতাবলম্বী বলে জাহির করার স্বাধীনতাটুকু ত্যাগ করা উচিত। পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে "ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই।" কারণ কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক ইসলাম এত সুনির্দিষ্ট ধর্ম যে, কোন গোঁজামিল দ্বারা এ ধর্মকে অনুসরণ করা যায় না।

সংকীর্ণ ইসলাম বিরোধী মানসিকতা ছেড়ে যদি সত্যিকার মানব কল্যাণকর উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ইসলামের এই শুচি সুন্দর আদর্শকে নিরপেক্ষ ভাবে সমাজ কল্যাণে প্রয়োগ করা যায় তবেই পুনরায় নারীর মূল্যবোধ, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরও গোঁড়ামি ছেড়ে প্রকৃত ইসলামী আদর্শকেই সমাজে প্রতিষ্ঠায় জন্য আগ্রহী হতে হবে। তবেই সে আদর্শ অন্যদের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হবে। ইসলাম প্রচারের যুগে ইসলামের এই আচরণ বিধি বিশ্ব মানবের মধ্যে এক বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি করেছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে তৎকালীন রোম, কার্থেজ, স্পার্টা ও বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমার এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ হবে। কিভাবে ইসলামের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আকৃষ্ট হয়ে একের পর এক দেশ ইসলামের পদতলে লুটিয়ে পড়েছে, নিজেদের রক্ষা করেছে, সমাজে সুস্থ মানসিকতা ফিরিয়ে এনেছে। আজ আবার সমাজ ঐ জটিল পঙ্কিল আবর্তে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে তা থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের বহু পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সমাজ বিধানই যে সর্বাধিক সহায়ক সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় মানসিকতায় যদি ইসলাম কাতরতা না থাকত তাহলে আজকের ভারতীয় সমাজ ইউরোপের চেয়ে যে বেশি উন্নত হত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী মানবেন্দ্রনাথ রায় তার 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেছেন— "দুর্ভাগ্য আমাদের, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামের সংস্কৃতি সম্পদ থেকে ভারতবর্ষ তেমন উপকৃত হতে পারেনি কেননা অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবার যোগ্যতা তার ছিলনা।"

ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থার পথ নির্দেশ নিয়ে এসেছিল বিশ্বমানব সমাজের জীবনে। তাই কেবলমাত্র ধর্মীয় আদর্শ প্রচারে ইসলাম সীমাবদ্ধ ছিলনা। ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটি সুস্থ চিন্তার বিকাশ ঘটাতে, মানুষকে সুস্থ আদর্শের সন্ধান দিয়েছে প্রতি পদক্ষেপে। পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মনীতির নির্দেশ দিয়ে ইসলাম মানুষকে সংযত সভ্যতায়, শালীনতাপূর্ণ মানসিকতায় দীক্ষা দিয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে নারী পুরুষের পোষাক ঃ

মুসলমান মহিলা ও পুরুষের পোষাক পরিকল্পনায় কোরআন ও সুন্না ভিত্তিক কয়েকটি নীতি রয়েছে। নীচে সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। নারী পুরুষের শরীরের যে অংশকে কোরআন আবৃত রাখার নির্দেশ দান করেছে সেই অংশকে বলা হয় **সতর**। এই সতর অংশ আবৃত রাখা নারী-পুরুষের উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক।

পবিত্র কোরআনে সূরা নূর এর ৩১ নং আয়াতে মহিলাদের সতরের উল্লেখ রয়েছে। এই পরিচ্ছেদের শুরুতে আয়াতটি উল্লিখিত বলে এখানে তার পুনরুল্লেখ না করে আলোচনা করা হলো। কোরআনের উক্ত আয়াতে দুটি বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

১. **"কোন মুসলমান মহিলা তার আভরণ (যীনাত) প্রদর্শন করবে না যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ছাড়া (ইল্লামা যাহারা মিনহা)।"** আরবী 'যিনাত' শব্দটির বিশ্লেষণে আরবী ভাষার অভিধান 'লেসানুল আরব'[১] গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে শব্দটির দুটি অর্থ যথা ক. প্রকৃতিগত ও দৈহিক সৌন্দর্য এবং খ. সাজসজ্জাজনিত সৌন্দর্য যা অলংকার অর্থাৎ আংটি, চুড়ি, বাজুবন্ধ ও পোষাকের দ্বারা অর্জিত হয়। 'যীনাত' শব্দ দ্বারা যে অংশের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হয়না তা হলো মুখ ও হাত।

ক. ইসলাম ধর্মের চারজন বিখ্যাত আইনবিদ ইমামসহ[২] অতীত ও বর্তমান কালের সকল মুসলিম আইনবিদগণ একমত যে হাত ও মুখের উপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। ইসলামী ইযমা[৩] দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে যে হজ ও নামাযের সময়ও মহিলাগণ হাত ও মুখ উন্মুক্ত রাখতে

হাম্বল (রাঃ)

৩. বিশেষজ্ঞ মুসলিম পণ্ডিত ও সাহাবাদের সর্বসম্মত গৃহীত নীতি বা একত্রীভূত মতবাদ। আইনের নির্ধারণ ক্ষেত্রে ইসলামী শাস্ত্রবিদ ও আইনপ্রণেতাদের একমত হওয়া ইসলামী আচরণ বিধি। এটি ইসলামী আইনের অপর একটি উৎস। প্রথম উৎস কোরআন, দ্বিতীয় উৎস হাদিস।

পারবে। কিন্তু অবশিষ্ট শরীর আবৃত রাখতে হবে। এই ব্যাখ্যা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাদিস দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "যখন কোন মহিলা পূর্ণ সাবালিকা হয় তখন এই অংশ ছাড়া তার শরীরের কোন অংশ অনাবৃত রাখা সঙ্গত নয়, বলে তিনি নিজের **মুখ ও হাতের** প্রতি ইঙ্গিত করলেন।"

খ. মহিলা দেহের কতক অংশ আছে যা একান্ত প্রয়োজনে বা বাতাসের ঝাপটায় উন্মুক্ত হতে পারে তেমন অংশ ছাড়া দেহের বাকি অংশ যাতে আবরণ মুক্ত না হয় তেমনভাবে পোশাক পরিকল্পনা করতে হবে। অর্থাৎ মুখ ও হাত ব্যতীত বাকি অংশ আবৃত হওয়ার মত পোশাক পরিধান নারীর জন্য অবশ্যকর্তব্য।

২. মস্তক আবৃত করার জন্যও নির্দেশ রয়েছে কোরআনেব ঐ স্তবকেই। শুধু তাই নয় **মাথার কাপড় (খোমোর)** কে **গ্রীবা ও বক্ষের** (জোইউব) উপর বর্ধিত করতে হবে। খোমোর শব্দটি আরবী খিমার শব্দের বহুবচন যার অর্থ মস্তকাবরণ। **জোইউব শব্দটি** আরবী 'জাইব' শব্দের বহুবচন (এর উৎপত্তি 'যাওব' শব্দ থেকে) যা পোশাকের গ্রীবা ও বক্ষাঞ্চল বোঝায়। তাই কোরআনের ঐ শব্দে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে মাথায় আবরণ দিতে হবে এবং তার দ্বারা গ্রীবা ও বক্ষ সৌন্দর্য আবৃত করতে হবে।

প্রথমতঃ এই বর্ণনা থেকে আমরা সহজে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে মুসলিম মহিলাদের পোষাক আপাদমস্তক লম্বিত হতে হবে। মুসলিম দেশগুলি বিশেষত আরব অঞ্চল ও সৌদি আরবের মহিলাগণ যে পোষাকে দেহের এই অংশ আবৃত করেন তা অনেকটা খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীদের পোষাকের ধরনের।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম মহিলাদের পোষাক এমন ঢিলেঢালা হবে যে ঐ পোষাক পরলে নারীদেহের পূর্ণ আকৃতি ও সৌষ্ঠব পরিলক্ষিত হবে না। আপাদমস্তক আবৃতকারী আঁটোসাঁটো পোষাকও ইসলাম মহিলাদের জন্য

---

১. এবনুল আসীরের **আন নেযায়া** এবং আল হাফিজ এবনে কসীরের তফসীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। সর্বোপরি এ বিষয়ে কোন মত পার্থক্যের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না।

অনুমোদন করেনা। নারীদেহের উরু, বুক, জঙ্ঘা ইত্যাদি আকর্ষণীয় অংশগুলির দৈহিক আকার আবৃত হবে না এমন পূর্ণ দেহাবরণ যুক্ত পোষাকও ইসলামী আইনবেত্তাগণ অনুমোদন করেন না। কারণ নারীদেহের ঐ সকল অঙ্গ অবশ্যই সৌন্দর্য প্রকাশক।

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) একবার একটি অপেক্ষাকৃত কম মিহি কাপড়ের পোষাক উপহার হিসেবে পান। তিনি ঐ পোষাকটি ওসামা বিন যিয়াদকে দিয়ে দেন। হযরত নবী করিম (সাঃ) ওসামাকে পোষাকটি পবতে না দেখে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে ওসামা ঐটি তাঁর স্ত্রীর পরিধানের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। এটা জেনে হযরত ওসামাকে বললেন, "তোমার স্ত্রীকে ঐ পোষাকের নীচে **গোলালাহ** পরতে বলো। কারণ আমার আশংকা হয় হয়ত ঐ পোশাকে তাঁর দেহাকৃতি প্রকাশ হয়ে পড়বে।"[১] আববীতে গোলালাহ শব্দ দ্বাবা ঠাসা সুতী কাপড় বোঝান হয় যা সাধারণ পোষাকের নীচে পরলে কারো দেহাকৃতি দৃষ্ট হয়না।

দেহের বহিরাকৃতি ঢাকতে পোষাকের উপর ঢিলা আলখাল্লা জাতীয় আববণী পরে মহিলাগণ নিজেদের দেহাকৃতির সৌষ্ঠব আবৃত রাখবেন এটাই আল্লাহ্‌র নবীর নীতি।

তৃতীয়তঃ মহিলাগণেব সতর অংশের দেহচর্মের ঔজ্জ্বল্য যাতে প্রকাশ না পায় এমন পুরু কাপড় প্রয়োজন। এটা অবশ্য পালনীয় যে দেহসৌন্দর্য আবৃত করতে হলে পোষাক যথেষ্ট পুরু হতে হবে। হযরতের সুদূর প্রসারী দূবদৃষ্টি দিয়ে তিনি পববর্তী যুগেব অবস্থা সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন বর্তমান কালেব মুসলিম মহিলাগণের ক্ষেত্রে তা সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেছিলেন "পববর্তী যুগে আমার উম্মার (অনুগামীদের) মধ্যে এমন মহিলা দেখা যাবে যারা পোষাক পরেও উলঙ্গেব মতই হবে। তাদের মাথার উপবটা উটের কুঁজের মত দেখাবে। তাদের উপর অভিশাপ! সত্যই তারা অভিশপ্ত।" অন্য এক উক্তিতে তিনি বলেছেন "তারা কখনই জান্নাতে প্রবেশ কববে না এমনকি জান্নাতের গন্ধও পাবেনা।"

এক বর্ণনা থেকে জানা যায় একবার হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা

১. আল হাদিস: আলতাব্বারি ও সহি মুসলিম।

তদীয় ভগ্নী হযরতের পত্নী হযরত আয়েশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেই সময় যখনই হযরত নবী করিম বুঝতে পারলেন যে আসমার পোষাক যথেষ্ট পুরু নয় সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্ষোভে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, "কোন মহিলা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে তার দেহের কোন অংশের আভরণ প্রকাশ করা যাবে না শুধুমাত্র এই অংশ ছাড়া—বলেই তিনি নিজের মুখ ও হাতের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।"[১] আর এক বর্ণনায় রয়েছে—আল্লাহ্‌র নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিয়ের এক কনেকে অত্যন্ত মিহি পোষাকে দেখে মন্তব্য করলেন, "এ ধরনের পোষাক সেই পরে যে আল্লাহ্‌র বাণী সূরা নূরে বিশ্বাসী নয়।"[২] আর এক বর্ণনায় রয়েছে বনু তানীম গোত্রের কতিপয় মহিলা অত্যন্ত মিহি কাপড়ের পোষাক পরে হযরত আয়েশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। হযরত তাদের দেখে বললেন, "যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে বিশ্বাসীদের পোষাক এরূপ নয়।"[৩]

উপরোক্ত বর্ণনাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পোষাক এমন মিহি হবে না যা থেকে নারীদেহের আভরণ দেখা যায়।

চতুর্থতঃ পোষাকের বহির্দৃশ্য। সাধারণভাবে মহিলাদের ইসলামী পোষাক এমন শুচিসুন্দরভাবে নারীদেহকে আবৃত করবে যে কোনভাবেই নারীর দেহসৌন্দর্য পুরুষকে আকর্ষণ করবে না। (অর্থাৎ উগ্র আধুনিকতা বর্জিত শালীনতাপূর্ণ মার্জিত পোষাক হবে যা তার আভিজাত্যকে প্রকাশ করবে কিন্তু নারী অঙ্গের পূর্ণাবয়ব প্রকাশিত হয়ে অন্য পুরুষের কামনার বস্তু হবে না। এটাই হল মুসলিম মহিলার আভরণ আবৃত করার মুখ্য বিষয়। নবী পত্নীদের বিধানের মাধ্যমে সর্বস্তরের মুসলিম মহিলাগণের জন্য পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "……ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররাজাল জাহেলিয়াতিল উলা"…অর্থাৎ "…প্রাক ইসলামী যুগের মত নিজেদের জমকালো সাজে প্রদর্শন করে বেড়িও না……।"[৪]

ইসলামী বিধানে নারী ও পুরুষের পোষাকে পার্থক্যের বিধান করা হয়েছে।

---

১. আল হাদিস : আল তাব্বারি ও সহি মুসলিম

২. সূরা নূরে মহিলাদের পরিচ্ছদের বর্ণনা রয়েছে। ৩. হাদিস

৪- আল কোরআন—সূরা আহযাব : আয়াত ৩৩

ফলে নারী যেমন পুরুষালী পোষাক পরবে না, পুরুষও তেমনি মেয়েলি পোষাক পরবে না। পোষাকে নারী পুরুষের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত নবী করিম (সাঃ) বলেছেন—ঐ সব পুরুষেরা অভিশপ্ত যারা মেয়েদের আকৃতি ধরে আর ঐসব নারীরাও অভিশপ্ত যারা পুরুষের আকৃতি ধারণ করে। পোশাক এমন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের পোশাকের সঙ্গে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে পোশাকের মধ্য দিয়ে যেন অহঙ্কার ও গর্ব প্রকাশ না পায়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই মানসিকতাকে সাবধান করে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "যারা পার্থিব যশলাভের জন্য পোষাক পরে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের অপমানজনক পোষাকে সজ্জিত করবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" তবে মহিলাগণের রেশমী পোষাক পরিধানে ইসলাম কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি।

মনে রাখতে হবে পোশাক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচয় বহন করে। সুতরাং মুসলিম নারীপুরুষের পোশাক সর্ব ক্ষেত্রেই কোরআন ও সুন্নার অনুসারী হয়ে ইসলামী সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও রুচিবোধকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবে এটাই শ্রেয়। এ দায়িত্ব প্রতিটি প্রকৃত মুসলমানের উপর ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক মুসলিম নারী পোশাকের এই নির্দিষ্ট সীমানা মেনে গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করলেও ইসলাম কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি। সমস্ত সঙ্গতি সম্পন্না নারীর জন্য হজের বিধানই এই সত্যকে প্রমাণ করে। এখানেই ইসলামের উদার বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী মহান ও অতুলনীয়।

ইসলামী শরীয়তে পুরুষের পোশাক :

ইসলাম শুধুমাত্র নারীর জন্যই সতর আবৃত করা বাধ্যতামূলক করেনি পুরুষের জন্যও করেছে। শারীরিক গঠনের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি রেখে পুরুষের সতর নির্ধারণ করা হয়েছে নাভি থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। কোন কোন ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতে পায়ের গোঁড়ালীর গাঁটের উপর পর্যন্ত আবৃত রাখা বাধ্যতামূলক। পুরুষের সতর অংশ আবৃত করার জন্য পোষাক এমন দীর্ঘ হতে হবে যাতে সতর অংশ পরিপূর্ণ ভাবে আবৃত হয়, এমন ঢিলে-

ঢালা হতে হবে যেন এই সতর অংশের দেহাকৃতি প্রকাশ না পায়, এমন পুরু হবে যেন পোষাক ভেদ করে সতর অংশের চামড়ার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত না হয়, এমন পোশাক হতে হবে যেন তা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিকটু না হয়। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পোষাকে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কখনই পুরুষের জন্য মহিলা পোষাক বৈধ নয়। আবার অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করার মত পোষাকও কাম্য নয়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পর্দার মূল সুর বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে বিধৃত। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে আস্থাশীল ও বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অমোঘ বিধান হলে তাদের মতবাদ অনুভূতি ও আনুগত্য সবটাই হবে কোরআন ও সুন্না ভিত্তিক। আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন :

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দ্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (৩৩ : ৩৬)[১]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে : "তারা আল্লাহতে, নবীতে ও তাঁর(নবীর) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে ওদেরকে (সত্য প্রত্যাখ্যান কারী-দেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী। (৫ : ৮১)[২]

যারা অন্যকে খুশী করার জন্য ও কিছু লোকের কাছে নিজেকে প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজস্ব ধারণাকে সভ্যতার মাপকাঠি হিসাবে সমাজে চালনার চেষ্টা করেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট ঘোষণা : "তাদের অনেককে তুমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে! কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম……।[৩] এই শ্রেণীর লোক থেকে সমাজকে সাবধান থাকতে হবে।

---

১. আল কোরআন—সুরা আহযাব : আয়াত ৩৬
২. ঐ সুরা মায়িদা : আয়াত ৮১
৩. ঐ ঐ ঐ ৮০

॥ বিবাহ ॥

আল-কোরআন ও আল-হাদিসে বিবাহের স্বরূপ ঃ

"ওয়ামিন আয়াতিহি আন খালাকা লাকুম মিন আনফোসেকুম আয-ওয়াজাল লেতাস-কুনু এলাইহা, ওয়া জাআলা বায়নাকুম মোওয়াদ্দা-তাওঁ ওয়া রাহমাতান, ইন্না ফী যালেকা লা আয়াতিল লেক্কাওমিঁই ইয়াতফাক্কারুন।" অর্থাৎ

"এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা ওদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (৩০ ঃ ২১)[১]

ইসলাম ধর্মে বিবাহ শুধুমাত্র একজন নারী ও একজন পুরুষের দৈহিক মিলনের বৈধ চুক্তি নয় বরং এমন একটি সামাজিক চুক্তি যাতে পরস্পরের উপর বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। এইসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পরস্পর মেনে চলার প্রতিশ্রুতিতেই ইসলামী বিবাহ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এর পশ্চাতে রয়েছে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসের এক পবিত্র মানসিকতা যাতে কোনভাবেই কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার বিধান নেই। উপরিউক্ত কোরআনের আয়াতে স্পষ্ট হচ্ছে যে নারী কোনভাবেই পুরুষের তুলনায় হীন নয় বা পুরুষ কোন পৃথক সত্তার সৃষ্টি নয় বরং উভয়ের সৃষ্টির উপাদান একই। নারীপুরুষ উভয়েই এক আদমের বংশধর এবং এক আত্মার অধিকারী। কোরআনের দৃষ্টিতে বিবাহ সেই দুটি হৃদয়ের একাত্ম রূপ। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "হোওয়াল্লাযি খালাকাকুম মিন নাফসিওঁ ওয়াহেদাতিওঁ ওয়া জাআলা মিনহা ফাওজাহা লে ইয়াসকোনা এলাইহা।" অর্থাৎ

---

১. আল-কোরআন—সূরা রূম ঃ আয়াত ২১

"তিনি তোমাদেরকে এক আত্মা (ব্যক্তি) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।" (৭ : ১৮৯)[১]

"তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম* তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব মুক্ত করে দেবেন ; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।" (২৪ : ৩২)[২]

"হে মানব তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি তা থেকে তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর নারী বিস্তার করেন"—(৪ : ১)[৩]

"...তারা (নারীগণ) তোমাদের অঙ্গাবরণ স্বরূপ এবং তোমরা (পুরুষ) তাদের অঙ্গাবরণ স্বরূপ"...। (২ : ১৮৭)[৪]

হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহেস সালামের এক বিজ্ঞ সঙ্গী হযরত আনাস (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন) বর্ণনা করেছেন যে—'একবার তিনজন সাহাবী[৫] হযরতের স্ত্রীগণের নিকট এসে তাঁর এবাদাত বন্দেগীর (আরাধনা উপাসনা) পরিমাণ ও প্রকৃতির খোঁজ নেওয়া শুরু করলেন। সব শুনে তাঁদের কাছে হযরতের এবাদাত বন্দেগীর পরিমাণ বেশ কম মনে হল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন যে হযরত নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহেসসালামের পূর্বাপর সকল পাপতো মার্জনা করে দেওয়া হয়েছে আমাদের অবস্থা সেরকম

---

১. আল-কোরআন—সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৮৯

* আইয়িম শব্দটি আরবী আয়িম শব্দের বহুবচন। যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে নারীর স্বামী নেই তারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা যাই হোক না কেন এরূপ অর্থে আইয়িম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য 'লিসানুল আরব' নামক অভিধান গ্রন্থ ।

২. আল-কোরআন—সূরা নূর : আয়াত ৩২

৩. আল কোরআন : সূরা নিসা : আয়াত ১

৪. আল কোরআন : সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৮৭

৫. যাঁরা হযরতের জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন।

নয়। সুতরাং তাঁর পক্ষে কম এবাদাতই যথেষ্ট। আমাদের জন্য বেশী মাত্রায় এবাদাত করা আবশ্যক। তাঁদের একজন বললেন 'আমি সারারাত্রি না ঘুমিয়ে নামায আদায়ের মধ্যে কাটাব।' আর একজন বললেন 'সারা জীবন রোযা রাখব।' আর একজন বললেন আমি সংসারজালে না জড়িয়ে চিরকুমার থেকে এবাদাতে কাটাব। এমন সময় হযরত নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে অসাল্লাম নিজে তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা এই আলোচনা করেছ! তোমরা স্মরণ রেখো আল্লাহ্‌র শপথ আমি আল্লাহ্‌কে তোমাদের চেয়ে অধিক ভয় করি, তোমাদের চেয়ে অধিক তাকওয়া-পরহেজ-গারী (সীমা রক্ষা করি ও পবিত্রতা বজায় রাখি) অবলম্বন করে চলি। তবুও আমি রোযাও পালন করি, রোযা বিহীনও থাকি। রাতে তাহাজ্জুদ[১] পড়ি, নিদ্রাও যাই এবং বিবাহ করে স্ত্রীদের সঙ্গে বসবাসও করে থাকি। এটাই আমার সুন্নত তরিকা (অনুসরণীয় নীতি)। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরিকা বাদ দিয়ে চলবে বা বিসর্জন দেবে সে আমার দলভুক্ত বলে গণ্য হবে না।"[২]

ওয়াক্কাসের পুত্র সাআদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মাজউনের পুত্র ওসমান (রাঃ) নবী করিমের কাছে আবেদন করলেন, "হে রাসূল আমাকে সংসারত্যাগী জীবনযাপন করার অনুমতি দিন।" হযরত তার উত্তরে তাঁকে বললেন, "না আমার উম্মতদের (দলভুক্তদের) জন্য সংসার ত্যাগ অনুমোদিত নয় এবং ঐরকম লোকেরা আমার দলভুক্ত নয়। আল্লাহ্‌র পথে জেহাদই আমার দলভুক্তদের জন্য সর্বোত্তম ত্যাগ।" তিনি আবার বললেন,—তাহলে আমাকে সন্ন্যাস জীবনযাপনের অনুমতি দিন। উত্তরে তিনি বললেন —"আমার দলভুক্তদের জন্য সংসারজীবনে মসজিদে বসে নামাযের জন্য অপেক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস।" এমনকি হযরত মোহাম্মাদ (সা.) কাউকে নির্বীর্য হওয়ারও অনুমতি দেননি। তিনি বলেছেন "রোজা পালন করলেই আমার দলভুক্তদের নির্বীর্য (খোজা) হওয়ার সমতুল্য ফললাভ সম্ভব হবে।"

---

১. রাত্রির শেষার্ধে ঘুম থেকে উঠে যে সালাত নামায কায়েম করা হয় তাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ১৭ : ৭৯

২. বোখারী শরীফ : হাদিস নং ২০০২

এক ঘটনায় হযরত বলেছেন পয়গম্বরদের চারটি কাজ গুরুত্বপূর্ণ—নম্রতা ও ভদ্রতা, সুগন্ধী ব্যবহার, দাঁত পরিষ্কার ও বিবাহ।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন "যে পবিত্র জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে সে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত।"[১]

তিরমিজি শরীফের হাদিসে আরও উল্লিখিত হয়েছে হযরত বলেছেন—হে আলী তিনটি জিনিষে কখনও গাফিলতি করোনা—'নামায', যখন তার সময় হয়, 'জানাজা' এবং 'অবিবাহিতের বিবাহ' যখন সে তার উপযুক্ত পাত্র পায়।

আবু দাউদ নামক হাদিস গ্রন্থে আছে—ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন—আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন "ইসলাম বিবাহ বিমুখতাকে অনুমোদন করেনা।" চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে "আল্লাহ্ মানুষকে যে সকল সম্পদ দান করেছেন তার মধ্যে ঈমানের পর মহিয়সী স্ত্রী অপেক্ষা আর কিছু নেই। মানুষের মধ্যে এমন কঠিন গোনাহ্ রয়েছে যা পরিবার প্রতি-পালনের কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কিছুতেই মাফ হয় না।"—(হাদিস)

সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন যে কোন 'তাপসের তপস্যা বিবাহ ব্যতীত পূর্ণ হয়না। বিবাহ ধর্মসাধনাকে পূর্ণতা দান করে।, এবনে মাজা নামক হাদিস গ্রন্থে রয়েছে—আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন, "বিবাহের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেমপ্রীতির সঞ্চার ও বিকাশ ঘটে তার কোন তুলনা নেই।"

বিশ্ব সভ্যতার আলোকে ইসলামী বিবাহ :

কোরআনে বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থায় আদি মানব আদম বিবি হাওয়া থেকেই নারী পুরুষের যৌথ পবিত্র জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে। কোরআনে বৈরাগ্য কিংবা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই বরং ঐ জীবনকে অসম্পূর্ণ ও পাপ বলে উল্লিখিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান বিকাশশীল

১. তিরমিজি, নেসায়ী ও এবনে মাজা।

বিশ্ব সভ্যতায় এই বিবাহিত জীবনের কি ধরনের সামাজিক রূপ মানব কল্যাণের সহায়ক, আর তা কোরআন তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাহত হচ্ছে কিনা সেটাই উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। উন্নত সভ্যতার স্বাক্ষর হিসাবে আমরা যা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি তা মানব জীবনের কল্যাণ সাধনে কতটা সহায়ক হচ্ছে আবার কোরআন বর্ণিত সমাজ জীবন সেক্ষেত্রে কতটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তা সুদীর্ঘ ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে আহরণ করে মুখোমুখি পরিচিত হতে হবে। গোঁড়ামী কিংবা উগ্র মুসলিম বিরোধিতার মানসিকতা পরিহার করে উন্নত ও কল্যাণকর বিধান গ্রহণ করলে সমাজ উপকৃতই হবে।

সৃষ্টির বিকাশের মর্মমূলে রয়েছে পুরুষ ও নারীর যৌথ ভূমিকা. একে অপরকে বাদ দিলে পৃথিবীর মানব প্রজাতির গতি চক্রই যাবে থেমে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ যত অগ্রসর হয়েছে, সভ্যতার পথে যত উন্নতি করছে —ততই জীবনকে করে তুলেছে শুচি সুন্দর। তার শুচিসুন্দর মানসিকতাই জন্ম দিয়েছিল বিবাহের মত সামাজিক নিয়মের। বিবাহের মধ্য দিয়ে নর-নারীর সম্পর্ককে মানুষ একটি নিয়মনিষ্ঠ কাঠামোর বন্ধনে নিয়ে এসেছিল।

বিবাহ একটি পারিবারিক বন্ধন। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে এই বন্ধনের উপর ভিত্তি করেই বিস্তার লাভ করেছে মানব প্রজাতি। বিস্তার লাভ করেছে মানব সভ্যতা। এই বন্ধনের উপর ভিত্তি করেই পরিবার এবং পরিবার থেকে সমাজের জন্ম হয়েছে সম্ভব। নারীপুরুষের দাম্পত্য বন্ধনই পৃথিবীকে করে তুলেছে পরিপূর্ণ, করে তুলেছে কর্মচঞ্চল। এ বন্ধন না থাকলে, স্নেহ-প্রেম ভালোবাসায় এ সম্পর্ক সিক্ত ও অটুট না হলে কবে হারিয়ে যেত মানুষ কোন অতীতেই। যৌথজীবনের প্রতি আকর্ষণই মানুষকে সব প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার প্রেরণা যুগিয়েছিল এখনও যোগাচ্ছে। তাই সেই সুদূর অতীত থেকে আজও পরিবার, সমাজ ও সর্বোপরি রাষ্ট্রজীবনে বিবাহ একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর সেজন্যই বিবাহের পরিচ্ছন্ন আইন-কানুন সভ্য দুনিয়ায় অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

পৃথিবীর বুকে অসংখ্য জাতি ধর্মের সমাবেশ রয়েছে। সামাজিক নিয়ম-কানুনও তাই রয়েছে অসংখ্য। জন্ম থেকে মৃত্যুকালের মধ্যে আচার-

অনুষ্ঠানের পার্থক্য বিস্তর। যুগের পরিবর্তনেও বহু নিয়মকানুনের পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় সামাজিক ও পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানগুলি কোন নির্দিষ্ট নিয়মের পথ ধরে চলত না। কিছুটা ধর্ম, কিছুটা ভাবাবেগ, কিছু কুসংস্কারের সমন্বয়ে গড়ে উঠত পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানগুলি। পৃথিবীর সব দেশেই মোটামুটি এই ধারায় জীবনযাত্রা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল।

এই ধারায় প্রথম পূর্ণচ্ছেদ নিয়ে এলো পৃথিবীতে ইসলাম। সত্যই ইসলাম একটি ধর্ম। কিন্তু ধর্মাচরণের নিয়মের মধ্যে ইসলাম সীমিত নয় বরং এ ধর্মের পূর্ণতা রয়েছে ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ও কল্যাণমূলক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে। পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মই জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠ সমাধান রচনা করেছে এবং কোরআন তথা ইসলাম প্রদত্ত সেই শাসনতন্ত্রের নামই হলো শরীয়ত। এতই সুদূরপ্রসারী তার বিধান যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সমাজের সর্বক্ষেত্রে, সব সমস্যায় যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল—আজ এত যুগ পরেও সেগুলি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য। যাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না তাঁরা এ সম্পর্কে উদার ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খোঁজখবর করেননি বলেই ধারণা করে নেন সব ধর্মের মত ইসলাম ধর্মের সামাজিক নীতি-নিয়মগুলিও ধর্মীয় ভাবাপন্ন।

এ সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভাষায় বলা যায় যে ইসলামের সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসন গুলি সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় বাতাবরণমুক্ত নৈতিক মূল্যবোধ যুক্ত। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিবাহ, পিতাপুত্র কন্যা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পত্তির ভাগবণ্টন প্রত্যেকটির জন্য রয়েছে স্পষ্ট বিধান। বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচ্য ইসলাম ধর্মে বিবাহ।

ইসলাম ধর্মে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে একটি পারিবারিক ও সামাজিক কর্ম হিসাবে স্থান পেয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে তাই কোনরকম ধর্মীয় আচরণের স্থান নেই। কোন মন্ত্র বা শ্লোক উচ্চারণ নেই ইসলামী বিবাহ ব্যবস্থায়। ইসলাম বিবাহকে তার বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ধর্মীয় শৃঙ্খলে

আবদ্ধ করেনি। ইসলামে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সম্মত প্রস্তাব ও সমর্থনের একটি সামাজিক চুক্তি মাত্র। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ, বয়ঃপ্রাপ্তা ও বিবাহযোগ্যা নারীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখতে পারে। ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষকে কোনভাবে একাধিপত্য দেওয়া হয়নি। বিবাহের ব্যাপারে পুরুষকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি যে সে নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ধন্য করছে এটি মনে করতে পারে বা কোন নারীকে কারো জীবনসঙ্গিনী হতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য বিবাহ ব্যবস্থায় নারী পরিণত হয়েছে পণ্যদ্রব্যে আর পুরুষ তার খরিদ্দার বা ক্রেতা। পুরুষ বিবাহ করে যেন নারীকেই ধন্য করে। ইসলাম ছাড়া ভারতীয় অন্যান্য সমাজ জীবনে বিবাহের দ্বারা নারী পুরুষের অধীনতা ও বশ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে পুরুষকে পতিত্বে বরণ করতে বাধ্য হয়। এই মানসিকতাই যুগে যুগে জন্ম দিয়েছে নারী নির্যাতনের। নারীকে করে তুলেছে শৃঙ্খলিত। নারী হয়ে উঠেছে ভোগ্যপণ্যমাত্র। নারীপুরুষের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে শোষক ও শাসিতের, প্রভু ও পরিচারিকার মত। পুরুষ পেয়েছে একনায়কত্বের ভূমিকা।

যুগ যুগ ব্যাপী এই অসম সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে বিবাহের মধ্য দিয়ে ইসলাম নারীকে দিয়েছে এক অনন্য সম্মানের আসন। বিবাহ করে, নারীকে ধন্য করার আত্মম্ভরিতার অধিকার থেকে পুরুষকে বঞ্চিত করেছে ইসলাম। ইসলাম ঘোষণা করলো নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিনয় প্রস্তাব প্রেরণের পদ্ধতি। ইসলামই প্রস্তাব ও সমর্থন বিষয়টি এক সুশৃঙ্খল নিয়মে বিধৃত করেছে। আর সেটাই সামাজিক দৃষ্টিতে বিবাহ। নারীর প্রস্তাব বা সম্মতির উপর বিবাহ নির্ভর করে। নারীকে যোগ্য সাম্মানিক (দেন মোহর) দিয়ে পুরুষকে নারীর সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য করেছে ইসলামী বিধান। ইসলামী শরীয়তের বিধানে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি অসম্মতিই পেয়েছে প্রাধান্য। বিবাহ আর পুরুষের একার ইচ্ছাধীন রইল না। বিবাহ ক্ষেত্রে নারীর মতামতের মূল্য সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামে দাম্পত্য-সম্পর্ক এক সমমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী পদ্ধতিতে বিবাহ দ্বারা কোন পুরুষ যেমন কোন মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে

তাকে কৃতার্থ করেন না, তেমনি কোন নারী কোন পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করার সম্মতি দিয়েও পুরুষকে কৃতার্থ করেন না। অন্ততঃ এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার কোন ইঙ্গিত ইসলামী বিবাহপদ্ধতিতে ব্যক্ত হয়নি। সংসার নারী পুরুষ উভয়কে নিয়ে। তবুও আমরা জানি সভ্যতার পরিমাপ হয় নারীর মর্যাদা দ্বারা। ইসলাম সপ্তম শতাব্দীতে বিশ্বজোড়া নারীজীবনের অসম্মান অবমাননার অবসান ঘটিয়ে তাকে আপন মর্যাদার আসনে করেছিল প্রতিষ্ঠিত।

সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে পুরুষের ধর্ম হলো নারীর মনোযোগ আকর্ষণ করা ও নিজের হৃদয়াকৃতি নিবেদন করা। আর নারীর প্রকৃত ধর্ম হলো আত্ম-সম্ভ্রম বজায় রেখে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা। পুরুষের মর্যাদাপূর্ণ নিবেদনে সাড়া দেওয়া। সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে পুরুষ আত্মনিবেদন করেছে নারীর কাছে, যাচ্ঞা করেছে দাম্পত্য সম্পর্ক। এই স্বাভাবিক সত্যটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারীজাতির সম্মান ও মর্যাদারক্ষার প্রকৃতিদত্ত হাতিয়ার। আল্লাহ পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন অভিগমন ও প্রেমনিবেদনের হৃদয়বৃত্তি দিয়ে এবং নারীকে সৃষ্টি করেছেন সেই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য সুষমা মণ্ডিত সৌন্দর্য দিয়ে। নারী সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত পুষ্পস্বরূপ। পুরুষ সেই অনিন্দ্য সুন্দরের মর্যাদা দিয়ে তাকে বরণ করেছে যুগে যুগে। নারী স্রষ্টার হাতে সৃষ্ট এক দীপ্তিময়ী আলোক-শিখা। সে আলোক শিখার আকর্ষণে পুরুষ ছুটে চলে পতঙ্গের মত। সুতরাং স্রষ্টার নিয়মে নারী শৃঙ্খলিত নয় কখনই। নারী আল্লাহ্ প্রদত্ত হাতিয়ারের আত্মসম্ভ্রমশীল প্রয়োগ যদি করতে পারে তাহলে কোন শক্তিই তাকে পণ্য দ্রব্যে পরিণত করতে পারে না। ইসলাম স্রষ্টার সেই অমোঘ আইনকে মেনে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীকে দিয়েছে নির্বাচনের স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের একচ্ছত্র ক্ষমতা। নারীকে করেছে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতা।

একসময় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট এক সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত হয়ে নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করেন। এই বর্ণনা শুনে উপস্থিত এক সাহাবী কন্যা মন্তব্য করলেন "কি বিশ্রী কথা, মেয়েটি খুবই নির্লজ্জ ও বেশরম" সাহাবা আনাস কন্যার এহেন মন্তব্যে কন্যাকে তিরস্কার করেন।[১]

১ বোখারী শরীফ, হাদিস নং ২০২৩।

ইসলামের বিবাহ বিধিতে প্রস্তাবের মধ্যেও নারীকে এক অনন্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নারী পুরুষকে বা পুরুষ নারীকে সুনির্দিষ্ট শালীনতা পূর্ণ সামাজিক নিয়মে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারে। শরীয়তের নিয়মে বিবাহের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পরস্পর এমনভাবে সঙ্গী পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করবে যে নারী পুরুষের সম্পত্তি হয়ে উঠবে না কিংবা পুরুষও সে নারীর মালিকে পরিণত হবে না। এখানে লেনদেন বা দেনাপাওনার কোন সম্পর্ক নেই। পুরুষের সঙ্গী অন্বেষণের মধ্যে আছে মিলিত যৌথ জীবনযাপনের ও বংশরক্ষার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। নারীর সঙ্গী নির্বাচনের মধ্যে আছে সমাজে মর্যাদা, নিরাপত্তা সুস্থির জীবন ও চিরন্তন মাতৃ-পিপাসা নিবৃত্তির ইচ্ছা।

নারীর পরমোৎকর্ষের চূড়ান্ত নিদর্শন হলো যে সে সকল দেশে ও সকল কালে পুরুষের হৃদয় জয় করেছে। এতবড় একটা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সারা বিশ্বের মহিলাগণকে রাজপথে বেরোতে হচ্ছে দলে দলে। নারীর জন্মগত যে স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতা তা এই আন্দোলনে জোরদার হচ্ছে না হীনবল হচ্ছে তার সেই চিরন্তন মহিমাময় ক্ষমতা তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

সৃষ্টির নিজস্ব নিয়মের মধ্যে পুরুষ সৃষ্টি হয়েছিল কামনা ও অভিগমনের উৎস রূপে এবং নারী সৃষ্টি হয়েছিল সেইরূপে, যে আকর্ষণ করে ও সাড়া দেয়। নারীর আপন মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার এটি সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি এবং পুরুষের শারীরিক শক্তির বিরুদ্ধে শারীরিকভাবে দুর্বল নারীর আত্মরক্ষার একটি বড় হাতিয়ার। নারী ও পুরুষের জীবনযাত্রায় ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন নিরাপত্তা। নারীর হাতে রয়েছে এই স্বাভাবিক সুবিধা,' অন্যদিকে ইসলাম পুরুষের জন্য নির্ধারণ করেছে কতকগুলি নৈতিক বাধ্যবাধকতা যা পুরুষ পূরণ করতে বাধ্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ :

নারী পুরুষের পরস্পরের শালীনতাপূর্ণ সামাজিক প্রস্তাব ও অনুমোদনের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনই ইসলামী মতে বিবাহ। ইসলাম ধর্ম

মতে বিবাহের পর পুরুষের নারীর উপর যতখানি নারীরও পুরুষের উপর ততখানি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলাম কোনভাবেই বৈরাগ্যের ধর্ম নয়। উপযুক্ত সঙ্গিনীসহ নৈতিকতাপূর্ণ সংসার জীবনযাপন ইসলাম ধর্মে আল্লাহর আরাধনা ও উপাসনা বলেই স্বীকৃত। নামায রোযা ইত্যাদি এবাদাতের (আরাধনা) ন্যায় সংসার জীবন নির্বাহকেও এবাদাতের মতই শুচি সুন্দর করে পালন করাই হল ইসলামের বিধান। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করা হয়েছে এইজন্য যে এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপিত হবে।'[১] হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,—"বিবাহ করা আমার সুন্নত তরিকা (নীতি) যে তা পালন করে না অর্থাৎ যে আমার সুন্নত তরিকা ছেড়ে দেবে সে আমার কেউ নয়। এবং আমার দলভুক্ত গণ্য হবে না।[২]"

বিবাহের যুগান্তকারী পদ্ধতি যেমন ইসলাম ঠিক করে দিয়েছে তেমনি শ্রেণীভাগ করেছে বিবাহের প্রয়োজনীয়তার। সমাজকে নৈতিকভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। মানুষ জন্মেছে কামনাবাসনা নিয়েই। তাকে আড়াল করে রাখার প্রচেষ্টার মধ্যে মহত্ত্বের কিছুই নেই। তেমনি কামনাবাসনা সংযত করে রাখাও অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব হয়না। অথচ জোর করে তা করতে গিয়ে মানুষ সমাজকে করে কলুষিত। এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম বিবাহকে করেছে অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনপদ্ধতি অবলম্বন না করে অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করে সমাজজীবনকে কলুষিত করার অধিকার বিশ্ব স্রষ্টা তার সৃষ্ট মানুষকে দেননি—ইসলাম জীবন বিধানের এই নীতিই ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম কঠিন কঠোর। তাই আর্থিকভাবে সক্ষম নারীপুরুষের জন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বিবাহকে নৈতিক চরিত্র শুদ্ধ রাখার দুর্ভেদ্য প্রাচীর বলে মন্তব্য করেছেন। সমাজকে একান্তভাবে

কলুষমুক্ত রাখার ক্ষেত্রেই বিবাহকে অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ একান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠান। কোন ধর্মীয় নিয়মকানুন, আধ্যাত্মিক আচার আচরণ বিবাহ অনুষ্ঠানে পালন করা বাধ্যতামূলক নয়। আধ্যাত্মিক বাতাবরন দিয়ে কোনভাবেই এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয় না যে তুটি জীবনের এই বন্ধন ঈশ্বরপ্রদত্ত কিম্বা জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। ইসলামে বিবাহ প্রকৃত অর্থে তুটি পূর্ণবয়স্ক নরনারী যারা দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে সামাজিক নিয়মে প্রস্তাব প্রদান ও প্রস্তাব অনুমোদনের একটা চুক্তি মাত্র। এই বক্তব্যটি বারবার উল্লেখের কারণ হলো এর মধ্যেই রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কেব ক্ষেত্রে ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গীটি।

প্রস্তাব ও সমর্থন ইসলাম ধর্মে বিবাহের মূল স্তম্ভ স্বরূপ। পাত্র বা পাত্রীর যে কোন একজন সরাসরি বা উকিল ও সাক্ষীগণের মাধ্যমে প্রস্তাব দিতে পারেন। প্রদত্ত প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থন করলেই বিবাহ সিদ্ধ হবে। প্রস্তাব ও অনুমোদনের বাক্যগুলি নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তাবোধক হতে হয়। যে কোন ভাষায় এই প্রস্তাব ও অনুমোদন উচ্চারণ করা যায়। প্রস্তাবে দেনমোহরের উল্লেখ থাকে। এই দেনমোহর বা মাহ্‌র শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো উপহার বা স্ত্রীর সাম্মানিক অর্থাৎ প্রদেয় স্ত্রীধন। ইসলামী শরীয়ত মতে মাহ্‌র এমন ধন যা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে প্রদান অবশ্য পালনীয়। এই নিয়মের মধ্যে মেয়েদের মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাহ্‌র অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে। ইসলাম ধর্মের বিধানে তুজন পূর্ণবয়স্ক সৎ চরিত্রবান সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ অবৈধ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের পুরুষদের থেকে তুজন ডাক, যদি তুজন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে একজন পুরুষ ও তুজন নারী।'[১] উভয়পক্ষের অভিভাবকের আলোচনা ও সম্মতি অনুসারে পাত্রপক্ষথেকে একজন উকিল ঠিক করতে হয় যিনি কোন এক পক্ষের প্রস্তাব নিয়ে অন্য পক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য যান। ইসলামের বিধানে বিবাহের পূর্বে অর্থাৎ

অভিভাবকগণ চূড়ান্তভাবে বিবাহ ধার্য করার আগেই পাত্রপাত্রীর পরস্পর সাক্ষাৎকার একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন "পাত্র পাত্রীকে দেখবে এজন্য যে এর দ্বারা তাদের ভালোবাসা স্থায়ী হবে।" তিনি নিজে পাত্রকে নির্দেশ দিয়েছেন, "যাও তাকে দেখে এসো হয়ত তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হবে।"[১]

দুটি মানুষের সম্পর্ক ধর্মীয় মোহমুগ্ধতা দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায়না বলেই ইসলাম সম্মত বিবাহ অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিকতার স্থান নেই। বিবাহিত জীবনে স্বামীস্ত্রী উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্য। উভয়েই দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমন্বয়পূর্ণ জীবনযাত্রার বাণী ইসলাম ঘোষণা করেছে। নারীপুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যদি সমন্বয় বা সমঝোতার অভাব ঘটে তবে জোরপূর্বক কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বন্ধনের আদর্শ তুলে ধরে সে সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ইসলামী বিবাহ ব্যবস্থায় নেই। সেক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদকেই শ্রেয় মনে করা হয়েছে। যদিও ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদ নৈতিক বিচারে ঘৃণ্য এবং সহজও নয়। বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়টি 'বিবাহবিচ্ছেদ' অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে।

যে কোন নারী ও পুরুষ যৌবনপ্রাপ্ত হলে ইসলামী আইন অনুসারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে বিবাহে কোন উৎসাহ দেওয়া হয়নি। "হযরত মোহাম্মাদ [সাঃ]-এর কাছে বিদায় হজের সময় একদিন এক ব্যক্তি অভিযোগ আনলেন যে ইসলাম আগমনের আগে তাঁর কাছে তারিক নামে এক ব্যক্তি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে তারিকের কন্যাসন্তান হলে প্রথমা কন্যাকে তাঁর হাতে (অভিযোগকারীকে) অর্পণ করবেন। কিন্তু বর্তমানে তারিক পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মেয়েটির বয়স কত ?" অভিযোগকারী উত্তর দিলেন—'সে প্রাপ্তবয়স্কা ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্না।' তিনি উত্তর দিলেন,—"তোমরা যা নিয়ে বিরোধ করছ তার কোন এক্তিয়ার তোমাদের নেই। কারণ মেয়েটি তার নিজের ভালমন্দ বোঝার মত যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে। কাজেই তার ব্যাপার তার

১. হাদিস : বোখারী শরীফ

হাতে ছেড়ে দাও।”[১] এই ঘটনাটি প্রমাণ করে ইসলাম নারীকে কী পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কা নারী অন্য দুই অভিভাবকের চুক্তি এমনকি নিজ পিতা চুক্তি করলেও মানতে বাধ্য নয়।

পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ…।'[২] এই নির্দেশের মধ্যে বাছাই করার মত বিচক্ষণতার জন্য যে বয়স প্রয়োজন তার ইঙ্গিত আছে। দ্বিতীয়তঃ বিবাহের আগে নারীপুরুষ উভয়ের পরিচয় জানার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিবাহকে বংশবিস্তার ও মানবজাতির অনুবৃত্তি রক্ষার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। হাদিসে আছে তিনি বলেছিলেন, “বিবাহ কর, নারীর ভালোবাসা উপভোগ ও সন্তান লাভের জন্য বিবাহ কর।”[৩] অর্থাৎ বিবাহ কেবল বংশবৃদ্ধির জন্য নয় বিবাহ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ভালোবাসার বন্ধনে মানসিক আনন্দ প্রাপ্তিও ইসলামী শরীয়তের বিধান। এবং বিবাহিত জীবনে সন্তান শূন্যতাও ইসলাম ধর্মের কাম্য নয়। কেবল মাত্র দৈহিক সুখভোগ মানুষের জীবনের সুস্থতার প্রকাশ নয়। ভবিষ্যতের উন্নত সুস্থ প্রজন্মের প্রসারও ইসলামী শরীয়তের বিধান। মানব সভ্যতার ভাণ্ডার পূর্ণ করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যও ইসলামের নীতি। ইসলামী শরীয়তের বিধানে সুশৃঙ্খল এই সকল পার্থিব ক্রিয়া বিক্রিয়াও আল্লাহ প্রাপ্তির আরাধনা। এখানেই ইসলামের বিধানের উদারতা ও প্রসারতা।

ইসলামে বলা হয়েছেকোন মেয়ের মতামতের বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়া হলে সে বিবাহ সিদ্ধ হবে না ও বাতিল বলে গণ্য হবে। যে কোন বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর তার অমতে স্থিরীকৃত বিবাহ বাতিল করে দেওয়ার অধিকার আছে। এটাই ইসলামী শরীয়তেব বিধান ও ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণের অভিমত।

বিবাহের ব্যাপারে ইসলামে মেয়েদের যে অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা কেবল কোরআনেই ঘোষণা করা হয়নি, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর জীবনের বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে বিবাহের ব্যাপারে নারীর মতামতের মূল্য দিয়েছেন সর্বাগ্রে।” একবার একটি মেয়ে হযরত মোহাম্মাদ

---

১. হাদিস ঃ বোখারী শরীফ।

২. দ্রষ্টব্য ঃ আল-কোরআন—সূরা নিসা ঃ আয়াত—৩। ৩. হাদিস

(সাঃ)-কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে জানাল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (দূত) আপনি আমাকে আমার পিতার হাত থেকে রক্ষা করুন।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বল-বললেন, 'কিন্তু তোমার পিতা তোমার প্রতি কি অন্যায় করেছেন ?' মেয়েটি উত্তর দিলো, 'তাঁর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। পিতা আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই তার সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক করেছেন।' হযরত (সাঃ) তাকে নম্রভাবে বোঝালেন যে পিতা যখন এমন কাজ করেই ফেলেছেন তখন বিরোধিতা না করে সে যেন মেনে নেয়। মেয়েটি বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমি আমার চাচাতো ভাইকে পছন্দ করি না। আমি যাকে পছন্দ করিনা তেমন ব্যক্তির স্ত্রী হবো কিভাবে ?' তখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বললেন, 'তুমি যখন তাকে পছন্দ করনা তখন এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি। তোমার বিবাহের ব্যাপারে তুমিই একমাত্র কর্ত্রী। যাও তুমি যাকে পছন্দ কর তাকে বিবাহ কর।' মেয়েটি তখন অকপটে উত্তর দিল, 'আমি আমার পিতৃব্য পুত্রকে খুবই পছন্দ করি এবং অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি পছন্দ নেই। কিন্তু পিতা যেহেতু আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই এ বিবাহ স্থির করেছেন সেজন্য আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আপনার কাছে এ প্রশ্ন করেছি এবং এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ জানতে চেয়েছি।, সকল নারীর জন্য এটি একটি সুসংবাদ যে কন্যার মতামত না জেনে বা কেবলমাত্র নিজেদের পছন্দমত বিবাহ দেওয়ার অধিকার কোন পিতারও নেই।"[১] এটা ইসলামের দেওয়া নারীর এক অমোঘ হাতিয়ার ও স্বীকৃত অধিকার যা নারী সমাজের মর্যাদার দ্যোতক।

ইসলাম অশালীনতা ও নোংরামিকে কোন প্রশ্রয় দেয়নি। শালীনতা পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে, বিবাহসম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে কোরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইসলাম কোন প্রাচীন গোত্রতান্ত্রিকতার অবৈজ্ঞানিক সুলভ নিয়মও প্রতিষ্ঠা করেনি। প্রতিটি যুগে পালনযোগ্য একটি স্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যে যে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ অশালীন ইসলাম তা একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কোরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, "তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, পিতার বোন, মাতার বোন, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী,

১. হাদিস : বোখারী শরীফ

দুগ্ধমাতা, দুগ্ধভগিনী, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে। তবে যদি তাদের (ঐ কন্যার মা) সঙ্গে সঙ্গত না হয়ে থাক তাতে তোমাদের অপরাধ নেই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একসঙ্গে বিবাহ করা…(৪ ঃ ২৩)।"[১]

যে যে সম্পর্কগুলির সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনুমতি থাকলে সমাজের ব্যভিচার সহজ হতো, সামাজিক শালীনতা আহত হতো সবগুলিই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ সকল যুগ, সকল সমাজকে কলুষমুক্ত মালিন্যমুক্ত রাখতে একটি অসাধারণ রক্ষাকবচ। এই বিধিনিষেধ প্রত্যেকটি মানুষের জৈবসত্তাকে একটি অসাধারণ নিয়মবদ্ধতার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বিবাহ ইসলামে শুচিসুন্দর মর্যাদার প্রতীক। ইসলাম বৈরাগ্যের ধর্ম নয়। পার্থিব জীবনবিমুক্ত হয়ে এখানে পরমার্থ মেলেনা বরং নিয়ন্ত্রিত আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পার্থিব জীবন গড়ে তোলার জন্য যা যা করণীয় তার সবটার পথনির্দেশ দিয়েছে কোরআন। সংসারের মধ্যে থেকে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করা হলো ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান আদর্শ। বিবাহের ব্যাপারে ইসলাম তাই আরও নির্দেশ দিয়েছে' "এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য এটা অল্লাহ্‌র বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থব্যয়ে বিবাহ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মাহর অর্পণ করবে। মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই আল্লার সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৪ ঃ ২৪)।[২]

বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামে নারীপুরুষের যে সমঅধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত, তার ঘোষণা কেবল কোরআনেই নেই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর জীবনের বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে কোরআনের এ ঘোষণাকে বাস্তবায়িত

---

১. আল-কোরান সূরা নিসাঃ আয়াত ২৩

২. আল-কোরআন—সূরা নিসা ঃ আয়াত ২৪

করেছেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে দেখা গেছে কী গভীর মূল্য দিয়েছেন নারীর মতামতকে। কোন কাজে তিনি মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব বা বক্তব্যকে অস্বীকার করেননি। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর কয়েকজন কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু কখনই কন্যাগণকে নিজস্ব পছন্দের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। যখন হযরত আলী (রাঃ) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে তাঁর কন্যা ফাতেমা জোহরাকে বিবাহ করার আবেদন রাখলেন তখন তিনি বললেন, "বহু ব্যক্তি আমার কাছে ফাতেমাকে বিবাহ করবার জন্যে আবেদন করেছে কিন্তু অপছন্দের জন্য সে সবগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তোমার প্রস্তাবও আমি তাকে জানাব।" হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কন্যার কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালেন। এবার ফাতেমা অসম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন না এবং বিরক্তি প্রকাশ না করে চুপ করে রইলেন।" —হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ফাতেমা জোহরার কাছ থেকে ফিরে এসে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিবাহ সম্পর্কে রাসূলের (সাঃ) স্পষ্ট বক্তব্য প্রতিভাত হয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার অমতে স্বয়ং পিতারও বিবাহের ব্যাপারে কিছু করার নেই।

ইসলাম এইভাবেই পূর্ণবয়স্কা নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পিতার সর্বময় কর্তৃত্ব খর্ব করতেও ইসলাম পিছু হটেনি। ইসলামের সামাজিক আইনে নারীর সুবিধাগুলি রক্ষা করার সুযোগ ও পুরুষের উপর নৈতিক বাধ্যবাধকতার বন্ধন রয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়ে উভয়ের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকারের মধ্যে সভ্যতা ও শালীনতা বজায় রেখে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে।

বিবাহে নারীদের সম্মতি ইসলামে বাধ্যতামূলকই। বোখারী শরীফের হাদিসে উল্লিখিত আছে যে 'এক মহিলার সম্মতি না নিয়ে তার পিতা বিবাহ দিয়েছেন এমন অভিযোগ নিয়ে ঐ মহিলা হযরতের নিকট নালিশ করায় হযরত ঐ বিবাহকে বাতিল বলে ঘোষণা করে দেন।' বোখারী শরীফের হাদিসে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে 'দ্বিতীয়বার বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্টমহিলার স্পষ্ট অভিমত গ্রহণ বাধ্যতামূলক।'

প্রকৃতপক্ষে ইসলামই প্রথম নারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে এতখানি মর্যাদা দিয়েছে যে নারীর সম্মতি ব্যতীত তার বিবাহ দেওয়া যাবে না—বিবাহ করাও যাবে না। এতবড় আলোকবর্তিকা নারীর হাতে তুলে দিয়ে ইসলাম তার জীবনের অন্ধকার দূরীকরণে প্রয়াসী হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নারীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় ইসলাম কতখানি গুরুত্ব দিয়েছে তা বিবাহের পদ্ধতির মধ্যেই প্রমাণিত। ইসলামপ্রদত্ত এই সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা যদি সমাজে কার্যকরী না হয়ে থাকে এবং নারী সমাজও যদি সভ্যতা, শালীনতা ও পারিবারিক মর্যাদা সম্মতভাবে তাঁর মত প্রকাশের দৃঢ়তা না দেখাতে পারেন--তার জন্য ইসলামের ধর্মীয় নীতি দায়ী নয়। দায়ী এ সমাজের চরম অজ্ঞতা। অমুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ছেড়েই দিলাম। বিশেষতঃ ভারতের অমুসলমান সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে কি পরিমাণ অজ্ঞতা দেখলে হাস্যোদ্রেকই হয়। আর মুসলমান সমাজের দুর্গতি এখানেই, তাঁরা জানেনেই না ইসলাম যে কেবল আধ্যাত্মিক পথ সন্ধান দেয়নি মানুষের বস্তুগত ও পার্থিব জীবনের জন্যও দিয়েছে সুদূরপ্রসারী ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্যকারী এক বিধান। যেগুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির উপর নির্ভরশীল ও একে অপরের পরিপূরক। তাই নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পেতে হলে কেবল বিবাহ নয় ইসলামের নির্ধারিত সবকটি সামাজিক বিধানকে জানতে হবে।

ইসলামের বিবাহ বিজ্ঞান পদ্ধতির আলোচনায় এটা স্পষ্ট হল যে এক্ষেত্রেও নারীরা প্রকৃত ও শালীনতাপূর্ণ স্বাধীনতার পরিপূর্ণ অধিকারিণী এবং এতে কোন গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতাও নেই। বিশ্বে সভ্যতার যতটা বিকাশ এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে তার কোন ধারাতেই এই বিবাহ পদ্ধতিকে সংকীর্ণ গোঁড়া মধ্যযুগীয় মৌলবাদী পদ্ধতি বলার অবকাশ নেই। বরং নিরপেক্ষভাবে এর নীতিনিষ্ঠ দিকগুলি সমাজে প্রচলিত হলে নারী সমাজ বিশেষতঃ ভারতীয় নারী সমাজ অন্তত বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জনের অধিকারিণী হবে। সমাজ বাল্যবিবাহের আর পিতা ও অভিভাবকের স্বেচ্ছাচারের অভিশাপ মুক্ত হবে।

নারীদের সমস্যা আলোচনা করতে গেলে বিবাহ পদ্ধতি থেকেই শুরু হয়।

পিত্রালয়ে নারীর সমস্যা থাকে অন্যরূপে। নারী তখন কন্যা। ফলে সমস্যা তার জীবনে সংকট সৃষ্টি করে না। বিবাহ থেকেই নারীজীবনের প্রকৃত সমস্যা সৃষ্টি শুরু হয়। এখান থেকে নারী হয়ে ওঠে বধূ, মাতা ও কর্ত্রী। সুতরাং জীবনের সমস্যা সৃষ্টির প্রথম ধাপ বিবাহ পদ্ধতিতেই স্পষ্ট হচ্ছে যে ইসলামী শরীয়ত এখানে নারী জীবনের জন্য সামান্যতম সমস্যার সৃষ্টি করেনি। বরং ধীশক্তি ও মানসিক বৃত্তির প্রসার ঘটাতে ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি বিজ্ঞানভিত্তিক উদার স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে সামান্যতম অমঙ্গলের কারণ নেই বা তথাকথিত মৌলবাদী বনে যাওয়ারও অবকাশ নেই। বরং যাঁরা ইসলামী বিবাহ পদ্ধতিকে মৌলবাদী প্রথা বলে মনে করেছেন তাঁদের এই সংকীর্ণ মানসিকতা পরিত্যাগ করা উচিত। মৌলবাদ বিরোধী মানসিক সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িক সমন্বয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়।

উগ্র মুসলিম বিরোধী মানসিকতা এবং অন্যদিকে মুসলমানদের অন্ধ গোঁড়ামীর মনোভাব পরিত্যাগ করে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইসলামের সামাজিক সাংস্কৃতিক বিধানগুলি বিশ্লেষণ করলে বহু আদর্শ পন্থার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে না পারার জন্যই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উন্নত দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত হতেও পারেননি গ্রহণ করতেও পারেন নি। তাঁদের কোন ধারণাই নেই ইসলাম সর্বযুগোপযোগী কি অসাধারণ বলিষ্ঠ সামাজিক নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছিল পবিত্র কোরআন ও রাসুলের জীবনের মধ্য দিয়ে। অথচ গোটা ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে আজও যেটুকু সুস্থ সভ্যতা ও উন্নত মানসিকতা রয়েছে তা যে ইসলামের উন্নত ব্যবস্থা থেকে আহরিত অকুণ্ঠ চিত্তে ইউরোপীয় সমাজসংস্কারক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেন। আর এখানেই আমাদের মানসিকতার দৈন্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। স্বচ্ছ ও উদার দৃষ্টি দিয়ে ইসলামের উন্নত সমাজব্যবস্থা ও নৈতিক মর্মবাণীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে বহু ক্ষেত্রে মুসলমান তথা ভারতীয় সমাজ উপকৃত হবে সন্দেহ নেই।

ইসলামী শরীয়ত অনুসৃত বিবাহ পদ্ধতি ঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে ইসলামী বিবাহ-ব্যবস্থায় বিশেষ কয়েকটি নিয়ম অনুসৃত হয়। যেমন ঃ

(১) **নিষিদ্ধ বিবাহ ঃ** পবিত্র কোরআনের সূরা নেসায় ২২, ২৩ ও ২৪ আয়াতে সমাজের বিশেষ কতকগুলি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতি পূর্বেই বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস থেকে জানা যায় এবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, "বংশ সম্পর্কের দরুণ সাত শ্রেণীর মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম (নিষিদ্ধ) যথা ঃ মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি। বৈবাহিক ও দুগ্ধ সম্পর্কের দরুণ সাত শ্রেণীর মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম যথা ঃ—দুধ-মা, দুধ-বোন, নিজ স্ত্রীর মা, ব্যবহৃত স্ত্রীর কন্যা, প্রকৃত সন্তানের বিবাহিত স্ত্রীর জীবদ্দশায় তদীয় ভগ্নী, পিতা, পিতামহ,মাতামহের বিবাহিত স্ত্রীগণ।[১] (বোখারী শরীফ হাদিস নং ২০১৮)

বিখ্যাত মুসলিম আইনবিদগণ যেমন এবনে আব্বাস, ইমরান এবনে হোসাইন এবং জাবের এবনে যায়েদ ও হাসান বসরী (রাঃ) ইত্যাদি মনীষীগণ একমত পোষণ করেছেন যে 'যে কেউ নিজ স্ত্রীর মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে স্বীয় স্ত্রী তার জন্য চিরতরে হারাম (অবৈধ) গণ্য হবে।'

হাদিসে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে, আবু হোরায়রার কাছ থেকে জানা যায় হযরত নবী (সাঃ) বলেছেন, "কোন মেয়েকে তার ফুফু বা খালার সঙ্গে বিবাহ হারাম। অর্থাৎ যাকে বিবাহ করা হবে তার ফুফু ও খালাকে একই-সঙ্গে বিবাহ করা যাবে না। কোন ব্যক্তির বর্তমান স্ত্রীর ফুফু (পিসী) বা ভাইঝি কিংবা খালা (মাসী) বা বোনঝিকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অনুরূপ বিবাহ অবৈধ গণ্য হবে। অন্য একটি হাদিসে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত নবী (সাঃ) বলেছেন "যদি দু ব্যক্তি পরস্পর এমন চুক্তি করে যে তারা পরস্পরের কন্যাকে পরস্পরের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবে এবং প্রত্যেকে নিজ কন্যাকে তার মাহ্‌র গণ্য করবে, পৃথক কোন মাহ্‌র দেওয়া

১. সৎমা, পিতামহী, মাতামহা। এক্ষেত্রে এঁদের সঙ্গে ঐ সকল সম্পর্কীয় ব্যক্তির বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলেও অনুরূপ সম্পর্কীয়দের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ।

হবে না। তাহলে তা নিষিদ্ধ গণ্য হবে।" (বোখারী শরীফ হাদিস নং ২০২১)

২. **বিবাহ প্রস্তাবের নিয়ম:** পুরুষ বা নারীর যে কোন একজন দুজন সৎ পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষও দুজন নারী সাক্ষীর উপস্থিতিতে সরাসরি অথবা উকিলের মাধ্যমে অপরজনের নিকট মাহ্র উল্লেখসহ প্রস্তাব দেবেন এবং যার কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে ঐ একই সাক্ষীগণের সাক্ষাতে তিনি ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করবেন। যে কোন ভাষায় এই প্রস্তাব বিধিসম্মত। তবে প্রস্তাবের বাক্য নিশ্চয়তাবোধক হতে হবে। ইসলামী শরীয়তে প্রস্তাব দেওয়াকে **ইজাব** (প্রস্তাব) ও অনুমোদন বা সমর্থন করাকে **কবুল** বলা হয়েছে।

৩. **বিবাহ স্থির হওয়ার পূর্বেই পাত্র পাত্রীর সাক্ষাৎকার।**

৪. **বিবাহে নারীর সম্মতি বাধ্যতামূলক।** অভিভাবক সম্মতি ছাড়া কারও বিয়ে দিয়ে দিলেও পাত্রী অসম্মতি জানালেই ঐ বিয়ে বাতিল গণ্য হবে।[১]

৫. **বিবাহ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা:** একজন বিবাহ প্রস্তাব দিলে সেটি প্রত্যাখ্যাত না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রথম প্রস্তাবকারী অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কারও প্রস্তাব প্রেরণকে ইসলাম অনুমোদন করে না। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "যেখানে একজন বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে সেখানে অন্য কেউ বিবাহ প্রস্তাব দেবে না যতক্ষণ না প্রথমজন নিজের প্রস্তাব ত্যাগ করে অথবা সে অপরজনকে প্রস্তাব রাখার অনুমতি দেয়।"[২]

৬. **বিবাহের শর্ত পূরণ:** বিবাহ স্থির হওয়ার সময় পাত্র সে সকল শর্ত মেনে নেয় তা সর্বাগ্রে পূরণ করা উচিৎ। যারা পরে এই সব শর্ত অমান্য করে তারা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তথা ইসলামী বিধানকে অমান্য করে। এসম্পর্কে সাহাবী ওকবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন—"কোন রমণীকে হালাল করার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে) যে শর্ত করা হয় সেই শর্তগুলি পূরণ সর্বাধিক অগ্রগণ্য।"[৩]

৭. **কোন নারীর বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে শালীনতা:** আধুনিক যুগের সমাজে বিবাহিত পুরুষকে অন্য মহিলার বিবাহের ঘটনা বিরল নয়। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী প্রভৃতি সব সম্প্র-

---

১. বোখারী শরীফ: হাদিস নং ২০২৭ও২০২৯। ২. বোখারী শরীফ: হাদিস নং ২০৩০। ৩. বোখারী শরীফ হাদিস নং ২০৩৩।

দায়ের মধ্যেও অনুরূপ বিবাহ অহরহ ঘটে চলেছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এঘটনা বেশ বেড়ে উঠেছে। আর ভারতীয় হিন্দু বিবাহ আইন ও ভারতীয় দেওয়ানী আইনের জন্য এক্ষেত্রে এক দুর্বিসহ জীবনযন্ত্রণার ছবি সমাজে বিষফোঁড়ার মত তৈরী হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম বিবাহে ইচ্ছুক নারীর উপরই সমস্যা সমাধানের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেনঃ "কোন নারীর পক্ষেই এটা জায়েজ (অনুমোদিত) ও হালাল (বৈধ) নয় যে সে অন্য স্ত্রী বর্তমানে কোন পুরুষকে বিবাহের ক্ষেত্রে তার মুসলিম ভগ্নীর তালাক দাবি করবে নিজে সর্বময় কর্ত্রী হওয়ার জন্য। তার লক্ষ্য রাখা উচিত যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ নির্ধারিত সুখভোগ করবে।"[১] এখানে স্মরণীয় যে কোন নারীর অনুরূপ তালাক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে ইসলামী বিধানে তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু শরীয়ত তথা ইসলামের নীতি অনুসারে অনুরূপ দাবি করার জন্য ঐ নারী দোষী সাব্যস্ত হবে এবং নবী (সাঃ) ঘোষিত হালাল (বৈধ) কাজের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে ইসলাম একজন মহিলার উপরে অপর একজন মহিলার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আধুনিক যুগের প্রগতিশীল নারীসমাজ, যাঁরা নারীর বহু দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছেন তাঁদের চোখে কিন্তু এই বিরাট সামাজিক ব্যাধিটা ধরা পড়ছে না। তাঁরা পুরুষকে একাধিক বিবাহ করার জন্য দোষী করেছেন। অথবা করে ফেললে দ্বিতীয় স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদা না দেওয়ার মত আইনকে স্বাগত জানিয়ে এ ধরনের ঘটনাকে অবদমন করতে চাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যার মূলে যাচ্ছেন না আদৌ। আমাদের বুঝতে হবে এখানে দোষী তো নারীই। একজন নারী যদি আর একজন নারীর স্বার্থচিন্তা না করে তবে অন্য কেউ করবে কেন। ইসলামী বিধানে সঠিক ভাবেই এ সমস্যার ক্ষেত্রে নারীকে নারীর স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৪০০ বছর আগেই।

৮. বিবাহে সমতা (কুফু):

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ কেবলমাত্র নারীপুরুষের দৈহিক সুখভোগ নয়।

---

১. বোখারী শরীফ: হাদিস নং ২০৩৪

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ বিশ্বসমাজ ও মানবকল্যাণের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। বিবাহের শুরু থেকে ন্যায়নিষ্ঠা, প্রেমপ্রীতি, শান্তিশৃঙ্খলাও বিবাহিত জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নারীপুরুষের মর্যাদা ও অধিকারকে পবিত্র ও মহান বলে ইসলাম আখ্যা দিয়েছে। এই সব আচরণে মানুষ যাতে উৎসাহিত হয় ও সেগুলিকে মর্যাদা দেয় সেজন্য রক্ষাকবচ হিসাবে বিবাহে কুফু বা সমতা বজায় রাখাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নিজেও এই কুফু বা সমতা বজায় রেখে বিবাহ দিতে উৎসাহ দিয়েছেন। তবে ওলি বা অভিভাবকগণ সবদিক বিবেচনায় যদি সমতার দাবি ত্যাগ করে পরস্পর অসম পরিবেশ ও পাত্রে বিবাহ স্থির করেন তা অবৈধ গণ্য হবে না। কিন্তু ইসলাম ধর্মের নীতি নির্ধারক বিখ্যাতচার ইমাম—হযরত ইমাম আবু হানিফা,ইমাম মালেক এবনে আনাস, ইমাম মোঃ ইদ্রিস আস শাফেঈ এবং ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল (রাঃ) একমত পোষণ করেছেন যে বিবাহে **দ্বীন ও ধর্মের সমতা** অপরিহার্য। এক্ষেত্রে ওলি বা অভিভাবকগণও এই সমতা বিসর্জনের অধিকারী নন। অর্থাৎ কোন মুসলমান নরনারী অমুসলমান নরনারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। যে পর্যন্ত না তারা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মেনে নেয়। এ ধরনের বিবাহকে ইসলাম বিবাহ বলে স্বীকার করে না বরং শুধুমাত্র প্রকাশ্য ব্যভিচার মনে করে।

ধর্মীয়সমতা বাধ্যতামূলক। এছাড়া আর্থিক, সামাজিক জাতি বংশের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা মঙ্গলজনক বলে গণ্য হয়। অর্থের প্রলোভনে অনেকে অপছন্দের পাত্রীকেও বিবাহ করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিবাহের পরিণাম হয় ভয়াবহ। এমন ক্ষেত্রে দেখা যায় কোথাও স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসেন না; ভালবাসেন তার পিতৃকুলের সম্পদকে আবার কোথাও স্ত্রীই সম্পদগর্বে থাকেন চরম গর্বিতা, স্বামীকে দেখেন অত্যন্ত করুণার দৃষ্টিতে। এই উভয়ক্ষেত্রেই জন্ম নেয় এক সামাজিক অবক্ষয়। এইসব ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই বিবাহের ক্ষেত্রে সমতা বিধানকে ইসলাম ধর্মে বাধ্যতামূলক না করলেও বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

৯. বিবাহ প্রকাশ্য ঘোষণীয় :

ইসলাম ধর্মে বিবাহের গোপনীয়তা স্বীকৃত নয়। সামাজিক ঘোষণা

ব্যতীত ইসলাম বিবাহকে বৈধ করেনি। ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত অবশ্য পালনীয় করেছেন যথা ১. পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের প্রতি প্রস্তাব ও সমর্থন অর্থাৎ ইজাব ও কবুল। ২. প্রস্তাব প্রেরণের সময় পাত্রের পক্ষ থেকে দেনমোহর (প্রদেয় স্ত্রীধন) সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ৩. এই সময় দুজন সাক্ষীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। সাক্ষী ব্যতীত ইসলামী বিধানে বিবাহ বৈধ নয়। ৪. পাত্র ও পাত্রী-পক্ষের সম্মতিতে উকিল নির্বাচন। ৫. অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ওলি বা অভি-ভাবক নির্বাচন। তাহলে উপসংহারে এটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক বিবাহ আইন ও হিন্দু কোডের প্রধান বিষয় মেয়েদের অধিকার ও বিবাহের মধ্যে কনট্রাকট (চুক্তিনীতি) প্রকৃত পক্ষে আরও অনেক ব্যাপক যুক্তি নির্ভর হয়ে মুসলিম বিবাহ আইনের চিন্তায় মুসলিম মেয়েদের জন্য ১৪০০ বছর আগে থেকেই স্বীকৃত হয়ে আছে।

বিবাহ উপলক্ষে ভোজসভা বা ওলিমা: বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ বা ওলিমা করা বৈধ। হযরত (সাঃ) নিজেও তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ওলিমা করেছেন। হযরত নিজে ওলিমার দাওয়াতে উপস্থিত হওয়াকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, 'যে ওলিমাতে শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াত করা হয় গরীবদের দাওয়াত করা হয়না সেই ওলিমার আহার্য সর্ব নিকৃষ্ট।' হযরত (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ আড়ম্বরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সাহাবী আবু আইয়ুব ও আব্দুল্লাহ্ এবনে আব্বাস এক ওলিমায় গিয়ে অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর দেখে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে আসেন।[১] বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যাণ্ড-পার্টিসহ সঙ্গীত বা জলসার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ।

বিবাহে দুফ* বাজান: বিবাহে দুফ বাজিয়ে গাথা পাঠ বৈধ। মোয়া-ওয়েজের কন্যা রুবাইয়ের বর্ণণা করেছেন, "আমার বাসর রাত উপলক্ষে হযরত নবী (সাঃ) আমাদের বাড়ীতে এসে আমার কাছে বসলেন। তখন অনেকগুলি ছোটে মেয়ে দুফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে শহিদ হওয়া আমার পূর্ব-পুরুষদের নামে শোকগাথা পাঠ করছিল। হযরত (সাঃ) কে দেখে একটি মেয়ে গাইল 'আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন যিনি অগ্রিম খবর জেনে থাকেন।' হযরত (সাঃ) তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললেন তোমরা আগে যে শোকগাথা পাঠ করছিলে তাই কর, এ ধরনের উক্তি বন্ধ কর।"

---

*দুফ এক ধরনের ক্ষুদ্র ঢোল যার একদিক খোলা এবং অন্যদিকে বাজানোর ব্যবস্থা থাকে। ১. হাদিস

॥ মাহ্‌র ॥

মাহ্‌র এর প্রকৃতি ঃ

পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে—

"এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্‌র স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে ; সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মাহ্‌র-এর কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।" (৪ ঃ ৪)[১]

"……তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে উৎপীড়ন করোনা।……" (৪ ঃ ১৯)[২]

"……তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তার মধ্য থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়……।" (২ ঃ ২২৯)[৩]

স্ত্রীর মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে ইসলামী বিধানে স্বামী বিবাহের সময় স্ত্রীকে এমন কিছু উপহার দিতে বাধ্য থাকেন যা সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থমূল্য বহন করে। একেই বলে মাহ্‌র। এ এক ধরনের স্ত্রী ধন। এটি স্ত্রীর সাম্মানিক এবং স্ত্রীরই পাওনা। কন্যার পিতামাতা বা অভিভাবকের এতে কোন অংশ নেই। তবে সামাজিক ভাবে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে এই মাহ্‌র প্রেরিত হলে কন্যার বিবাহে তা খরচ করা ইসলামী বিধি-সম্মত। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন "এটি একজন স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর মর্যাদা জ্ঞাপনের স্মারক।" তিনি আরও বলেছেন "এই সাম্মানিক

---

১. আল-কোরআন—সূরা নেসা ঃ আয়াত ৪

২. আল-কোরআন—সূরা নেসা ঃ আয়াত ১৯

আবদুল্লাহ্‌ ইউসুফ তাঁর 'দি হোলি কোরআনের' ৫২৮ নং ব্যাখ্যায় বলেছেন—নারীগণ যখন স্বেচ্ছায় তালাক দাবি করে (খোলা তালাক) সে অবস্থাতেও তাঁদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিমত ঘোষিত মাহ্‌র ফেরৎ পাওয়ার জন্য উৎপীড়ন নিষিদ্ধ। খোলা তালাক চাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী যাতে মাহ্‌র-এর দাবি পরিত্যাগে বাধ্য হয় তেমন ভাবে উৎপীড়ন নিষিদ্ধ।

৩. আল-কোরআন—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৯

প্রদানের মধ্য দিয়ে স্বামী উপলব্ধি করেন যে নারী তার জীবনে এলো, সে নেহাৎ মূল্যহীনা নয়।" এই মাহ্‌র প্রদান করে তবেই স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন অর্থাৎ পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নির্জন বাসের অধিকারী হন। মাহ্‌র নারীকে তার স্বামী ও পৃথিবীর চোখে বিশেষ পদ-মর্যাদা দান করেছে। মাহ্‌র ইসলাম সম্মত বিবাহের একটি অবিসংবাদী অংশ। মাহ্‌র-এর দুটি অংশ—মু'আজ্জাল ও মুয়াজ্জল। প্রথমটি বিবাহের সময় বা স্ত্রীর দাবী করার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেয়; দ্বিতীয় অংশ যে কোন সময় দেওয়া যেতে পারে। তবে স্ত্রী দাবী করলে তা সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করতে হয়।

এই মাহ্‌র ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত পিতা কর্তৃক কন্যাকে প্রদত্ত যৌতুকের সমধর্মী নয়। আবার আফ্রিকার সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত পাত্র-পক্ষ কর্তৃক কন্যার পিতামাতাকে দেয় কন্যাপণ ও মাহ্‌র নয়। ইসলামী বিবাহ ব্যবস্থায় মাহ্‌র বিবাহেচ্ছুক পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় স্ত্রী ধন অথবা সাম্মানিক। এই অর্থ সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি। পবিত্র কোরআনে বারবার বলা হয়েছে স্ত্রীধন (মাহ্‌র) সম্পূর্ণভাবে তারই। অন্য কারও এই অর্থে কোন অধিকার নেই। আরও বলা হয়েছে দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীর সকল রকম ভরনপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর। কোন স্ত্রী সাংসারিক কাজকর্মের পর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করলে তার অধিকারিণী স্ত্রী। স্বামী সে অর্থের উপর দাবী করতে পারেন না। স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার উপার্জন স্বামীকে দিলে তা স্বামীর গ্রহণে বাধা নেই। মাহর ব্যবস্থা নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভারসাম্য ও তাদের ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক অদ্বিতীয় ব্যবস্থা।

নারী মর্যাদায় মাহ্‌র এর সামাজিক গুরুত্ব ঃ

মনোবিজ্ঞানের মতে পুরুষ ও নারী অনুভূতির ক্ষেত্রে সমধর্মী নয়। সৃষ্টির নিয়মানুসারে নারীর মধ্যে সৌন্দর্য, মর্যাদাবোধ ও একটা সচেতন ঔদাসীন্য ক্রিয়াশীল। অন্যদিকে নির্ভরতা ও মিনতি ব্যাকুল ভালোবাসা হলো পুরুষ চরিত্রের উপাদান। শারীরিকভাবে দুর্বল নারী ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। আর ঠিক এজন্যই যুগে যুগে পুরুষই নারীর দুয়ারে পাণিপ্রার্থী হয়েছে ঘর বাঁধার জন্য।

পণ্ডিতগণের মতে পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক অনুভূতিপ্রবণ। কিন্তু

ইসলামিক দর্শনের মতে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক অনুভূতি প্রবণ। তাছাড়া নারী অনেক বেশী আত্মসংযমী, অনেক বেশী ইচ্ছাশক্তি সম্পন্না। এই চরিত্রগত পার্থক্যের জন্য ফলাফল সমান। কামনাবাসনা দমনের ক্ষেত্রে পুরুষ নারী অপেক্ষা অনেক দুর্বল। পুরুষের এই বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই নারীকে কোন সময় পুরুষের কাছে উপযাচিকা হতে হয়নি কিংবা অতি সহজে তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়নি। বরং বিপরীত দিক থেকে দেখলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে পুরুষকে নারী আপন কুক্ষিগত করেছে, তাকে জয় করেছে। নারীর কাছ থেকে তার আনন্দ আহরণের প্রথম পদক্ষেপ এবং পুরুষকে স্বামী হিসেবে স্বীকৃতিদানের সম্মান স্বরূপ একটা উপহার তাকে দেওয়া হয়।

যুগে যুগে দেখা গেছে নারীর পাণিপ্রার্থী হয়ে পুরুষে পুরুষে লড়াই হয়েছে এমনকি নারীর অধিকার নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কোন নারী কখনও কোন পুরুষের উপর অধিকার নিয়ে এমন আকাঙ্ক্ষা উদগ্র কামনা ও ধৈর্যচ্যুতি লোকসমক্ষে প্রদর্শন করেননি। ইতিহাসে এ ভূমিকায় কখনই নারী নেই, রয়েছে পুরুষ। নারী কখনও তীব্র কামনায় ধৈর্যহীনভাবে পুরুষকে অধিকার করার জন্য সচেষ্ট হয়না। নারী সবসময় নিরুদ্বিগ্ন ও উদাসীন থাকে।

মাহ্‌র একজন নারীর শালীনতা ও বিশুদ্ধতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। নারী তার সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী নিজ মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে সদাসতর্ক। সেজন্যই তার কোন মানুষের কাছে নিজেকে হালকাভাবে সমর্পণ করতে রাজী হওয়া উচিত নয়। পুরুষের কাছ থেকে তার সম্মানের স্বীকৃতি অত্যন্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পুরুষকে নারী মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে তার সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য করে ইসলাম যে বিধান জারী করেছে তা এক বিরল মর্যাদার স্বাক্ষর। ইসলামের বিধানে বিবাহ হলে মাহ্‌র যতক্ষণ না স্ত্রীকে প্রদান করা হবে ততক্ষণ স্বামী, স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের অধিকারী হতে পারেনা।

সমস্ত রকম শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও নারীর পক্ষে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও তাকে লাভ করার প্রতিযোগিতায় দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে

কারণ নিজেকে সে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে আপন মর্যাদায়। সেজন্যই যুগে যুগে দেশে দেশে মজনু তৈরী হয়েছে লায়লার জন্য; হেলেনের জন্য সংঘটিত হয়েছে ট্রয়ের যুদ্ধ। বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়ে নারী যখন বিশ্বাস ভরে নিজেকে সমর্পণ করে তখন নারী তার সেই বিশ্বাসভাজনতার স্মারক হিসেবে উপহার বা যৌতুক গ্রহণ করে স্বামীর কাছ থেকে।

যাঁরা মনে করেন শারীরিক শক্তির মধ্যেই সমস্ত ক্ষমতা নিহিত, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ইতিহাসে যাঁরা আবিষ্কার করেছেন নিষ্ঠুরতা ও শোষণের কাহিনী তাঁদের দৃষ্টি কি করে এড়িয়ে গেল যে যুগে যুগে নারীর এক অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সেই শক্তিসম্পন্ন পুরুষকে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে সামান্য দূরদৃষ্টি এবং নারী চরিত্রের আশ্চর্য জনক সুপ্ত শক্তি সম্পর্কে ধারণা থাকলে যে কেউ দেখবেন এসব ঘটনা এতটুকু বিস্ময়কর নয়।

পুরুষের উপর নারীর রয়েছে অপরিসীম প্রভাব। নারীর উপর পুরুষের প্রভাবের চেয়ে পুরুষের উপর নারীর প্রভাব অনেক বেশী। পুরুষের কৃতিত্ব, সাহসিকতা, বীরত্ব, সৃষ্টিশীলতা সর্বোপরি ব্যক্তিচরিত্রের জন্য পুরুষ ঋণী নারী ও তার মার্জিত আত্মসংযমের কাছে, ঋণী নারীর শালীনতা ও বিশুদ্ধতার কাছে, ঋণী তার আকর্ষণীয়তার কাছে। নারীই গড়ে তোলে মানুষ ও মানব সমাজকে। যেদিন নারীর শালীনতা, পবিত্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার বিলোপ ঘটবে এবং নারী পুরুষের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হবে সেদিন পুরুষ প্রথমেই অপহরণ করবে নারীর মাহ্‌র। অন্য অর্থে বলা যায় নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি, নারীর মহিমাময়ী রূপের প্রতিষ্ঠা সেদিন হবে অপহৃত, যেদিন পুরুষ তার পৌরুষের প্রকৃত সত্তাকে হবে বিস্মৃত। সেদিন সমাজবন্ধন অগ্রসর হবে দ্রুত ধ্বংসের পথে। কারণ যে মর্যাদার আসনে নারী এতকাল আসীন ছিল তা থেকে সে নিজেই নিজেকে নিক্ষিপ্ত করবে।

নারীর সেই মহিমাময়ী শক্তি যার দ্বারা নারী যুগ যুগ ধরে রক্ষা করেছে আপন মর্যাদা, প্ররোচিত করে নয়, আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে এমনভাবে পুরুষকে আকৃষ্ট করেছে যে, পুরুষই তার দুয়ারে হাজির হয়েছে যুগে যুগে। যে দুর্নিবার আত্মশক্তি দ্বারা নারী তার পাণিপ্রার্থী পুরুষদের একে অপরের

সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছে, যে অপরিমেয় শক্তি দ্বারা মানুষকে একে অপরের হননের পথে নামিয়েছে সেই শক্তি দ্বারাই যুগ যুগ ব্যাপী নারী রক্ষা করেছে তার শালীনতা, সতীত্ব এবং নিজেকে আবরণে আবৃত করে পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে—যে জন্য সে হয়ে উঠতে পেরেছে পুরুষের কর্মের প্রেরণাদাত্রী, তার ভালবাসার অনুভবের উন্মোচনকারিনী, যার দ্বারা নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের কর্মের চালিকাশক্তি স্বরূপা—তার সৃষ্টিশীলতা ও শৌর্যের প্রেরণাদাত্রী। নারীর এই শক্তিই পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি করে প্রেমের অনুভূতি, আর তার সোনারকাঠির ছোঁয়ায় পুরুষ যুগে যুগে করেছে নারী বন্দনাগান—সমর্পণ করেছে তার কাছে নিজেকে ভক্তিনম্র প্রেমের আবৃত্তি নিয়ে। নারীর এই ক্ষমতাই বিবাহের সময় পুরুষকে অনুপ্রেরণা দেয় তাকে উপহার দিতে যার নাম **মাহ্‌র**।

একটি দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে যথোপযুক্ত মাহ্‌র দেওয়া ইসলামী ব্যবস্থায় স্বামীর প্রধান কর্তব্য। মাহ্‌র ব্যবস্থাটির সঙ্গে স্ত্রীর মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দুইই জড়িত আছে। এই মাহ্‌র-এর অর্থে স্বামী পুত্র পিতা-মাতা ভ্রাতা কারুর কোন অধিকার নেই। বর্তমান যুগের সমাজে মাহ্‌র-প্রথাকে জটিল করে তোলা হয়েছে। দেখা যায় এমন অতিরিক্ত অবাস্তব মাহ্‌র ধার্য করা হয়—যা দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীর নেই। ফলে এ অর্থ স্বামী কোনদিন স্ত্রীর হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হন না। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার মত পরিস্থিতি এলে বিচ্ছেদ রোধ করার মত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মত করে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিংবা বিচ্ছেদ ঘটলে নারীর পরবর্তী জীবনের পাথেয় হিসেবে আদায় করে নেওয়ার মত প্রথা চালু হতে চলেছে। মাহ্‌র কোরআন-নির্দেশিত তবুও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজে চালু হয়েছে যৌতুকের মত নিকৃষ্ট প্রথা। স্ত্রীর অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বের প্রধান কর্তা স্বামী। কিন্তু যৌতুকপ্রথার মধ্য দিয়ে এই দায়িত্বের অনেকখানি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কন্যার অভিভাবকদের উপর।

মাহ্‌র সম্পর্কে কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "তোমরা নারীদের তাদের মাহ্‌র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে,"। (৪ : ৪)

প্রথমতঃ এই মাহ্‌র সম্পূর্ণরূপে নারীর নিজের প্রাপ্য। এটি পুরুষের

অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে অবশ্য দেয় উপহার বা সাম্মানিক। দ্বিতীয়তঃ এটি স্বামীর ভালোবাসার ঐকান্তিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতার স্মারক স্বরূপ। তৃতীয়তঃ এটি স্বতঃস্ফূর্ত, আগ্রহসহকারে দেয়। চতুর্থতঃ এটি নারীমর্যাদাকে পুরুষের স্বীকৃতি দানের চুক্তি।

কন্যাকে প্রদত্ত মাহ্‌র-এ কন্যার পিতার কোন অধিকার নেই। কন্যার মাধ্যমে নিজ স্বার্থ পূরণের অধিকার ইসলাম কোন পিতাকে দেয়নি। তেমনি পুত্রের পিতাকেও দেয়নি যৌতুক দাবী করার মত অধিকার। ইসলামে বিবাহ সম্পূর্ণভাবে একজন পুরুষ ও একজন নারীর সম্পর্ক স্থাপন। তাই বিবাহের দিন মাহ্‌র সম্পূর্ণ ভাবে স্বামীর দ্বারা স্ত্রীকে দেয় স্ত্রী ধন।

ইসলাম কন্যাকে বিবাহের বিনিময়ে কন্যারপিতার জন্যপাত্রের কাজ করে দেওয়ার প্রথার বিলুপ্তি ঘটায়। চীনে আজও এই প্রথা প্রচলিত। সেখানে বিবাহের পর স্ত্রীর বাবার বাড়ীতে কাজ করার জন্য স্বামী বাধ্য থাকে। আজও চীনের গ্রামাঞ্চলে এজন্য মাবাবা কন্যাসন্তান জন্মালে আনন্দিত হন। হযরত মূসা (আঃ) ও শোয়ায়েব (আঃ)[১] -এর জীবনের ঘটনা থেকেও আমরা এমন প্রথার অস্তিত্ব পাই। শোয়ায়েব (আঃ)-এর কন্যাকে বিবাহের বিনিময়ে মূসা (আঃ)-কে দশবছর কাজ করে দিতে হয়েছিল। বাস্তবে দেখা যেত জামাতার কাছ থেকে অর্থ কিংবা কায়িক শ্রম যা কন্যার পিতা দাবী করতেন তার অধিকারী হতেন কন্যার পিতা বা অভিভাবক।

যেভাবেই প্রচলিত থাকনা কেন ইসলাম এই প্রথার অবসান ঘটায়। ইসলাম ঘোষণা করে স্বামীর প্রদত্ত অর্থে বা সম্পদে কন্যার পিতার কোন অধিকার নেই। এমনকি সে অর্থ বা সম্পদ কন্যার জন্যই ব্যয় করবেন এমন সদিচ্ছা থাকলেও কন্যার অভিভাবকগণের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। মাহ্‌র সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর নিজস্ব। তিনি সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছামত এই অর্থ ব্যবহার করতে পারেন।

আরবে অন্ধকার যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবারের অন্যান্য পুরুষগণ উত্তরাধিকারসূত্রে তার অভিভাবক বিবেচিত হতেন।

পবিত্র কোরআনে নারীদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত করা

---

১. এঁরা দুজনেই পৃথিবীর মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌ প্রেরিত নবী।

নিষিদ্ধ। সূরা নেসার ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে "হে বিশ্বাসীগণ! নারীদিগকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়।......"

ইসলামপূর্ব যুগে মাহ্‌র-এর স্থান ঃ

সৃষ্টির নিয়মানুসারে নারীপুরুষের নিজ নিজ ভূমিকার পার্থক্য ও একে অপরের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বকে ভিত্তি করেই মাহর প্রথা দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষের কঠোরতা, ঔদ্ধত্য ও মালিকানাবোধ থেকে নয় সদাশয়তা ও সৌজন্যতাবোধ থেকে মাহ্‌র-এর উৎপত্তি। অন্যদিক থেকে বলা যায় নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষমতা, দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তি জন্ম দিয়েছে মাহ্‌র-এর। নারীর সম্মান ও পদ-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মাহ্‌র স্রষ্টার বিধানস্বরূপ। মাহ্‌র নারীকে করে তোলে ব্যক্তিত্বময়ী। একজন নারীর কাছে মাহ্‌র-এর বস্তুমূল্যের চেয়ে নৈতিক মূল্য অনেক বেশী।

পবিত্র কোরআন অন্ধকার যুগের মাহ্‌র সম্পর্কিত প্রথাকে দূর করে এর প্রকৃত স্বাভাবিক রূপের প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামপূর্ব যুগে কন্যার পিতা-মাতাগণ মনে করতেন—কন্যাকে লালনপালন করে বড় করে তোলার পুরস্কার স্বরূপ মাহ্‌র তাঁদের প্রাপ্য।

(প্রাক ইসলামী যুগে পিতা, পিতার মৃত্যু হয়ে থাকলে ভ্রাতাগণ ভগিনীর অভিভাবকত্বের অধিকার লাভ করত। তারা কন্যাদের বিয়ে দিত তাদের পছন্দের উপর নির্ভর করে নয় নিজেদের পছন্দমত। তারা মাহ্‌র-এর মালিক মনে করত নিজেদের, কন্যাদের নয়। তারা কন্যার বিনিময় করত। অর্থাৎ একজন তার কন্যার বা ভগিনীর বিবাহের বিনিময়ে পাত্রের কন্যা বা ভগিনীকে বিবাহ করত। ইসলাম এই প্রথার অবসান ঘটায়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন—কন্যা বা ভগিনীর মাহ্‌র হিসাবে বিনিময় ইসলামে নিষিদ্ধ।)

(প্রাক ইসলামী যুগের চিন্তাধারায় নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের দাসের মত। তাকে ভৃত্য কিংবা শ্রমিকের মত দেখা হতো। দেখা হতো অর্থোপার্জনের যন্ত্র হিসাবে। আবার যার দ্বারা মাঝে মাঝে পুরুষের কামনা-বাসনাও চরিতার্থ হতো। পুরুষ নারীকে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক

স্বাধীনতা দিতো না। নারীর শ্রমের ফসলে অধিকার ছিল পিতার কিংবা স্বামীর। নারীর পতি নির্বাচনেরও কোন স্বাধীনতা ছিল না। নিজস্ব স্বাধীন ব্যবসা করার অধিকার ছিল না। বলতে গেলে স্বামী মাহ্‌র হিসেবে যে অর্থ স্ত্রীকে দিতো এবং যে অর্থে তার ভরণপোষণ বহন করত তার বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে পেত প্রচুর অর্থ নৈতিক মুনাফা।)

মাহ্‌র খোরপোষের বিকল্প নয়ঃ

(ইসলাম নারীকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করল এক অনবদ্য ভূমিকায়। ইসলাম বিবাহকালে নারীকে এমন একটি উপহার দিতে পুরুষকে বাধ্য করল যে উপহারে একমাত্র অধিকার নারীর। কন্যার পিতামাতা কিংবা স্বামী কারোর কোন অংশ তাতে থাকলনা। এই উপহার প্রাপ্তির অধিকারের মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথমতঃ নারী বিবাহের ব্যাপারে নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার অর্জন করল। পিতামাতা বা ভ্রাতার স্বার্থানুসারী কোন সম্পর্ক মেনে নেওয়া রদ হলো। দ্বিতীয়তঃ কি পিতৃগৃহে কি স্বামীগৃহে নিজের স্বার্থে কন্যা বা স্ত্রীকে ব্যবহার করার পথ বন্ধ হলো। ইসলাম বিবাহের একটি সুস্থ কাঠামো রচনা করল এই মাহ্‌র-প্রথার উপর ভিত্তি করে। পবিত্র কোরআনে অজস্র শ্লোকে (আয়াতে) ঘোষণা করা হয়েছে মাহ্‌র সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর পাওনা—অন্য কারোর নয়। এই মাহ্‌র স্ত্রীর ভরণপোষণের বাইরে। তাছাড়া স্ত্রী নিজের পরিশ্রমে কোন অর্থলাভ করলে সেটিও তার নিজস্ব আয় বলে ইসলাম রায় দিয়েছে। এই অর্থে পিতা মাতা বা স্বামী কারও অধিকার নেই।

মাহ্‌র সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জাগে যে যখন মাহ্‌র কন্যার অভিভাবকগণ গ্রহণ করতেন তখন কন্যা স্বামীগৃহে দাসীর মত গমন করত ও নিদারুণভাবে শোষিত হতো। তখন এই মাহ্‌র ছিল কন্যার ক্রয়দামের সমপর্যায়ের। তাছাড়া প্রত্যেক দাসের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার প্রভুর। ইসলাম এই প্রথা রদ করে ঘোষণা করলো কন্যার পিতামাতার মাহ্‌র-এর অর্থে কোন অধিকার নেই এবং স্বামীরও অধিকার নেই স্ত্রীকে শোষণ করার। পবিত্র

কোরআন দ্ব্যর্থকণ্ঠে ঘোষণা করল, "...পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।"...(আল-কোরআন ৪ঃ ৩২)

এত বিস্তৃত যেখানে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেখানে মাহ্‌র প্রদানের ও ভরণপোষণের প্রয়োজনীয়তা কোথায় এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

যন্ত্রসভ্যতা ও বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা অনুভূতি, আবেগ এগুলোই যে মানুষকে পরিচালিত করে তা স্বীকার করতে নারাজ। এঁরা সব সম্পর্কের পিছনে অর্থের কার্যকরী ভূমিকার অস্তিত্ব দেখতে পান। মধ্যযুগে পাশ্চাত্ত্যের মানুষ ধর্মের নামে নৃশংস অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিল। ধর্মের নামে নিষ্ঠুর বর্বরতা, উৎপীড়ন, জীবন্ত দগ্ধ করার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল ইউরোপের মানুষ। ফলে স্বাভাবিকভাবে ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদির প্রতি তারা হয়ে উঠেছিল ভীত সন্ত্রস্ত। তাই জীবনকে তারা দেখতে শুরু করলো বস্তু-তান্ত্রিক দৃষ্টিতে। তাই তাঁরা স্বীকৃতি দিতে চাইলেন না ঈশ্বর প্রেরিত বাণী-বাহকগণকে যাঁরা গোটা ইতিহাস জুড়ে সুবিচার, ঐক্যবোধ ব্যাখ্যা করেছেন, বিপথগামিতার বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন—আর সেই প্রচারকে সফল করতে গিয়ে সহ্য করেছেন সীমাহীন যন্ত্রণা। একটি যুগের মুষ্টিমেয় মানুষের অবিচার দর্শন করে তাঁরা ঈশ্বরদত্ত বিবেকবোধকেই অবজ্ঞা করলেন।

পুরুষ ও স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে নিষ্ঠুরতা বর্বরতা যথেষ্ট সক্রিয়—তাতে কোন সন্দেহ নেই। পবিত্র কোরআনে এরকম নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বহু সাবধানবাণী ঘোষিত হয়েছে। তবুও বলা যাবে না যে নরনারীর সম্পর্ক নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা মুক্ত করা গেছে।

মাহ্‌র-প্রথার প্রবর্তন স্রষ্টার দুই সৃষ্টি নর ও নারীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে তাদের সুদৃঢ় সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও ভূমিকার পার্থক্যই মাহ্‌র-এর ভিত্তি।

বঙ্গীয় সমাজে মাহ্‌র তথা দেন মোহর ঃ

আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক কাঠামো মাহ্‌র-এর সুদূরপ্রসারী দিকগুলির গতিরুদ্ধ করে ফেলছে। ভারতীয় তথা বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাবে স্ত্রীগণ তাদের আল্লাহ প্রদত্ত মাহ্‌র প্রাপ্তির

অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই মাহ্‌র-এর অর্থ কোথাও স্ত্রীর হাতে পৌঁছায় না। তার একটি কারণ হলো অতিরিক্ত অবাস্তব ম.হ্‌র নির্ধারণ। অনেক ক্ষেত্রে এটাকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর বিরুদ্ধে সিকিওরিটি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। অথচ বাস্তবে দেখা যায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্বামীর কাছ থেকে ঐ মাহ্‌র-এর অর্থ উদ্ধারের কোন উপায় থাকেনা। থাকেনা এ জন্য যে প্রথমতঃ মাহ্‌র-এর অর্থ উদ্ধারের জন্য কোন সামাজিক বাঁধন নেই। দ্বিতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে এমন কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ নেই যা থেকে এ অর্থ উদ্ধার সম্ভব হতে পারে। ফলে এই যে বিবাহ বিচ্ছেদকে বাধা দান কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের পরে একটা আর্থিক সংস্থান হিসেবে মাহ্‌র-এর যে ভূমিকা তাও পারতপক্ষে মিথ্যায় পর্যবসিত হচ্ছে। মাহ্‌র নারীর প্রতি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অধিকার তবুও এটি সমাজের সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত হচ্ছে। এই উপমহাদেশে নারী পুরুষ কেউই এই অধিকার ও দায়িত্বকে মর্যাদা দেন না। ধরা যাক কারও বিবাহে মাহ্‌র নির্ধারণ হলো এক লক্ষ টাকা। এই টাকা যদি বিবাহের সময় বা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাসের পূর্বেই স্ত্রীর হাতে নগদ দেওয়া হয় এবং স্ত্রী যদি ঐ অর্থ নিজ তত্ত্বাবধানে গচ্ছিত রাখে বা দেশের প্রচলিত নিয়মে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্কে লগ্নি করে তাহলে দশ বছরেই তার পরিমাণ দাঁড়ায় চার লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এক লক্ষ টাকার দেন মোহর প্রাপ্তা মহিলা দশ বছরে চার লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যেতে পারেন। আমাদের আর্থ সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে এমন সম্ভাবনা নেই যে চার লক্ষ টাকার মালিককে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে বা বিতাড়িত করবে। আর যদি এরকম ঘটনা ঘটেও তাতে চার লক্ষ টাকার মালিক মহিলার সামান্যতম আর্থিক অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।)

কিছু লোক অজ্ঞতাবশতঃ আর কিছু লোক জেনেও না জানার ভান করে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নারীদেরকে দেয় মাহ্‌র এক কপর্দকও নববধূর হাতে না দিয়ে তাকে স্ত্রী রূপে ভোগ করে চলেছেন। মাহ্‌র না দেওয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর কোন সম্মতি না নিয়েই স্বামী-স্ত্রী স্বরূপ নির্জন বসবাস শুরু করছেন। এরূপ বসবাসের ব্যাপারে নারীর কোন আপত্তি আছে কিনা তা জানার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগণ। অথচ

এভাবে মাহ্‌র না দিয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে নির্জনবাস শরীয়তের বিধানে নিষিদ্ধ।

মাহ্‌র-এর কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। মাহ্‌র দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সময় নেওয়ার জন্য কোরআনে স্পষ্টভাবে স্ত্রীর অনুমতি নিতে বলা হয়েছে।

মাহ্‌র যথাযথভাবে প্রদান করাও এবাদাত। আর এটি না দেওয়ার অর্থ কোরআনের নির্দেশ তথা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা।

মাহ্‌র-এর পরিমাণ খুব কম হওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিজের ও তাঁর কন্যার বিবাহে ১২ উক্কিয়াহ মাহ্‌র ধার্য হয়েছিল যা প্রায় ৫০০ দেরহাম। তৎকালীন ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ জানা নেই। পনের শত বছর আগের ৫০০ দেরহামের মূল্যমান বর্তমানে কত দেরহাম তা জানা নেই। তবে বর্তমান সময়ের ৫০০ দেরহাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু হাজার টাকা। কিন্তু সে যুগের ধাতুনির্মিত দেরহামের মূল্য আরও অনেক বেশী।

আমাদের আত্মসমালোচনা করা উচিত। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ সম্মানীয় মানুষ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নিজেই নিজের এবং কন্যার বিবাহে এতটা মাহ্‌র প্রদান ও ধার্য করেছিলেন। আমরা এবং আমাদের স্ত্রী-কন্যা গণ কি হযরতের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান ? যদি তা না হয় এবং বস্তুত পক্ষে আমরা কখনই তা নই তাহলে আমরা মাহ্‌র প্রদান ও ধার্যের ক্ষেত্রে কেন এত অবহেলা করি। কেন ভুলে যাই যে মাহ্‌র ধার্য করা ও নগদ প্রদান করাই আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র নবীর বিধান। প্রত্যেক মুসলমানকে সতর্ক হতে হবে ও গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে মাহ্‌র তুচ্ছ ও অবহেলার বিষয় নয়। কিংবা নামমাত্র দায়সারা গোছের করে মাহ্‌র-এর পরিমাণ ধার্য করাও ইসলামের বিধান নয়। বরং মাহ্‌র-এর পরিমাণ যথেষ্ট ও নগদ প্রদানের নিয়ম প্রচলিত হওয়া উচিত। যদি অত্যন্ত নিম্নবিত্তদের ক্ষেত্রেও ধরা যায় যেখানে মাত্র পাঁচহাজার টাকা মাহ্‌র ধার্য হয় সে ক্ষেত্রেও বিবাহের দিনে মাহ্‌র প্রদান করলে মাত্র দশ বছরে সাধারণ নিয়মে ঐ স্ত্রীধন বিশ হাজারে পৌঁছুতে পারে।

স্ত্রীদের খোরপোষের দুশ্চিন্তায় ও নারীদের প্রতি সহানুভূতির যে

কুন্তীরাশ্রু বইয়ে দেওয়া হয়—তা সার্থক হতো ইসলামের প্রকৃত বিধানকে জেনে তা সমাজে কার্যকরী করার পন্থা নির্ণয় করলে। সাধারণভাবে আমাদের সমাজে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষের সামনে এক ধরনের প্রচার এমন তুঙ্গে তোলা হচ্ছে যেন সমাজের সব বিবাহবিচ্ছেদ পুরুষের জন্য ঘটছে আর সব বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যেভাবেই হোক পুরুষকে দায়ী করে তার উপরে বোঝা চাপাতে পারলে তবেই প্রকৃতপক্ষে যেন নারীদের প্রতি ন্যায়নীতি প্রদর্শিত হয়। এই ভ্রান্ত পন্থা ত্যাগ করে সমাজে আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাহ্‌র ধার্য ও তা বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই নববধূকে দিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক করার আইন করার জন্য সক্রিয় আন্দোলন করলে নারী জীবনে এক পরম স্থিতি ও স্বস্তি নেমে আসত। এবং ভবিষ্যতে তার জীবনে কোন দুর্ঘটনা নেমে এলেও খোরপোষ-এর জন্য আদালতের দরজায় ঘুরতে হতোনা।

পার্থিব জীবনের সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক দাম্পত্য সম্পর্ক। যে পক্ষ থেকেই শুরু হোক না কেন ভাবতে হবে কতটা অবিশ্বাস ও তিক্ততার সৃষ্টি হলে তাতে বিচ্ছেদ নেমে আসতে পারে! সেই বিচ্ছেদ ঘটার পরও সেই ব্যক্তির কাছ থেকে খোরপোষ নিয়ে দিন গুজরান করার মধ্যে কোথায় রয়েছে নারীর মর্যাদা ও আত্মসম্মান। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়, বিজ্ঞান সভ্যতার এক উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে কিছুতেই মেলানো যায়না মানব সমাজের অর্ধাংশের এই অবমাননা। আমরা কেউ নারীকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবছি না। দাবী করছি না একজন পুরুষের মত তারও কাজ পাওয়ার অধিকার আছে পুরুষ যদি তাকে লাঞ্ছনা করে তবে তারও স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে। পুরুষ যেমন নারীর উপার্জনের উপর নির্ভরশীল নয় নারীকেও তেমনি পুরুষের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল করে রাখার মত অবমাননা থেকে মুক্তি দিতে হবে। এ আদর্শবোধ নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তারা কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন জানিনা। যার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে গেল তারই দেওয়া অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করে দিয়ে আমরা আজ নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছি। নারীজীবনে এর চেয়ে বড় অপমান ও অবমাননা কিছুতেই নেই। তবুও এই দাবির পতাকাতলে

হয়ত দলে দলে অনেকে হাজির হয়েছেন সে তো এদেশের চরম অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার ফল। আন্দোলনের শিক্ষিত মর্যাদাসম্পন্ন নারী নেতৃগণই যখন এমন একটা দাবি করতে পেরেছেন সেখানে ৭৫% অশিক্ষিত জনসাধারণ তাতে দলে দলে না যোগ দেওয়ার কোন হেতু নেই।

ইসলাম এই অবমাননাকর পরিস্থিতিতে পৌঁছানোর বহু পূর্ব থেকেই সম্মানজনকভাবে আপন আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার হাতিয়ার নারীর হাতেই তুলে দিয়েছে। বিবাহের সময়ই নির্ধারিত মাহ্‌র প্রদান পুরুষের দাম্পত্য জীবনের প্রবেশের মুহূর্তে প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই মাহ্‌র দিতে অস্বীকার করলে নারী দাম্পত্যমিলনে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামীর রেহাই পাওয়ার কোন পথ ইসলাম দেয়নি। শুধুমাত্র স্ত্রী যদি মাহ্‌র প্রদান করার জন্য স্বামীকে কিছু সময় মঞ্জুর করে তবেই সে সেই সময়ের জন্য ছাড়পত্র পেতে পারে। আর স্বামীর আর্থিক সক্ষমতা অক্ষমতার জন্য স্ত্রী নিজ অধিকার কতটা প্রয়োগ করবে সে দায়িত্ব তার নিজের। বর্তমান যুগের সমাজের সর্বস্তরেই নারী এই অমোঘ অধিকার প্রয়োগ করার ব্যাপারে যথেষ্ট শক্তিময়ী। কেবলমাত্র প্রয়োজন তাকে অধিকার সচেতন করে তোলা।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিটি মুসলমান নারীকে বুঝতে হবে মাহ্‌রই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। সুতরাং বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তা পাওয়ার দাবি তাদের তুলতে হবে। এবং এই নগদ অর্থ কোনভাবেই নিজের জীবদ্দশায় অন্য কোন ব্যক্তি বা স্বামীকে দেওয়া থেকে বিরত থাকার মত মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে। আর এ ব্যাপারে সৎ ও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে অভিভাবক, সমাজ সংস্কারক, সমাজ বিজ্ঞানী, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে। মাহ্‌রকে শুধুমাত্র শরীয়তী নীতির আবরণে আবদ্ধ না রেখে তাকে সফলতাবে কার্যকরী করতে সামাজিক ভাবে দুর্বল নারী সমাজের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত প্রতিটি সৎ মুসলমান ও ধর্মীয় আদর্শে জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের। ভুলে গেলে চলবেনা আল্লাহ্‌ বলেছেন পুরুষ নারীর কর্তা (রক্ষক)। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে (কোন কোন বিষয়ে) অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (৪ : ৩৪) মনে রাখতে হবে—"...ওয়াতুন নেসায়া স্বাদাক্বাতেহিন্না নেহলাতান..."

অর্থাৎ "...তোমরা নারীদিগকে তাদের মাহ্‌র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে।" (সূরা নেসা : ৪)। মনে রাখতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ হজ্জে আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মুসলিমকে আহ্বান করে বলেছেন, "হে মুসলমানগণ মনে রেখো—আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেছ। নারী জাতির কথা ভুলোনা। তাদের প্রতি অত্যাচার করোনা।"

ইসলামী শরীয়তে মাহ্‌র ঃ

মাহ্‌র আরবী শব্দ এর আভিধানিক অর্থ উপহার। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অর্থ এমন ধন যা স্বামীর পক্ষ থেকে তার স্ত্রীকে প্রদান করা **ওয়াজেব**। মাহ্‌র তিন রকম। (১) মো 'আজ্জাল (২) গায়র মো আজ্জাল (৩) মাহ্‌র মেসেল ১. মো'আজ্জাল হল এমন মাহ্‌র যা স্ত্রী দাবী করা মাত্র দিয়ে দিতে হবে। দাবী অনুযায়ী এই মাহ্‌র দেওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে নির্জন বাস বৈধ নয়। ২. গায়র মো'আজ্জাল বা মোয়াজ্জাল যা দেরীতে সময় সুযোগ মত দেওয়া যায়। ৩. মাহর এ মেসেল হল এমন মাহর যা পাত্রীর পিতৃ-কুলের (ফুফু বোন ইত্যাদি) নারীদের মাহ্‌রের সামঞ্জস্য অনুযায়ী ধার্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে কন্যার বয়স, শিক্ষা, সৌন্দর্য, ধার্মিকতা, ঐশ্বর্য, দেশ ও কাল প্রভৃতির বিষয়ের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে অসাল্লাম আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগেই বলেছেন "মাহ্‌র দশ দেরহামের কম হতে পারে না।" দশ দেরহামের কম মাহ্‌র ধার্য করলেও তা দশ দেরহাম গন্য হবে। এমন কি ইসলামী বিবাহে মাহ্‌র উল্লেখিত না হলেও সর্ব নিম্ন দশ দেরহাম মাহ্‌র ওয়াজেব হয়ে যাবে।

১৪০০ বছর আগে যে দেরহাম প্রচলিত ছিল তার অনুপাতে বর্তমান সময় ঐ দশ দেরহামের মূল্যমান নির্দ্ধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ বর্তমান সময় তৎকালের মত দেরহাম ধাতু নির্মিত নয়। এখন দেরহাম আমাদের দেশের টাকার মত নোট। এখন এক দেরহাম সমান ভারতীয় মুদ্রা প্রায় সাড়ে তিন টাকা। আসলে হযরত যে দশ দেরহাম সর্ব নিম্ন মাহ্‌র বলেছেন সেই দেরহাম ছিল মুল্যবান ধাতু নির্মিত। সেই দশ দেরহামে যতটা যে ধাতু ছিল তার বর্তমান মূল্যই প্রকৃত পক্ষে সর্বনিম্ন মাহ্‌র হওয়াই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত।

।। একাধিক বিবাহ ।।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। তাই যুগ যুগ ব্যাপী প্রবাহিত মানবজীবন চক্রের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সংকটের মোকাবিলা করার মত পথ নির্দেশ ইসলাম রচনা করেছে। জীবনের যে কোন সংকটলগ্নে মানুষ ইসলামী বিধানের কাছে সমাধান পেতে পারে। কারণ ইসলাম সর্বকালের ও সর্বদেশের গ্রহণযোগ্য এমন বিধান রচনা করেছে যা সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানবকল্যাণের সহায়ক। এমন কোন নীতি ইসলাম রচনা করেনি যা বাস্তব ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হতে পারে কিংবা কোন নূতন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

অথচ ইসলাম ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ জনের চরম অজ্ঞতা তাদেরকে ইসলামী বিধান সম্পর্কে কুৎসা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোরাক যুগিয়েছে। যারা এই কুৎসা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপমূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা কিন্তু তথাকথিত অর্থে উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত বিদগ্ধজন। এঁরা ইসলামের প্রখর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক বিধানগুলিকে বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করার মানসিকতাই দেখাতে পারলেন না। তাঁদের সমালোচনার শিকার হয়েছে সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্য ইসলামে অনুসৃত সব নীতি। এমনই একটি নীতি হলো প্রয়োজনে একাধিক বিবাহের ছাড়-পত্র। ইসলামী শিক্ষা ও নীতি সম্পর্কে সামান্যতম ধ্যান ধারণা বিবর্জিত বৃহত্তর মুসলমান জনগোষ্ঠী, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণাবঞ্চিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ লিখিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্তঃসারশূন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রচার সর্বস্ব প্রবন্ধ দ্বারা নানাভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ইসলামে কোন **বহুবিবাহ প্রথা** নেই—রয়েছে **একাধিক বিবাহ** এবং এই একাধিক বিবাহ প্রথা ইসলাম ধর্মের **নিয়ম নয়—ব্যতিক্রম মাত্র**। বিশেষ পরিস্থিতিতে শর্তসাপেক্ষ একটি আচরণমাত্র। তাও সীমাবদ্ধ সংখ্যায় বিধৃত অর্থাৎ কখনই চার অতিক্রম করতে পারবে না। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষ এই বিধানের পিছনে সমাজকে সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন রাখার কত উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে তা বিচার করে দেখেন না।

পবিত্র কোরআনে একাধিক বিবাহ সম্পর্কে একটি মাত্র ঘোষণা আছে তা হলো ঃ—

"ওয়া ইন খেফতুম আল্লা তোক্‌সেত্বু ফিল ইয়াতামা ফানকেহু মাত্বাবা লাকুম মিনান নেসায়ে মাসনা ওয়া সোলাসা ওয়া রোবাআ ; ফাইন খেফতুম আল্লা তাআদেলু ফাওয়াহেদাতান ; আওমা মালাকাত আইমানেকুম, যালেকা আদনা আল্লা তায়ুলু।" অর্থাৎ "তোমরা যদি আশংকা কর যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা তবে বিবাহ করবে নারীদের[1] মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার আর যদি আশংকা কর যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকার-ভুক্ত দাসীকে[2]। এতেই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা (৪ঃ৩)।"[3]

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে ইসলাম ধর্মে একাধিক বিবাহ অর্থ এই নয় যে মুসলমান মাত্রই ইচ্ছেমত যখন খুশি, যত খুশি বিয়ে করবে আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করবে এবং নারীজীবনে যন্ত্রণা, লাঞ্ছনার কারণ সৃষ্টি করবে।

বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে, ব্যক্তি জীবনের বিশেষ সংকট সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতেই ইসলাম এই সীমিত সুযোগের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে। যে প্রেক্ষিতে এই বিধান সৃষ্টি সেদিকে একটু নজর দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য যার পুরুষ জনসংখ্যা তখন মাত্র সাতশত সেই সময় এক ঘনীভূত সংকট তাঁদের ঘিরে ধরে। তৃতীয় হিজরীতে কোরায়েশগণ মদিনা আক্রমণ করে। এটি তাদের দ্বিতীয় আক্রমণ। প্রথম আক্রমণের মোকাবিলা হয়েছিল বদর প্রান্তে। দ্বিতীয় আক্রমণকালে যুদ্ধ সংগঠিত হয় ওহোদ প্রান্তে। প্রথম যুদ্ধে কোরায়েশগণ পরাজিত হওয়ায় ওহোদের যুদ্ধে তারা বিশাল সৈন্যবাহিনী ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। এই ভীষণ যুদ্ধে ৭০০ মুসলমানের মধ্যে ৭০

---

১. এস্থলে নারী অর্থ স্বাধীনা নারী, কারন এর পরেই দাসীর উল্লেখ রয়েছে।

২. দাসী অর্থে ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধবন্দিনী উভয়কেই বোঝায়।

৩. আল কোরআন—সূরা নিসা আয়াত ৩

জন নিহত হন। বহু ব্যক্তি আহত ও অক্ষম হয়ে যান। এই যুদ্ধের ফলে মুষ্টিমেয় মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক স্ত্রী বিধবা হন, অনেক শিশু, নারী অসহায় হয়ে পড়ে। এইসব বিধবা, অসহায়া কন্যা ও শিশুর তত্ত্বাবধান ও ভরণপোষণ মুসলমানদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। আর তখনই পবিত্র কোরআনের ঐ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে সংকটগ্রস্ত মুসলমান সমাজ পথ খুঁজে পায়। নিরসন হয় ঐ গভীর সমস্যা ও সংকটের। আমরা জানি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লক্ষ লক্ষ নারী বিধবা হয়, লক্ষ লক্ষ পিতার কন্যা অনাথ হয়। কিন্তু তাদের সম্মানজনক আশ্রয় অথবা বিবাহ কোনটাই সম্ভব হয়নি। তার ফলে সমাজে তৈরী হয়েছিল করুণ বিভীষিকা। রাষ্ট্র এই বিপুল সংখ্যক নারীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে খৃষ্টধর্মে একাধিক বিবাহ আইনসিদ্ধ ছিল না। ঐসব বিধবা, অভিভাবক ও পিতৃহীনা কন্যাগণ বেঁচে থাকার তাগিদে দেহব্যবসা অবলম্বন করতেও বাধ্য হন। ফলে ঐসব দেশে জন্ম নেয় লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান। ইতিহাসে এদেরই War-babies বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শর্তসাপেক্ষে ইসলামের চার বিবাহের সীমিত পরিধি যাঁদের চোখে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, নারীলাঞ্ছনার প্রথা তাঁরা কি বলবেন বিশ্বব্যাপী এই করুণ চিত্র খুবই সুস্থ ও মানবিক! এরকম সংকটকালে সমাজের শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থে ইসলাম একের অধিক নারীর সম্মানজনক দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। এর দ্বারা ইসলাম যে সর্বদেশ ও সর্বকালের জন্য একটি শুচি-সুন্দর সুমহান ও সুস্থির প্রথার জন্ম দিয়েছে সে বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইসলামী সমাজ বিজ্ঞানীগণ এটা বুঝেছিলেন যে এরূপ ব্যাপক যুদ্ধজনিত সংকট পৃথিবীতে ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। এছাড়াও সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের বিশেষ কিছু পরিস্থিতি আছে যে পরিস্থিতিতে শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিবাহের সুযোগ না থাকলে বহু ক্ষেত্রেই বাস্তব অবস্থা নারীকে অন্ধকার জীবনের পথে ঠেলে দেয়। জীবনের এই অপ্রতিরোধ্য পরিস্থিতিতে একাধিক বিবাহের সুযোগ থাকলে যে কোন একজন নারী অস্বাভাবিক জীবনে লাঞ্ছনার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাবে বিভিন্ন পথে।

প্রথমতঃ প্রথমা স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তা হলে কখনই তাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করা বা তার প্রতি নির্মম অত্যাচার চালানোর মানসিকতা যাতে সৃষ্টি না হতে পারে, সেজন্য পূর্ব থেকে মানুষের মধ্যে একটা মানসিক স্তরের প্রস্তুতি শরীয়ত রেখেছে যাতে সে প্রয়োজনে, প্রথমা স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদায় রেখে আর একজন স্ত্রী গ্রহণ করে এই দারুন জীবন সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ যদি প্রথমা স্ত্রীর আজীবন বন্ধ্যাত্ব বংশ লুপ্ত হওয়ার কারণ হয় অথচ স্বামী তার বংশ লুপ্ত করতে না চান সেক্ষেত্রে প্রথমা স্ত্রীর বর্তমানে তার কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে, তার প্রতি অমানবিক আচরণ না করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের দ্বারা তাঁর এই সামাজিক বাসনাকে সার্থক করতে পারেন।

তৃতীয়তঃ যদি কোন পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা উগ্র হয় ও স্ত্রী যৌন শীতল হন এবং এই অসম যৌন ক্ষমতার জন্য বাস্তব জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তাহলে মানুষ কিভাবে জীবনযন্ত্রণা মুক্ত হবে ? এক্ষেত্রে পুরুষ কি দাম্পত্য জীবনের বাইরে যথেচ্ছ ব্যভিচার করবে, কিংবা উপপত্নী রাখবে, না সামাজিক পারিবারিক পরিধিতে সুস্থ সম্মানজনকভাবে আর একটি বিবাহ করবে? না কি প্রথমা স্ত্রীর নামে আদালতে উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ দাবি করে একটি নারীর আব্রুকে ধূলোয় লুটিয়ে দেবে এবং তাকে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবে। ইসলাম এক্ষেত্রে বিধান দিয়েছে প্রথমা স্ত্রীকে তার মর্যাদায় রেখে আর একটি বিবাহ করার।

চতুর্থতঃ বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিত কারণে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় এমন দৃষ্টান্ত আছে। সম্রাট নেপোলিয়ন রাজনৈতিক প্রয়োজনে অষ্টিয়ার রাজকুমারীকে বিবাহে সম্মত হতে বাধ্য হন। কিন্তু উপায় ? তিনিতো বিবাহিত। তখনও ইউরোপ ভূখণ্ডে পূর্ব পত্নীকে ত্যাগ না করে পরবর্তী বিবাহ নিষিদ্ধ। তখন বাধ্য হয়ে পতিপরায়ণা সতী সাধ্বী প্রথমা স্ত্রী জোসোফিনকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ত্যাগ করে তবেই ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করতে পারেন। প্রয়োজনে একাধিক বিবাহের বিধান থাকলে এতবড় একটা অমানবিক ও নিষ্ঠুর কাজ করতে হতো না।

এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্যই ইসলাম প্রচুর নৈতিক ও সামাজিক শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ন্যায় ও সু-বিচার করার ব্যাপারে সন্দিহান বা অক্ষম হলে ঐ সব সংকটের মুখোমুখি হলেও এক স্ত্রীর বর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে না। সেরকম ক্ষেত্রে এক স্ত্রীই তার জন্য বিধান।

পবিত্র কোরআনে রয়েছে "......**যদি আশংকা কর সুবিচার করতে পারবে না তাহলে একটি মাত্র বিবাহ করবে**......।" (৪ ঃ ৪)

পবিত্র কোরআনের ঘোষণায় এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত একাধিক বিবাহ কোনভাবেই কোরআন অনুমোদন করে না। স্ত্রীদের প্রতি সম আচরণে সক্ষম এরকম একটি যুক্তি দেখিয়ে অনেকেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। অথচ যে আল্লাহ্ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত প্রাণীর উপরে জ্ঞান দান করেছেন, তিনিই সমান আচরণের ক্ষেত্রে মানুষ যে কতদূর সফল হতে পারবেন সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা নেসার ১২৯নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, "**এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না**।" (৪ ঃ ১২৯) ইসলামে একাধিক বিবাহের ঢালাও অনুমতি আছে এই প্রচলিত ধারণা যে কত ভ্রান্ত, এই আয়াতের দ্বারা তা সুস্পষ্ট হচ্ছে।

মেশকাত শরীফের ১৭৯ নং হাদিসে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির দুজন স্ত্রী ছিল কিন্তু সমতা রক্ষা করে চলেনি সে কেয়ামতের দিন অর্দ্ধাঙ্গ অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।"

কোরআনে আল্লাহ্র ঘোষণা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে সমান আচরণে শংকিত হলে একটিমাত্র বিবাহ করবে এবং এই সমান আচরণ যে সম্ভব নয় কোরআনের উক্তির মধ্যে তাও স্পষ্ট হচ্ছে। একটি বিবাহই প্রকৃত অর্থে ইসলামের অভিপ্রেত এটাই এখানে সুস্পষ্ট।

সমাজকে ব্যভিচার মুক্ত করার জন্য, নারীর দেহব্যবসার মত লজ্জাজনক পেশা নির্মূল করার জন্য ইসলামের এই বিধান খুবই কার্যকরী। তার মর্মবাণীকে গ্রহণ না করে একে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কষাঘাত করে যাওয়া হয়েছে

সবসময়। পাশ্চাত্ত্যসমাজে কারণে অকারণে প্রতিদিন হাজার হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটছে অন্য স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ পেতে, তা কি সুস্থ সভ্যতার পরিচায়ক! কিংবা মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য সব ধর্মের মানুষ নানা-কারণে উপপত্নী রাখছেন, নিষিদ্ধ পল্লীতে গমন করছেন, কি নারীকে খুব মর্যাদার আসনে বসিয়ে? ভারতীয় আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার জন্য স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পেতে প্রতিদিনই পুড়িয়ে মারা হচ্ছে সম্ভাবনাময় স্ত্রীদের—এও কি নারী সম্মান, নারী প্রগতি ও নারীর অধিকার রক্ষায় সহায়ক। প্রথমতঃ গৃহে একটি নারীর মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করছেন দ্বিতীয়তঃ আর একটি নারীকে অসামাজিক ভাবে ভোগ করে সমস্ত নারীজাতির সম্মানকে পদদলিত করছেন। ঐ নারীকে যদি সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে বিবাহ করে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে তাকে ভোগ করতেন তবেই হতো সভ্য মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। আমাদের দেশে মুসলমান ছাড়াও অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অহরহই দেখা যাচ্ছে অসংখ্য দ্বিতীয় বিবাহের ঘটনা। প্রথমা স্ত্রী ও সন্তানগনকে অবহেলা করে সেইসব পুরুষগণ দ্বিতীয় স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে গোপনে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের মৃত্যুর পর দুই তরফের সন্তানদের কে প্রকৃত সন্তান বা উত্তরাধিকারী তার দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ন্যক্কারজনক ও করুণ ঘটনা ঘটে বহুক্ষেত্রেই আমরা তার প্রত্যক্ষদর্শী। আমরা এই ব্যাপক, জটিল ও লজ্জাজনক এক সামাজিক সমস্যার চোরাগলিতে অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি তবু স্বীকার করব না ইসলামী বিধানের উদারতাকে, তার ব্যাপকতাকে। এর উপরে আমাদের দেশে জ্বলন্ত ভয়াবহ সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছে বধূ হত্যা। সেও তো এরকম কোন কারণেরই পরোক্ষ পরিণতি। (প্রকৃষ্ট তদন্ত হলে দেখা যেত ভারতীয় আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার জন্য স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পেতে প্রতিদিনই পুড়িয়ে মারা হচ্ছে সম্ভাবনাময় কত নারীকে।) এরকম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ থাকলে বধূ হত্যা কিংবা নির্যাতনে দগ্ধা বধূর আত্মহত্যা ঘটতে পারত না। ইউরোপ আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদ অনেক সহজ। সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেই তবে দ্বিতীয় বিবাহ করা যায়। ফলে ঐসব দেশে আবার যথেচ্ছভাবে এক স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ এক সামাজিক ও আইন স্বীকৃত ব্যভিচার ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তার ফলে

সমাজে জন্ম নিচ্ছে পিতৃমাতৃস্নেহ বঞ্চিত এক নূতন প্রজন্ম। বিকৃত মানসিকতার শিকার, আশ্রয়হীন স্নেহবঞ্চিত এই শিশু কিশোর কিশোরী আজ পাশ্চাত্ত্য বিশ্বের এক ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা।

উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে সুনিশ্চিতভাবে যে কোন বিবেকবান মানুষ একমত হবেন যে, সমাজে শর্তসাপেক্ষ এরকম একটি পথ, মানুষের সামনে উন্মুক্ত থাকাই সমাজের জন্য কল্যাণময়। এ যুগের বহু ইউরোপীয় ও পশ্চিমী বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যাঁরা একাধিক বিবাহ প্রথা রুদ্ধ করার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে একাধিক বিবাহ প্রথার নিঃশর্ত অনুমোদনকে আইনানুগ করার জন্য সোচ্চার দাবি উঠেছিল —জীবনে নৈতিকতা সৃষ্টির জন্য নয় বরং সমাজের দুর্বিসহ দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য। (বুদ্ধিজীবীগণ নানা যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, ব্যভিচার, সমকামিতা, দেহব্যবসা সর্বোপরি বিবাহিত জীবনে অন্যত্র যৌন অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কলুষ প্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে একাধিক বিবাহকেই আইন সম্মত করা প্রয়োজন। ডঃ ওয়েষ্টমার্ক তাঁর **'দ্যা ফিউচার অব ম্যারেজ ইন ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন'** গ্রন্থে বিস্তারিত ও বহুমুখী আলোচনায় সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত থাকার মঙ্গলময়তা ও প্রচলিত না থাকার অমঙ্গলময়তার বিভীষিকা প্রমাণ করেছেন। Kinsey Report-এ খুব সংক্ষেপে গোটা সমাজের চিত্রটা সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে, "In faithlessness and infidelity American men and women have beaten all the nations of the world." অর্থাৎ বিশ্বাসহীনতা ও দাম্পত্য বিশ্বাস ঘাতকতায় আমেরিকার নারী পুরুষ বিশ্বের সকল জাতিকেই হারিয়ে দিয়েছে।)

॥ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর একাধিক বিবাহ ॥

"ইন্নাহু লাআল্লা খোলেকাল আযীম" অর্থাৎ
"নিশ্চয়ই তিনি সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী"

ইসলামে শর্তসাপেক্ষে চারটির অধিক বিবাহের বিধান না থাকা সত্ত্বেও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর চারটির অধিক স্ত্রী বর্তমান থাকার তাৎপর্য কি ? ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংকীর্ণতাবাদীগণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য কারণগুলি অনুসন্ধান না করেই হযরত (সাঃ)-এর জীবনের এই ঘটনাকে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা কিছু ভিত্তিহীন ঐতিহাসিক মন্তব্য ও কল্প-কাহিনীর আশ্রয়ে এক অপাপাবিদ্ধ, নির্মল, সর্বশ্রেষ্ঠ মানবচরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করেছেন। এইসব ছিদ্রান্বেষণকারীদের সঙ্গে আমরাও একমত যে (১) বিশ্বনবী বহুপত্নীক ছিলেন (২) তাঁর এগারোজন সহধর্মিণী ছিলেন (৩) মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয় খোয়ায়লেদের বিধবা কন্যা খাদিজাতুল কোবরাকে পঁচিশ বছর বয়সে পত্নীত্বে বরণ করেন। (৪) মহানবীর ইহজীবন ত্যাগের পর তাঁর নয়জন পত্নী জীবিত ছিলেন।

একটি বিষয়ে ঐ সকল সমালোচকগণ একমত যে তাঁর প্রথমা পত্নী খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। যদিও এই সময় সমগ্র আরবে অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ সমাজ-স্বীকৃত প্রথা ছিল। এরপরও তাঁরা এরকম মন্তব্য করেন যে কাম প্রবৃত্ত হয়েই হযরত মোহাম্মাদ সাঃ অতগুলি বিবাহ করেছিলেন। বিশ্বের সকল মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীগণই কামুকদের কিছু স্বভাববৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করেছেন। যেমন কেউ কামুক হলে তার চরিত্রে থাকবে মিথ্যাচারিতা, ভোগবিলাসিতা, পানাসক্তি, ধর্মবিমুখতা, ছলচাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা ও চরিত্রহীনতা—এসবই একজন লম্পট ও কামুকের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সারা বিশ্বের কোন সমালোচকই প্রমাণ করতে পারেননি যে বিশ্বনবীর চরিত্রে এর একটি দোষও ছিল।

প্রথমেই হযরতের বিবাহিত হওয়ার বয়স, স্ত্রীদের বয়স ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া যাক। পরপর হযরতের বিবাহ ও বিবাহিত স্ত্রীদের পরিচয় নিম্নরূপ :

১. **হযরতের প্রথমা পত্নী বিবি খাদিজা।** খাদিজা যখন ৪০ বছর বয়সের বিধবা হযরত তখন ২৫ বছরের অকৃতদার যুবক। এটি খাদিজার তৃতীয় বিবাহ। প্রথম বিবাহ হয় আবু হালার সঙ্গে। তাঁর ঔরস হেন্দ ও হালা নামক দুই পুত্রলাভ করেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বিবাহ করেন আযেজের পুত্র আতিককে। এঁর ঔরসে তাঁর গর্ভে হেন্দা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। ওঁর মৃত্যুর পর তিনি হযরতকে বিবাহ করেন। হযরতের পঞ্চাশ বছর বয়সে খাদিজার মৃত্যু হয়। এই সময় পর্যন্ত হযরতের কোন দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল না।

২. **দ্বিতীয় পত্নী সওদা।** ইনি ছিলেন **বিধবা**। বিবাহের সময় এঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর এবং হযরতের ৫০ বছর। বিবি সওদা স্বামী ও পুত্র আব্দুর রহমান সহ ইসলাম গ্রহণ করার পর চরম উৎপীড়নের জ্বালায় আবিসিনিয়া চলে যান। সেখান থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী সাকরানের মৃত্যু হলে বিবি সওদা অত্যন্ত বিপন্না ও নিরাশ্রয়া হয়ে পড়েন। ইসলামের শত্রুগণ সেই সুযোগে তাঁর ও তাঁর সন্তান সন্ততিদের উপরে দারুণ অত্যাচার শুরু করে। এই উৎপীড়ন ও অত্যাচার থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য ও তাঁর সন্তান সন্ততিদের ভরণপোষণের জন্য খাদিজার মৃত্যুর পর হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত মোহাম্মাদ সাঃ তাঁকে বিবাহ করেন। হযরতের মৃত্যুর পর ২৩ হিজরীতে বিবি সওদার মৃত্যু হয়।

৩. **হযরত আয়েশা ছিলেন তাঁর একমাত্র কুমারী স্ত্রী।** বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭ বছর এবং হযরতের ৬০ বছর। হযরতের (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হযরত আবুবকরের একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ উপরোধে তাঁর কন্যা হযরত আয়েশাকে নবী সাঃ বিবাহ করতে বাধ্য হন। হযরত মোহাম্মাদ সাঃ ইহজীবন পরিত্যাগের দীর্ঘকাল পরে ৫৭ হিজরীতে হযরত আয়েশা মৃত্যুবরণ করেন। বিবাহের পর তিন বছর হযরত আয়েশা পিত্রালয়েই বসবাস করেন। বয়প্রাপ্তা হওয়ার পর তাঁকে হযরতের সঙ্গে বসবাসের জন্য তাঁর মদিনার বাড়ীতে আনা হয়।

৪. **বিবি জয়নাব।** ইনি ছিলেন বিধবা। বিবাহের সময় এঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। বিবি জয়নাবের প্রথম বিবাহ হয় জাহাসের পুত্র ওবায়তুল্লাহ আসাদির সঙ্গে। বদর যুদ্ধে ইনি প্রাণ হারান। তখন বিবি জয়নাব

অসহায় হয়ে পড়েন কিন্তু তাঁর অধিকাংশ অমুসলমান আত্মীয় তাঁর তত্ত্বাবধান না করায় হযরত তাঁকে বিয়ে করে আশ্রয় দেন। ইনি বিবাহের মাত্র আট-মাস পরে ৩০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি এত অতিথিপরায়ণ ছিলেন যে 'দরিদ্রের মাতা' এই আখ্যা পান।

৫. ওমর কন্যা বিবি হাফসা—বিধবা। ইনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের কন্যা। এঁর প্রথম বিবাহ হয় হোজায়ফার পুত্র খলীলের সঙ্গে। হযরতের সঙ্গে এঁরা মদিনায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধের পরপরই এঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। এঁর বয়স তখন ২১ বছর। এঁকে যখন বিবাহ করেন তখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বছর ৫৬ বয়স। হযরতের মৃত্যুর ৪৫ দিন পর ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

৬. **বিবি উম্মে সালমা ঃ** উম্মে সালমার আসল নাম হেন্দা। ডাক নাম সালমা। বিখ্যাত যোদ্ধা হোজিফা ওরফে আবু উম্মিয়া এঁর পিতা। আবুল আসাদ মাখজামীর পুত্র আবু সালমার সঙ্গে এঁর প্রথম বিবাহ হয়। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ইনিও মক্কা ত্যাগ করে স্বামীসহ আবিসিনিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে এঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। বদরের যুদ্ধের আগেই এঁরা সপরিবারে মদিনা চলে আসেন। চতুর্থ হিজরীতে ওহদ যুদ্ধে স্বামী আবু সালমার মৃত্যু হয়। তখন আত্মীয়বর্জিত অবস্থায় পুত্রকন্যা নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েন ও হযরতের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। 'মাদারেজুন নবুরত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে যে "উম্মেসালমা ও তদীয় পিতৃহীন সন্তান গুলির ভরণপোষণের জন্য হযরত তাঁকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। এই সময় উম্মে সালমার বয়স ২৩ ও হযরতের বয়স ৫৭ বছর ছিল। হযরতের মৃত্যুর পর ৬২ হিজরীতে ৮০ বছর বয়সে উম্মে সালেমা ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭. **বিবি জয়নাব (দ্বিতীয়) ঃ ইনি তালাকপ্রাপ্তা।** জয়নাব হযরতের ফুফাতো (পিসতুতো) ভগ্নী ছিলেন। জায়েদ নামক এক ক্রীতদাসকে হযরত মুক্তি দিয়ে লালন পালন করেন এবং জয়নাবকেও লালনপালন করেন। যখন হযরত এই সম্ভ্রান্তবংশীয়া কন্যাকে নিজ পোষ্যপুত্র জায়েদের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করলেন তখন তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হযরত সাঃ-কেই বিবাহ করতে চাইলেন। হযরত সাঃ এই বিয়েতে রাজী না হওয়ায় পরে

ঐ জায়েদের সঙ্গেই জয়নাবের বিবাহ হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মনের মিল না হওয়ায় জায়েদ তাঁকে ত্বালাক দিতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে হযরতের নিষেধ সত্ত্বেও বিবাহের বছর খানেকের মধ্যেই তালাক হয়ে যায়। এবারও বিবি জয়নাব হযরতকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার জন্য আকুল হন। শেষ পর্যন্ত হযরতের সঙ্গেই বিবাহ হয়। বিবাহকালে জয়নাবের বয়স ৩৫ বছর এবং হযরতের বয়স ৫৮ বছর ছিল। জয়নাবের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

৮. **বিবি জোয়য়ারিয়াহ্‌—বিধবা।** এঁর সঙ্গে বিবাহের সময় হযরত (সাঃ)-এর বয়স ছিল ৫৯ বছর। ইনি বনু মোস্তালিক দলপতি হাতিমের কন্যা ছিলেন। এঁর প্রথম স্বামীর নাম ছিল যোশ-শেকরায়েন। পঞ্চম হিজরীতে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করে এবং বহু বন্দীর সঙ্গে জোয়ায়রিয়াহ্‌ বন্দিনী হন। জোয়ায়-রিয়াহ্‌ নিজে ইসলাম গ্রহণ করে হযরত (সাঃ)-কে বিবাহ করতে চান। এমনকি তাঁর পিতা মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে জোয়ায়-রিয়াহ্‌ হযরত (সাঃ)-এর কাছ থেকে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। এরপর হযরত (সাঃ) জোয়ায়রিয়াহ্‌-র অনুরোধে ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে তাঁকে বিবাহ করে আশ্রয় দিতে বাধ্য হন।

৯. **বিবি উম্মে হাবিবা—বিধবা।** ইনি বিখ্যাত ইসলাম-বিরোধী কোরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা। এঁর প্রথম স্বামীর নাম জাহেশ পুত্রআব্দুল্লাহ। ইনি ইসলাম আবির্ভাবের সময়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর ইসলামবিরোধীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে খ্রীষ্টান দেশ আবিসিনি-য়ায় চলে যান। সেখানে গিয়ে এঁর স্বামী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। অসহায় হাবিবা নিরুপায় হয়ে শাসনকর্তা নাজ্জাশীর সাহায্য চান। নাজ্জাশীই রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে অনুরোধ করেন তার দুর্দশা মোচন করতে। তখন হযরত (সাঃ) নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বিবি উম্মে হাবিবাকে বিবাহ করে আশ্রয় দিতে বাধ্য হন। তখন হিজরী সপ্তম বছর এবং হযরত ৬০ বছরের বৃদ্ধ।

১০. **বিবি মায়মুনাহ্‌—বিধবা।** ইতিপূর্বে এঁর দুবার বিবাহ হয়। ইনি মক্কার বিখ্যাত হারিসের কন্যা। প্রথম স্বামীর নাম ইবনে ওমর (খলিফা

ওমর নন)। ইবনে ওমর একে পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় স্বামী বোরহামের মৃত্যুর পর হযরত (সাঃ) একে আশ্রয় দেন। তখন হযরত (সাঃ)-এর বয়স ৬০ বছর এবং এর বয়স ৪০ মতান্তরে ৫১ বছর।

১১. **বিবি সুফিয়া**। ইনি মদিনার নিকটবর্তী খায়বারের ইহুদী দলপতি হাইবেন আখতারের কন্যা। এঁর প্রথম বিবাহ হয় মোস্কমের সঙ্গে এবং পরিত্যক্তা হন। দ্বিতীয় বিবাহ হয় বনু নাজির দলপতি কানানা বেনেবাবির সঙ্গে। খায়বার যুদ্ধে এর পিতা ও স্বামী নিহত হন। ইনি বন্দিনী হয়ে মদিনায় আসেন। বিবি সুফিয়া অতি উচ্চ বংশের বলে সকল সাহাবিগণ হযরত (সাঃ)-কে অনুরোধ করেন এই মহিলাকে গ্রহণ করতে। হযরত সম্মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে অবশেষে তাঁকে বিবাহ করে আশ্রয় দেন। তখন সপ্তম হিজরী ও হযরতের বয়স ৬০ বছর। ইনি ৫১ হিজরীতে হযরতের (সাঃ) মৃত্যুর ৪০ বছর পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

১২.. **বিবি মরিয়ম ঃ** ৭ম হিজরীতে মিশরের রাষ্ট্রপতি (তখনও মিশর মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি) বিবি মরিয়মকে মুসলিম রাষ্ট্রপতি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উপঢৌকন পাঠান। রাজনৈতিক কারণেই একজন রাষ্ট্রপতির কাছে অন্য রাষ্ট্রপতির উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান সম্ভব হয়নি। অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়াও সম্ভব ছিলনা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে। আবার বিবাহব্যতীত তাঁকে গৃহে স্থান দেওয়াও হযরতের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাই রাজনৈতিক মর্যাদা রক্ষার্থেই তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এঁরই গর্ভে হযরত (সাঃ)-এর পুত্র ইব্রাহিমের জন্ম হয়। কিন্তু হযরতের (সাঃ) পুত্র বেঁচে থাকেন নি। এই সময় হযরতের বয়স ৬০ বছর।

বৃদ্ধ বয়সে এইভাবে নানা কারণে বিভিন্ন মহিলার দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে গ্রহণ করতে হচ্ছিল। যাতে বারে বারে এভাবে অনাথ, আশ্রয় হীনা অসংখ্য স্ত্রীলোক তাঁর কাছে আগমন না করেন বা তাঁর কাছে পাঠান না হয়, সেজন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ৬১ বছর বয়সে আর কোন স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না বলে ঘোষণা করে দেন। অর্থাৎ তিনি নিজের জন্য আর বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিবাহ বিশ্লেষণ করলে যে সহজ চিত্র পাওয়া যায় তা হলো ঃ—

(১) জন্ম থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত **অকৃতদার যুবক**। নিষ্কলঙ্ক নির্মল চরিত্রের অধিকারী। আল-আমিন আখ্যায় আখ্যায়িত।

(২) ২৫ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত— **একমাত্র প্রৌঢ় স্ত্রীর সঙ্গে সংসার জীবনযাপন।** অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্যে সুমহান।

(৩) ৫১ বছর বয়স থেকে ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত— **একজন ৭০ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা স্ত্রী ও আর একজন ৭ বছরের শিশু স্ত্রী।**

(৪) ৫৭ বছর বয়স থেকে ৬০ বছর সময়কালে—**নানা কারণে নানা শ্রেণীর ৯ জন মহিলাকে পত্নীত্বে বরণ ও আশ্রয়দান।**

(৫) ৬০ বছর থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত—**আর কোন বিবাহ নেই।**

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে পরিপূর্ণ যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত এমন এক নারীর সঙ্গে পরম তৃপ্তি ও সম্মানজনকভাবে সংসার নির্বাহ করেছেন যিনি কুমারী নন। যাঁর ইতিপূর্বে দু-দুবার বিবাহ হয়েছে, যিনি কিশোরী নন। যাঁর পূর্ব স্বামীর সন্তান সন্ততিও ছিল। এই সময় তাঁকে বহু কোরায়েশ সুন্দরী লাস্যময়ী কুমারী মহিলার প্রলোভন দেখানো হয়েছে। তাছাড়া সেই সময়ের সমাজে অধিক সংখ্যক বিবাহ স্বীকৃত প্রথা ছিল। হযরত কোন ভাবেই ঐ প্রথার সুযোগ গ্রহণ করেননি।

অতি সহজে অনুমেয় কামুক লম্পটের কাছে তার যৌবনকাল শ্রেষ্ঠ সময়। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা একমাত্র যৌবনেই সম্ভব। অথচ বিশ্বনবী (সাঃ)-কে দেখছি তিনি যখন বলিষ্ঠ পূর্ণ যুবক তখন সত্যপ্রিয়তা, জনসেবা, পরিবার পরিজনের দেখাশোনা আর্তআতুরের মঙ্গল চিন্তায় সর্বত্র সসম্মানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরম বিশ্বাসী (আলআমিন) ভূমিকায়। এমনি করে ৬৩ বছর জীবনের ৫৬ বছর পর্যন্ত কেটে গেছে নিষ্কলঙ্ক হয়ে।

এরপর পূর্ণ বার্দ্ধক্যকালে অর্থাৎ ৫৭ থেকে ৬০ এই তিন বছর—হঠাৎ কামচরিতার্থতা বা স্ত্রী সম্ভোগের জন্য বিবাহ করেছেন তাও আবার বিধবা বার্দ্ধক্য গ্রস্তাদের—এসব অত্যন্ত হাস্যকর ভাবনা ও রটনা। তাছাড়া এই সময় তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কামচরিতার্থতা

লক্ষ্য হলে যে কোন সুন্দরী সম্ভ্রান্ত কুমারী মহিলা গ্রহণে তাঁর সামনে কোন বাধাই ছিল না। সুতরাং যাঁরা তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্য এইসব কল্প কাহিনী উত্থাপন করেন তা যে কত অর্থহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা অত্যন্ত স্বচ্ছ।

সর্বোপরি এই সময়কালেই তাঁকে মুসলমানদের রক্ষায়, ইসলামী নীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অসংখ্য যুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে তিনি শিবিরে শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন।

আমরা দেখি তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ৫০ থেকে ৫৬, এই ছ বছর বিবাহিত হয়েও অবিবাহিতের মত স্ত্রীসম্ভোগ শূন্য জীবন কাটিয়েছেন। এই সময় তাঁর দুজন স্ত্রীর একজন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা, অন্যজন ৭ বছরের বালিকা। 'Letter From Egypt' গ্রন্থের ১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠায় একজন প্রখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক যা লিখেছেন তার অনুবাদ হলো—"মোহাম্মাদ যে সকল নারীকে বিবাহ করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ব্যতীত বাকিদের ৫৪ বছর বয়সের পর বিবাহ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই আশ্রয়হীনা ও বিধবা। তাঁদের তিনজন তাঁরই শিষ্যদের বিধবা পত্নী, যাঁরা মক্কাবাসীদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারে জন্মভূমি ত্যাগ করে স্ত্রী পুত্রসহ আবিসিনিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অপর দুজনের স্বামী ইসলাম রক্ষার্থে মদিনায় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান। যাঁরা অপরের জন্য জীবন দান করেন তাঁদের অসহায় নিঃসহায় বিধবাদের বিবাহ করে আশ্রয় দান ও রক্ষা করা আইন সিদ্ধ এবং এই কাজকে আরববাসীগণ উদারনৈতিক ও দয়ালু কাজবলে বিবেচনাকরেন।"

এ থেকে আমরা সহজে যা পাই তাহল একজন মুসলমানের তথা প্রকৃত বিশ্বাসীর আত্ম চরিতার্থ আত্ম সুখ বা হৃদয়বৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অপ্রয়োজনীয় ও অনভিপ্রেত। রাসূল (সা)ঃ নিজেও চুয়ান্ন বছর বয়স কাল পর্যন্ত এই নীতি পালন করেছেন। সমাজে ও আইনে অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করে এক প্রৌঢ়া স্ত্রীকে নিয়েই সংসার করেছেন। বিশ্ব মুসলমানের সামনে পালনীয় আদর্শ হিসেবে এর চেয়ে বাস্তব বিধান আর কি হতে পারে!

এবার আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিক বিবাহের স্বরূপ লক্ষ্য করব।

।। ভারতীয় উপমহাদেশের একাধিক বিবাহ ।।

বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সমাজে মুসলমানদের একাধিক বিবাহকে বহুবিবাহ আখ্যায়িত করা হয়। বহুবিবাহ প্রথাটাই মূলতঃ প্রাচ্যদেশীয় প্রথা। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ সমাজে অসংখ্য বিবাহ হিন্দু ধর্মের মহৎ কাজ হিসাবে পরিগণিত হতো। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে মহিলা সমাজও মেনে নিয়েছিলেন যে এটা অবাঞ্ছিত নয় বরং ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা যুগ যুগ ধরে টিকে ছিল। যোগ্য ব্রাহ্মণ পাত্রের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় থেকে শততম স্ত্রী হতেও একসময় ভারতীয় হিন্দু মহিলাগণ প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু ইসলামে এই বহুবিবাহ কোনদিন অনুমোদিত ছিলনা। বরং প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের বহুবিবাহ প্রথা ইসলাম কঠোর হস্তে বন্ধ করে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনের এক সংক্ষিপ্ত সময়ে একাধিক বিবাহ তার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটটি আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলাম অনুমোদিত শর্তসাপেক্ষে চার বিবাহের তৎ-কালীন প্রেক্ষাপট ও সর্বকালের যুদ্ধকালীন সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বিধান হিসাবে কতটা যুক্তিযুক্ত তাও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রচার করা হয় ইসলাম বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন করেছে। নারী সমাজের প্রতি ইসলামের এটি নিদারুণ অবিচার। প্রকৃত পক্ষে এটি নেহাৎই অপপ্রচার। আসলে ইসলাম বহু বিবাহের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে যথেচ্ছ বিবাহ বন্ধ করেছ। ইসলামের পূর্বে এমন কোন ধর্ম ও সমাজ ছিল না যে সমাজে বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল না। Encyclopedia Britanica-য় এ তথ্যের সমর্থন মেলে—'As an institution Polygamy exists in all parts of the world (14th edition Vol XIV P949).' ইহুদী ধর্মগ্রন্থে একাধিক বিবাহের সমর্থন মেলে। খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে কোথাও বহু বিবাহ প্রথা অবৈধ বলে ঘোষিত হয়নি যীশু বা ঈসা (আঃ) যথেচ্ছ বিবাহ বিচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য বলেছিলেন, "যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কোন কারণে আপন স্ত্রী পরিত্যাগ করে সে

তাকে ব্যভিচারিণী করে।" (মথি ৫ : ৩২) বাইবেলে বিবাহ ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলা হয়েছে, "সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল হউক ; কেননা ব্যাভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন।" ঈশ্বরের স্বাভাবিক সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহ একান্ত কাম্য নইলে সমাজে ব্যভিচার ও অনাচার বৃদ্ধি পেতে বাধা।

ইসলামের ব্যতিক্রম ধর্মী শর্তসাপেক্ষে চার বিবাহের তাৎপর্য মুসলমান সমাজের ব্যাপক অংশও অনুধাবন করতে পারেন নি। তাঁদের অধিকাংশের ধারণা যে একাধিক বিবাহ তাদের জন্য দেওয়া আল্লাহ্‌র এক অকাট্য অধিকার। (অনেক স্বামী আছেন যাঁরা দ্বিতীয় বিবাহের হুমকিকে স্ত্রীর সামনে সর্বদা ভয়াবহ অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরেন। বহু লোক আছেন যাঁরা চারের বেশী বিবাহও করে থাকেন। নিজেদের সুবিধার জন্য তাঁরা সাধারণ আইনের মত কোরআনের আইনের ক্ষেত্রেও একটা ফাঁক বের করে নেন। অর্থাৎ চারজন বর্তমান স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজনকে তালাক দিয়ে নব-বধূকে ঘরে তোলেন। অর্থাৎ এক জঘন্য কৌশলের মাধ্যমে তাঁরা দেখাতে চান কোরআনের আইন মেনে চলেছেন। এ মন্তব্যে আহত হলেও কিংবা ধর্মীয় সমাজ অসন্তুষ্ট হলেও, এটা বাস্তব সত্য যে বর্তমানে সমাজে কম হলেও এ ঘটনা একেবারে বিরল নয়।)

এক স্ত্রী বর্তমানে আর এক স্ত্রী গ্রহণ যে কোরআন ও সুন্নার বিধানে বিশেষভাবে শর্তসাপেক্ষ, এই গভীর বোধ খুব বেশী মানুষের মধ্যে নেই। উপরন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এমন অনেক পীর ও আলেম (মৌলভী) আছেন যাঁরা এঁর নানা ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের অভিলাষ চরিতার্থ করেন। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা অধিক অধিক বিবাহ করাকে ধর্মীয় কাজ মনে করেন। তাঁরা মনে করেন কোরআন শরীফে যখন চারটি পর্যন্ত বিবাহের উল্লেখ আছে আর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যখন বৃদ্ধ বয়সেও অনেকগুলি বিবাহ করেছেন তখন চারটি বিবাহই আসলে ধর্মীয় কাজ। এঁরা জানেনও না যে কোরআন শরীফে চারটি বিয়ের অনুমতি দিয়েই ঘোষিত হয়েছে, **"যদি তোমরা ভয় কর সমান ও ন্যায় বিচার করতে পারবেনা তাহলে**

একটি মাত্র বিবাহ করবে।" (৪:৩)[১] ঐ একই সূরায় আলাহ্ মানুষকে আরও সতর্ক করে দিয়েছেন, "**...এবং তোমরা যতই ইচ্ছে কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না।"** (৪:১২৯)[২] বিস্ময়কর যে এর পরেও বহু লোককে পাওয়া যাবে, যাঁরা আল্লা-হ্রও এক ধাপ উপরে উঠে বলবেন যে, তাঁরা ন্যায় ও সমান ব্যবহার করবেন বা করেন বা করতে সক্ষম। এসব যদিও হাস্যকর কথা, তবু মুসলমান সমাজের এক অংশে এমন ধর্মীয় মনোভাব বিদ্যমান। এঁরা প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়েন, রোজা রাখেন, মানুষকে ধর্মোপদেশ দেন কিন্তু এক্ষেত্রে নিজস্ব যুক্তিতে এক সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে জীবনযাপন করেন যা প্রকৃতপক্ষে ইসলামবিরোধী কাজ। যে কাজ করার জন্য প্রধান শর্ত ন্যায় ও সমান আচরণ এবং যে সমান আচরণ করা সম্ভবও নয় তা মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ই ঘোষণা করেছেন। এরদ্বারা এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে এটা মোটেই ইসলাম ধর্মের সাধারণ অভিপ্রেত নয়, যে সমাজে সাধারণ ভাবে একাধিক বিবাহ প্রচলিত থাকুক। ১৯৭১ সালের জনগণনায় দেখা যায় ভারতের মোট মুসলমান জনসংখ্যা ৬,১৪,১৮,১৬৯। এর মধ্যে ২, ৯৪ ৫৬, ২১৯ জন মহিলা। এই যেখানে জনসংখ্যার চিত্র সেখানে তো সকলের একটি মাত্র বিবাহই সমস্যা সৃষ্টি করবে।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনীতে এটা প্রমাণিত যে তৎকালীন আরবে মুসলমান সমাজে পুরুষ সংখ্যা কম ও যুদ্ধে নিহত হওয়ার উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলাই একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অথচ ভারতে জনগণনা প্রমাণ করছে মুসলমান সমাজে তেমন অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এই উপমহাদেশে একাধিক বিবাহের মানসিকতা বর্জনীয়ই হওয়া উচিৎ।

ইসলাম ধর্মে একাধিক বিবাহের ব্যাপারটি সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমান মহিলাদের মধ্যেও চরম বিভ্রান্তি রয়েছে। তাঁরাও একাধিক বিবাহের ব্যাপারে ইসলামের মূল সুরটি সম্পর্কে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চরম অজ্ঞ।

১. আল-কোরআন সূরা-নিসা ঃ আয়াত ৩
২. ঐ ঐ ঐ ঐ ১২৯

বঙ্গীয় মুসলমান নারীসমাজ অধিকাংশই অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও হতাশাগ্রস্থ। এদের জীবনযাত্রায় ইসলামী আচরণের ছাপই কম। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও সাধারণ মহিলাগণের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ নয়। ধর্ম অর্থাৎ নামায, রোযা ইত্যাদি হয়ত অনেকেই পালন করেন ও বিষয়টি জানেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম শুধু নামায, রোযা পালন করলেই হয়না—জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামী বিধান সক্রিয়, এই মহাসত্যটিই গোটা বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বিস্মৃত। সেজন্যই পাহাড়প্রমাণ ভ্রান্তি ও দুষ্কর্ম জমা হচ্ছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাঁরা অনেকেই জানেন না যে ফরজ নামাযের মতই সমান গুরুত্ব পূর্ণ হল ইসলামের সামাজিক বিধান সমূহ।

এক শ্রেণীর মহিলা আছেন যাঁরা মনে করেন তুচ্ছ কারণে বা অকারণে পুরুষগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে ফেলে, ফলে প্রথম স্ত্রীর দুঃখ দুর্দশার সীমা থাকেনা। তাঁরা এটিকে ইসলামের পুরুষকে দেওয়া অবাধ অধিকার ধরে নিয়ে মনে করেন চোদ্দশত বছর পূর্বে এ আচরণ যুক্তিপূর্ণ থাকলেও বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ইসলামী জীবন-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ এই মহিলাগণ মনে করেন—'ইসলাম ধর্মে একাধিক বিবাহে পুরুষকে সর্বময় অধিকারী করা হয়েছে।' এঁদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম ধর্মে প্রদত্ত নারীর অধিকার সম্পর্কে খবর রাখেন তাঁরা মনে করেন 'নারীদের অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষরা ধর্ম মানেন না অথচ একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মবোধ জেগে ওঠে এই মনোভাব সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।' সুতরাং অবিলম্বে এটি বন্ধ করে একমাত্র বিবাহকেই সমাজে আদর্শনীয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

অনেক ধনবতী অথচ অশিক্ষিত মহিলা আছেন যাঁরা হাস্যকর মন্তব্য করেন যে মেয়েদের একাধিক স্বামী গ্রহণের অধিকার যখন নেই তখন পুরুষেরও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

মুসলমান মহিলাদের একটা উদারপন্থী অংশ মনে করেন সন্তানহীনতার ক্ষেত্রে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ খুবই প্রয়োজনীয় ও সমর্থনযোগ্য। অবশ্য দ্বিতীয় বিবাহের পুর্বে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কে বন্ধ্যা

সে বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই এ বিধান চিরকালই উন্মুক্ত থাকা উচিত।

(অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাওয়া কন্যাসন্তানের জননী একদল মহিলার অভিমত হল—সমাজে দুষ্কৃতিকারী ও দুশ্চরিত্র লোকেদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচতে এবং প্রকৃত অভিভাবকের আশ্রয় পেতে একাধিক বিবাহের সুযোগও মুসলিম মহিলাদের জন্য ইসলামের আশীর্বাদ।)

বহু মহিলা এরকম মত পোষণ করেন যে কম বয়সে বাবা-মার ইচ্ছায় অশিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে বিবাহের পর উচ্চশিক্ষিত হলে উপযুক্ত শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে, সেখানে যদি বিবাহ অনিবার্য হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে একাধিক বিবাহের সুযোগ খুবই সহায়ক। কারণ প্রথমা স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ বিপন্ন না করেই পুরুষ তাঁর মানসিক সুখ পরিপূর্ণ করতে পারেন। ইসলামের একাধিক বিবাহ প্রথাই এক্ষেত্রে মহিলাদের একমাত্র রক্ষা কবচ।

উচ্চশিক্ষিতা অথচ উদারমনা মুসলমান মহিলাগণের ব্যাপক অংশ মনে করেন প্রথমা স্ত্রীকে বন্ধ্যা, চিররুগ্না, মানসিক ভারসাম্যহীনা ইত্যাদি কারণে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ অমানবিক। এসব কারণে স্ত্রী পরিত্যাগ করার আধুনিক আইন নিষ্ঠুরতার নামান্তর। এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের একাধিক বিবাহের নীতি নারী জীবনের আশীর্বাদ স্বরূপ। স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করলেও স্ত্রীদের পারিবারিক আত্মসম্ভ্রম বজায় থাকে। নারীর নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে।

অন্যদিকে ইসলামী ধ্যানধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অমুসলিম চিন্তাধারা প্রভাবিত একশ্রেণীর মহিলা আছেন যাঁরা সরাসরি একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন এবং মনে করেন পুরুষের একাধিক বিবাহ সর্বক্ষেত্রে নারী মর্যাদার হানিকর। সুতরাং এটি আইনের দ্বারা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত।

একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে যদি যথেচ্ছাচারকে রোধ করা যায়, যথোপযুক্ত প্রয়োজনে যদি এর প্রয়োগ ঘটে তাহলে এর চেয়ে মঙ্গলজনক কোন পথ থাকতে পারে না। যে কারণে দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন হয় সে কারণগুলি

দেখিয়ে আধুনিক আইনে বিবাহবিচ্ছেদ করে, তবে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। এভাবে একটি জীবনকে অনিশ্চিত স্রোতে না ভাসিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ অনেক বেশী কল্যাণকর।

ভারত ইসলামী দেশ নয়। ইসলামী আইন যথার্থ শরীয়ত মতে পালিত হচ্ছে, না যথেচ্ছাচার ঘটছে তা সরকারীভাবে নজরদারীর সুযোগ নেই। কিন্তু দুভাবে সমস্যাটির সমাধান অসম্ভব নয়। প্রত্যেক গ্রামে বা এলাকায় মসজিদ ভিত্তিক একটি শক্তিশালী কমিটি করতে হবে এবং সেই এলাকার একাধিক স্ত্রী গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ সেই কমিটির কাছে দ্বিতীয় বিবাহের কারণ জানাতে বাধ্য থাকবেন। তাঁর দেওয়া কারণগুলি সেই কমিটি তদন্ত করে দ্বিতীয় বিবাহের যৌক্তিকতা বিচার করে অনুমোদন দিলে তবেই সে ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবেন। প্রয়োজনভিত্তিক একাধিক বিবাহের বিধান রুদ্ধ হয়ে গেলে সমাজে অনেক বেশী ক্ষতিকর সমস্যার সংযোজন ঘটবে। এলাকার কমিটি গুলিতে ইসলামী আদর্শ, কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ও বিবেক সম্পন্না নারীদেরও প্রতিনিধি রাখতে হবে। আদালতের কাছে ইসলামের বিধিমত কারণ দেখিয়ে এবং সেখান থেকে অনুমতি পাওয়ার পর যাতে দ্বিতীয় বিবাহ ঘটে তেমন আইন করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানও অযৌক্তিক হবেনা। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার রুখতে একটি 'আরবিট্রেটর কাউন্সিল' গঠন করেছে। একাধিক বিবাহের জন্য এই কাউন্সিলের পূর্ব অনুমোদন বাধ্যতামূলক করেছে। কোন পুরুষই স্ত্রীর বর্তমানে কাউন্সিলের সম্মতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবাহকারীর প্রথমা স্ত্রী চাইলে তালাকও (বিচ্ছেদ) নিতে পারেন। এই আইন না মানলে জরিমানা সহ বা ক্ষেত্র বিশেষে জরিমানা ছাড়াও একবছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। মিশরে দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে প্রথমা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আইন না মানলে ২০০ পাউণ্ড জরিমানা বা ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

একাধিক বিবাহ যে সকল সমাজে আইনতঃ নিষিদ্ধ বাস্তবক্ষেত্রে তা কিন্তু রোধ করা যায়নি। বরং প্রয়োজনেই হোক কিংবা দ্বিতীয় কোন নারীর

সঙ্গে হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্যই হোক দ্বিতীয় বিবাহ না করেও দ্বিতীয় একজন নারীর সঙ্গে সংসার জীবনযাপন করছেন অথবা অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলেছেন। মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ থাকলে এই দ্বিতীয় নারীটিও কিন্তু সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতি পেতে পারত। যে সমাজে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ তাঁরা এই দ্বিতীয় রমণীর জীবনযন্ত্রণাকে অনুভব করেননি, তার প্রতি দায়িত্ব পালন করেননি। ইসলাম কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ শর্তসাপেক্ষে মেনে নিয়ে আর একটি নারীরও সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। কেবল তাই নয় ইসলামের এই উদারতা মুসলমান সমাজকে জারজ সন্তান মুক্ত করেছে। মুসলমান নারীদের এই ব্যাপারটি কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না। চোখকান একটু সজাগ রাখলেই দেখতে পাবেন দ্বিতীয় বিবাহ যেখানে আইনের কড়াকড়িতে রুদ্ধ সেখানেই দ্বিতীয় এক জীবনের ছড়াছড়ি এবং তার ফসল অজস্র বেআইনী সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর তাদের স্বীকৃতি লাভের জন্য আইনের আর এক গোলকধাঁধা। তথাকথিত নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা নারীর অধিকার সংরক্ষণের দাবীর সঙ্গে কেউ কি ভাবছেন এই দ্বিতীয় নারীটির এবং নিষ্পাপ কতগুলি শিশুর সম্মান ও মর্যাদার কথা! বরং এক সংকীর্ণ পথে চিন্তা করা হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। উপযুক্ত কারণে দ্বিতীয় বিবাহ করলে প্রথমা স্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে তাঁরা ভাবছেন কিন্তু ঐ কারণেই বিবাহ বিচ্ছেদ করলে প্রথমা স্ত্রীকে যে অনিশ্চিত জীবনে নির্বাসন দেওয়া হয় সেটা ভাবেন না। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহের অনুমোদন **তিনটি** বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। নিতান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হলে ১. কখনই প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবেনা ২. দ্বিতীয় বিবাহকে গোপন করে কখনই আর একটি নারীকে অসামাজিক গোপন জীবনের অন্ধকারে ঠেলে দিতে হবেনা ৩. সামাজিক স্বীকৃতিহীন জারজ সন্তানে সমাজ ভরে যাবেনা। তিনটি জীবনই সুস্থ সামাজিক পরিচয়ের অধিকারে আপন আপন ভূমিকায় জীবনযাপন করতে পারবে। ১৯৬১ সালের ভারতের জনগণনার রিপোর্ট থেকে আমরা যে তথ্য পাই তাতেই প্রমাণিত হয় একাধিক বিবাহ মুসলমান সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজে অধিকতর। পার্থক্য

মুসলমান সমাজে সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত প্রথা, হিন্দু সমাজে সর্বরকম অসম্মানের মোড়কে ঢাকা। কিন্তু তাতে কি একাধিক বিবাহ রোধ করা গেছে! প্রতিরোধ যে সম্ভব নয় তা ঐ সেনশাস রিপোর্টে ধরাপড়া ভারতের হিন্দু সমাজের চিত্রে স্পষ্ট হয়েছে। অথচ বিষয়টি অসম্মানের। এই অসম্মান এমন কঠিন আইনের খোলসে মোড়া যে একদল নারী ও একদল শিশু কোনদিনই সমাজে স্ব-সম্মানে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনা।

পাশ্চাত্যের নারীসমাজের করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে একাধিক বিবাহ সম্বন্ধে প্রখ্যাত মহিলা চিন্তাবিদ Dr. Mrs. Annie Besant বলেছেন, "I often think that women is more free in Islam than in christianity. Women is more protected by Islam than by the faith which preaches monogamy. In Al-Quran the law about women is more just and liberal." অর্থাৎ আমি প্রায়শঃই চিন্তা করে দেখেছি যে খৃষ্টধর্ম অপেক্ষা ইসলামে মহিলাদের স্বাধীনতা অনেক বেশী। যে বিশ্বাস এক বিবাহপ্রথার প্রচার করে তার চেয়ে নারীগন ইসলাম দ্বারা অনেক বেশী সুরক্ষিত। নারীজাতি সম্পর্কে আল-কোরআনের আইন অনেক বেশী সঠিক ও উদার।[১]

উপসংহারে এটা বলা যায় যে একাধিক বিবাহের সুযোগসমাজে রুদ্ধ না হয়ে নিয়মের কঠোরতায় সুসংবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেটাই নারীদের জন্য অনেক বেশী সম্মানের।

---

১. "The Life and Teaching of Muhammad" by Dr. Mrs Annie Besant Madras June 1932. p. 25

।। উত্তরাধিকার বা অংশ বণ্টন ।।

"লিররেজালে নাস্বিবুম মিম্মা তারাকাল ওয়ালেদানে ওয়াল আক্‌রাবুনা, ওয়া লিননেসায়ে নাস্বিবুম মিম্মা তারাকাল ওয়ালেদানে ওয়াল আক্‌রাবুনা মিম্মা কাল্লা মিনহু আওকাসোরা, নাস্বিবাম মাফরুদ্বা" অর্থাৎ "পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা (সম্পত্তি) অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।" (৪:৭)[১]

পবিত্র কোরআনে যে সকল বিষয় পালন করার জন্য নির্দেশ রয়েছে 'উত্তরাধিকার বা অংশ বণ্টন' তার একটি। নামায, রোযা, হজ, যাকাত পালনের মধ্যে যে সকল ফরজ (আল্লাহ নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় আদেশ) রয়েছে, অংশীদারদেব অংশ দানও অনুরূপ ফরজ। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে যেমন কিছু কিছু ফরজ নমায রয়েছে এটাও ঐ রকম ফরজ বা আল্লাহ্‌র অবশ্য পালনীয় আদেশ। এটি পালন না করা ফরজ নামায না পড়ার সামিল। এজন্য এটিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের পর্যায়-ভুক্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন; "ইন্নাল লাযিনা ইয়াকোলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যোলমান ইন্নামা ইয়াকোলুনা ফী বতুনেহিম নারান ওয়া সাইয়াস্বলাওনা সায়ীরা।" অর্থাৎ "যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা জলন্ত আগুনে জ্বলবে।" (৪:১০)[২]

এর পরই আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য কার কতটা অংশ হবে তা নির্ধারণ করে নির্দেশ দিয়েছেন—

"আল্লাহ্‌ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ

---

১. আলকোরান-সূরা নেসা : আয়াত ৭

২. " - " : " ১০

দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু দুয়ের অধিক (কন্যা) থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর একমাত্র কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং শুধু পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ তার ভাইবোন থাকলে মায়ের জন্য একষষ্ঠাংশ (এ সবই) যা অসিয়ত[১] করে তা দেওয়ার ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে—উপকারে কে তোমার নিকটতম তা তোমরা অবগত নও। এটা আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।" (৪:১১)[২] পবিত্র কোরআনে আরও ঘোষিত হয়েছে—

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তোমার জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ এটা তারা যা অসিয়ত করে তা দেওয়ার পর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের (তোমাদের স্ত্রী) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ; এ সবই তোমরা যা অসিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কোন পুরুষ বা নারী পিতামাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ আর এর অধিক হলে সকলে অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশের;

---

১. অসিয়ত—মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি পুণ্যফল (সওয়াব) লাভ করবে এই প্রত্যাশায় জীবিতাবস্থায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কোথাও কোনভাবে দান করাকে শরীয়তের পরিভাষায় অসিয়ত বলে। অসিয়তের ক্ষেত্রে শরীয়তে বিশেষ কতকগুলি শর্ত আছে। যেমন ১. ওসিয়তের মাধ্যমে কোন অংশীদারকে কোনকিছু দেওয়া না-জায়েজ বা অবৈধ। ২. মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়ত করাও নাজায়েজ। যদি কেউ এক তৃতীয়াংশসম্পত্তির বেশী অসিয়ত করেও তাহলে এক তৃতীয়াংশের বেশীটুকু অসিয়ত হিসাবে গণ্য হবেনা! কিন্তু সব অংশীদার যদি অসিয়ত করা সম্পূর্ণ পরিমাণই দিয়ে দিতে বা মেনে নিতে রাজী হন তাহলে তাতে কোন বাধা নেই।

২. আল কোরআন-সূরা নিসা: আয়াত ১১

এ সব যা অসিয়ত করা হয় তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি এটা কারো জন্য হানিকর না হয়। এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ-সহনশীল।" (৪ঃ১২)[১]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ আরও বলেছেন, "তিলকা হোদুদুল্লাহ্" অর্থাৎ "এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা"[২] পবিত্র কোর-আনে আরও ঘোষিত হয়েছে "এবং কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন করলে, তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন ; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"[৩]

পবিত্র কোরআনের উপরিউক্ত ঘোষণা দ্বারা সম্পত্তি বণ্টনের জন্য ইসলাম ধর্মে এক সুসংহত বিধি প্রবর্তিত হয়েছে। কোন বিশ্বাসী নারী-পুরুষেরই অংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার কোনই অবকাশ নেই। প্রত্যেক অংশীদারকেই নির্দ্ধারিত অংশ অনুযায়ী সম্পদ ও সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং এটাও একটি ফরজ (আল্লাহ্ নির্দেশিত বাধ্যতা-মূলক করণীয়) এবাদাত (আরাধনা)। এ ক্ষেত্রে নারীপুরুষের জন্য পৃথক পৃথক যে অংশ ধার্য আছে সে অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন করে দিতে হবে। কোন রকম পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবেনা বা অংশীদারদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমূহ সম্পত্তি উইল বা দান করে দেওয়া যাবেনা।

সমগ্র বিশ্বে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ নির্দ্ধারণ করে সম্পদের উত্তরাধিকারিণী ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম ব্যতীত বিশ্বের কোন ধর্মে বা রাষ্ট্রে সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিলনা। পৃথিবীর বুকে নারীদের জন্য ইসলাম ধর্মের দেওয়া সম্পত্তির উপর এই অধিকার একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। ইসলাম ধর্ম মুসলমান নারীগণকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ঘোষণা করে একাধারে যেমন নারী মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি আবার তার অর্থনৈতিক নিরা-পত্তাকে করেছে সুনিশ্চিত ও স্থিতিশীল। কোন পিতার জন্যই তার কন্যাকে

---

১. আল কোরআন-সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২
২. ঐ ঐ ঐ ১৩
৩. ঐ ঐ ঐ ১৪

বঞ্চিত করা ইসলামী সংবিধান তথা শরীয়তে বৈধ নয়। এমনকি দান করে দিতে চাইলেও পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনায় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর একটি স্পষ্ট নির্দেশ সব বিতর্কের অবসান ঘটায়। তিনি সাদ বিন ওয়াক্কাসকে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দান করতে অনুমতি দিয়েছিলেনঃ আর বলেছিলেন, "এটাই যথেষ্ট, তোমার অংশীদারদের বঞ্চিত না করে তাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাই বিধেয়। অতিরিক্ত দানের মানসিকতা যেন উত্তরাধিকারীদের জন্য দারিদ্র্য ও পর-নির্ভরতার কারণ না হয়।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে একজন মুসলমানের সমূহ সম্পত্তি দান করে দেওয়া বা কাউকে উইল করে দেওয়া কোনভাবেই অভিপ্রেত হওয়া উচিত নয়। আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক দান, বণ্টন, অসিয়ত, উইল করা সম্পত্তির মালিকের জন্য ইসলাম বৈধ (জায়েজ) করেনি। এই আইনের দ্বারা ইসলামী শরীয়ত নারীদের জন্য এক অভাবনীয়, সুস্থির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করেছে। ইসলামী শরীয়তের বিধানে কোন পিতাই কন্যাকে বঞ্চিত করে পুত্রকে সমূহ সম্পত্তি দানপত্র করে দেওয়ার অধিকারী নন। এটা করলে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র নবীর নির্দেশ অমান্যকারী বলে গণ্য হবেন। পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার কায়েম করে ইসলাম স্বামীর কাছেও নারীকে বিশেষ সম্মানীয় করে তুলেছে।

নারীকে ইসলামের দেওয়া এই বৈপ্লবিক অধিকার পৃথিবীর সভ্য মানুষকে সচকিত করে ও দারুণভাবে আকর্ষণ করে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশ চেষ্টা করেও কয়েক শতাব্দীর বেশী নারী জাতিকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারেনি। যদিও খৃষ্টধর্ম নারীদের সম্পদের অধিকারী ঘোষণা করেনি তবুও একে একে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলির আইনসভা নারীকে এই অধিকার দেওয়ার আইন প্রণয়ণ ও অনুমোদন করতে বাধ্য হয়।

ভারতেও ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় ধর্মে পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের ঘোষণা না থাকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতীয় মহিলা-

---

১. আল-হাদিস

গণ দারুণ বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। অবশেষে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে আইন পাশ করে ভারতীয় হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মহিলাদের জন্য কেবলমাত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার ঘোষণা করেন। যদিও এটি কোন ধর্মীয় আইন নয় তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসমাজ ভারতীয় আইনকে হিন্দুদের ধর্মীয় আইনের দৃষ্টিতেই গ্রহণ করে থাকেন। তাই হিন্দুধর্মে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার না থাকলেও বর্তমানে ভারতীয় আইন দ্বারা হিন্দু মহিলাগণ শুধুমাত্র পূর্বপুরুষ হতে প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অংশ পাওয়ার সম্মান অর্জন করেছেন। এখনও ভারতীয় নারী সমাজ পিতার অর্জিত সম্পদের কোন অংশ পাননা যা মুসলিম মহিলাদের জন্য ১৪০০ বছর আগে থেকে স্বীকৃত হয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব জনমত যে অধিকার দানের দ্বারা নারী জাতির সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবছেন ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন চৌদ্দ শত বছর আগেই ইসলাম ধর্ম নারীদের সেই অধিকারকে আল্লাহ্‌র এবাদাতের (ঈশ্বরের আরাধনা) মর্যাদা দান করেছে। আজও এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি যে ইসলামের আগে পৃথিবীতে কোন ধর্ম বা রাষ্ট্র নারী-জাতিকে এই বিরল অধিকার দান করে সমাজে ও পরিবারে তার আসনকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানেই ইসলামের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও বৈপ্লবিক চরিত্রের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। পবিত্র কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে নারীজাতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা দান করে তাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলামের বিধানে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের বর্তমানে কন্যা পুত্রের অর্ধেক অংশের অধিকারিণী। অর্থাৎ দুজন কন্যার অংশ সমান একজন পুত্রের অংশ। বিশ্বমানবের জন্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র বিধানে দুজন নারীর অংশ একজন পুরুষের অংশের সমান ঘোষিত হয়েছে। ইসলামের এই ঘোষণাকে অনেকেই চরম অজ্ঞতার জন্য বৈষম্যমূলক মনে করেন। তাঁদের ধারণায় ১৪০০ বছর পরে হলেও বহুদেশ নারীকে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অধিকার দান করে নারীপুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। যাঁরা একরকম ভাবেন তাঁদেরকে ইসলামে প্রদত্ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকারগুলি

সম্পর্কে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। ইসলামী বিধানে নারী কেবলমাত্র পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দ্বারা অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে না, সেইসঙ্গে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী নারীকে আরও কয়েকটি বিশেষ পন্থায় অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। নারীর জন্য সুরক্ষিত ঐ সকল অর্থনৈতিক অধিকারকে সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থাই পৃথিবীতে একমাত্র ব্যবস্থা যা নারীকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে এবং নারীর মর্যাদার সর্ববিধ সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেছে।

ইসলাম ধর্মের বিধানে নারীর তিনটি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার পৃথকভাবে সংরক্ষিত এবং এটি নারীপুরুষ উভয়ের ধর্মাচরণের অঙ্গ। এগুলি পালন না করা পাপ ও অন্যায়। প্রথমতঃ নারী যতদিন কন্যারূপে পিতৃগৃহে থাকে তখন তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পিতার। পিতার অবর্তমানে ভ্রাতা, মাতা ইত্যাদির। পিতৃগৃহে কন্যা কোন উপার্জন করলে তা সম্পূর্ণভাবে তার ব্যক্তিগত সম্পদ। তাতে পিতা বা পিতৃপরিবারের কোন অধিকার নেই। কন্যার বিবাহ সম্পাদন করা পিতা বা অভিভাবকের জন্য ফরজ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ। এটা না পালন করা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করা। ইসলাম ধর্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে এ সম্পর্কে এত কঠোর বিধান রচিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ কন্যা যখন বধূ হিসেবে স্বামী গৃহে যায় সেই কন্যার বধূজীবন বরণের পূর্বাহ্নেই তার জন্য এক বিশেষ অর্থনৈতিক অধিকারের সুরক্ষা করেছে পবিত্র কোরআন। বিবাহের পর কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহারের পূর্বেই চুক্তিমত মাহ্‌র নগদ অর্থে তাকে স্বামীর দেওয়া বাধ্যতামূলক। স্ত্রীর স্বেচ্ছানুমতি ছাড়া এই মাহ্‌র না দেওয়া পর্যন্ত স্বামীর জন্য স্ত্রীকে স্পর্শ করা অবৈধ বা হারাম। বিশ্বে কোন সমাজ বা ধর্মে এরূপ অর্থনৈতিক অধিকার নারীর জন্য আজও স্বীকৃত নেই। স্বামীগৃহে বসবাসের সময় মৃত্যু পর্যন্ত স্ত্রীর কোন সম্পদ, সম্পত্তি, টাকাপয়সা, অলংকারের উপর স্বামীর সামান্যতম অধিকার নেই। উপরন্তু স্ত্রীর ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির সমূহ ব্যয়ভারের দায়িত্ব স্বামীর। অন্যদিকে সংসার জীবনে স্ত্রী যদি কিছু উপার্জন করেন তা সম্পূর্ণভাবে তাঁরই এই

উপার্জনে স্বামী বা সংসারের অন্য কারো কোন অধিকার নেই। পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে ঘোষিত হয়েছে "…পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ।" (৪ : ৩২) তৃতীয়ত : মাতা হিসাবে নারীর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব সন্তানের। ইসলামের ঘোষণা হল : মাতার পদতলে জান্নাত (স্বর্গ)। পৃথিবীতে পুত্রের নিকট মাতার মর্যাদাই সর্বাধিক।

এই অধিকার ঘোষণায় স্পষ্ট হচ্ছে যে পুরুষকে পুত্র হিসাবে কন্যার দ্বিগুণ সম্পদ পাওয়ার পর স্বামী হিসাবে স্ত্রীকে মাহ্‌র দেওয়ার জন্য তা ব্যয় করতে হয়; আর নারী কন্যা হিসাবে অর্ধেক অংশ পেয়ে স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছে মাহ্‌র অর্জন করে। এরপর পুরুষকে পুত্র হিসাবে পরিবার আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী পুত্র কন্যার দায়িত্ব পালনে ঐ সম্পদে অর্জিত অর্থ ব্যয় করতে ধর্মীয়ভাবে বাধ্য থাকতে হয়। কিন্তু নারী কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে বা মাতা হিসাবে তার প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে কিছুমাত্র ব্যয় করতে ধর্মীয়ভাবে বাধ্য নয়। এখানেই ইসলামের আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধানের সঙ্গে আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ নির্মিত নারীদের সম্পত্তির অধিকারের পার্থক্যের নিগূঢ় তথ্য লুকিয়ে রয়েছে। এই হিসাবে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে নারী পুরুষের চেয়ে বেশী সম্পদের অধিকারিণী। ধরা যাক কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পদ থেকে সকল অংশীদারকে নির্ধারিত অংশ দেওয়ায় পুত্রকন্যার নির্ধারিত অংশ অনুপাতে পুত্র পেল ২ এবং কন্যা পেল ১। পুত্র ২ পেয়ে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে মাহ্‌র দেওয়ার জন্য ২ থেকে খরচ করল ধরা যাক $\frac{১}{২}$ এবং কন্যা স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছ থেকে মাহ্‌র হিসাবে পেল $\frac{১}{২}$ অর্থাৎ পুত্রের দাঁড়াল $২ - \frac{১}{২} = ১\frac{১}{২}$ কন্যার $১ + \frac{১}{২} = ১\frac{১}{২}$। এরপর পুত্রের ঐ $১\frac{১}{২}$ থেকে ক্রমাগত ব্যয় হতে থাকবে। এভাবেই ইসলামের বিধানে নারী ও পুরুষের প্রাপ্য সম্পদের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। সুতরাং যাঁরা মনে করেন ইসলাম নারীদের পুরুষের অর্ধেক অংশের অধিকারী করেছে তাঁদের ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত।

আসলে সমস্যা অংশ নির্ধারণে নয়, সমস্যা তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে। বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সমাজে মুসলমান মহিলাগণ ইসলাম প্রদত্ত এই বিরল অধিকার

কতটা ভোগ করছেন, পুরুষগণ নারীগণের এই অধিকার সংরক্ষণে কতটা ও কি ধরনের ভূমিকা পালন করছেন সেটাই বড় প্রশ্ন।

ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরুষ ও নারীর জীবনে সর্ব পর্যায় এবং সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব ব্যাপারে দিক নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের বিধানে পুরুষ ও নারী উভয়ের জীবনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নারী বলে কোথাও অবহেলা করা হয়নি। বরং তাদের জীবনে আগে যত অন্ধকার দিক ছিল সবগুলি দূরীভূত করে এক আলোকময় মহিমা দান করেছে ইসলাম।

আজকের মুসলমান মহিলাদের জীবনে ঘনীভূত অন্ধকার দূরীকরণে ইসলামী বিধানগুলিকেই হাতিয়ার করতে হবে। আর সেই কাজের জন্য সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন ইসলাম ধর্মে নারীগণের জন্য যে সব কল্যাণকর বিধান রয়েছে তার প্রকৃতি কেমন। অর্থাৎ এ পর্যন্ত আলোচিত পর্দা, বিবাহ, মাহ্‌র, সম্পত্তির অংশ, অর্জিত সম্পদ ইত্যাদির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলামের ধর্মীয় দৃষ্টিতে গুরুত্ব কতটা এবং বর্তমানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ এই পালনীয় কর্তব্যকে কতটা মর্যাদা দিচ্ছেন তার উপরেই নির্ভর করছে সব বিধানের প্রকৃত সার্থকতা।

প্রথমতঃ নারীদের জন্য ইসলাম ধর্মের বিধানগুলি ফরজ কাজের অন্তর্গত। সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য পাঁচওয়াক্ত নামাযের মধ্যে ফজরের দুরাকাত, যোহরের চার রাকাত, আসরের চার রাকাত, মাগরেবের তিন রাকাত, এশার চার রাকাত ফরজ, রমযান মাসের ১মাস রোযা ফরজ অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ঠিক একইরকম অবশ্য পালনীয় কাজ হলো বিবাহের পর নববধূর সঙ্গে দৈহিক মিলনের পূর্বেই নগদ অর্থে মাহ্‌র অর্পণ, কন্যা অথবা ভগ্নীকে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ অর্পণ, স্ত্রীর নিজস্ব অর্জিত অর্থে হস্তক্ষেপ না করা। এর মধ্যে মাহ্‌র-এর কিছু অংশ স্ত্রীর স্বেচ্ছানুমোদনে বাকি রাখা গেলেও তা ঋণ এবং অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। এমনকি মৃত্যুতেও এ ঋণ মকুব হয়না, পরিশোধ করতে হয়। না করলে একটি ফরজ কর্তব্য লঙ্ঘন করার অপরাধ ঘটে। পিতৃ সম্পত্তিতে কন্যার অংশের ক্ষেত্রেও একই বিধান। ফরজ নামায ও ফরজ রোজার সঙ্গে এই কাজগুলির বিন্দুমাত্র

পার্থক্য নেই। এই কাজগুলিও ধর্মীয় এবাদাত-এর সমতুল্য এবাদাত। এই এবাদাত পালন না করা আল্লাহ্‌র হুকুম না মানার সামিল।

আমাদের সামনে সমাজের যে চিত্র বর্তমান তা কোরআনের আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও দরিদ্র শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর ধারণাই নেই যে এই কাজগুলি ফরজ নামায বা রোজার সমান গুরুত্বপূর্ণ—অবশ্য পালনীয় এবাদাত। এমনকি গ্রাম অঞ্চলের বেশীর ভাগ মসজিদ পরিচালক ও গ্রাম্য ইসলামিক বিধিবিধানের পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে সামাজিক পরিমণ্ডল রয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত লোকজনেরও এ ধারণা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নেই। যে আলেম তথা মৌলভী গোষ্ঠী গ্রাম অঞ্চলে থাকেন তাঁরাও কাজগুলিকে নামায রোজার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে সমাজকে সচেতন করেন এমন অভিজ্ঞতা খুবই বিরল। বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়েন, নিয়মিত রোযা রাখেন ও কোরআন পাঠ করেন তাঁদের জীবনে কোরআনের এই আদেশ পালিত হচ্ছে না। যাঁরা এসব ফরজ কাজই করেন না তাঁরাই শবেবরাত, শবেকদর, শবেমেঅরাজ, মহরম ইত্যাদিতে সমগ্র রাত্রি ব্যয় করে নফল এবাদাত (অতিরিক্ত পুণ্য সঞ্চয়ের আরাধনা) করেন। শুধু এই নয় গ্রামাঞ্চলে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—সমাজের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব যাঁদের উপর থাকে বা যাঁরা এই দায়িত্ব পালন করেন তাঁরাও মাহ্‌র দেওয়া, পৈতৃক সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ দেওয়া, স্ত্রীর অর্জিত সম্পদ হস্তগত না করা ইত্যাদি বিধানগুলিকে ফরজ নামায রোজার সমান বলে গণ্য করেন না। ভারতীয় উপমহাদেশে এ চিত্র সর্বত্র। মুসলমান মহিলাদের জন্য ইসলাম প্রদত্ত সর্বোত্তম অধিকার থাকা সত্ত্বেও সামাজিক অজ্ঞতা ও অসচেতনতার জন্য নারীরা হয়েছে বঞ্চনার শিকার।

এতো গেল অশিক্ষিত অজ্ঞ জনসমাজের চিত্র। এরপর আসা যাক প্রগতিশীল শিক্ষিত অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মৌলবাদীদের প্রসঙ্গে। মুসলমান শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের এ সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা সমগ্র জাতির পরম লজ্জাই বহন করে। কিছু কিছু মুসলমান নামে পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের ধ্যানধারণার বহিঃপ্রকাশ হাসির খোরাক যোগানোর জন্য যথেষ্ট। এক

শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলিম মহিলার বক্তব্য ততোধিক প্রলাপ সমতুল্য। এঁদের কেউই ইসলাম প্রদত্ত সূক্ষ্ম ভারসাম্যমূলক নারী-অধিকার গুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল নন। কোনদিন খুঁজেও দেখেননি ইসলাম কোন হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল নারীদের হাতে। কোনদিন এ চেষ্টাও করেননি যুগে যুগে নারী সমাজকে সে অধিকারগুলি থেকে যারা বঞ্চিত করেছে, সমাজের সেই কায়েমী স্বার্থভোগীদের হাত থেকে অধিকারগুলি আদায় করে বঞ্চিত নারীসমাজকে আবার কিভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। তাঁরা অতি সহজ সমীকরণ করে মনে করেন হিন্দু নারী অনেক বেশী সুযোগ পেয়েছে, মুসলিম নারী পায়নি। অজ্ঞতা আর কাকে বলে! এঁরা হয়ত বুঝতেই পারছেন না অধিকার কাকে বলে। হ্যাঁ উন্মুক্ত নির্লজ্জ বেশবাসে চলাফেরার অধিকার ইসলাম দেয়নি—ইসলাম, দেয়নি যৌনকামনায় তাড়িত হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার অধিকার। কিন্তু অর্থনৈতিক অধিকার, যা পুরুষ নারী নির্বিশেষে সব মানুষের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রধান অস্ত্র, সে সম্পর্কে বর্তমান যুগের নারীমুক্তি আন্দোলনের হোতারা যা বলেন ও ভাবেন, তার চেয়ে অনেক বেশী অধিকার ১৪০০ বছর আগেই ইসলাম মেয়েদের দিয়ে দিয়েছে। ইসলামের দেওয়া অধিকারের মত অধিকার পাওয়াতো দূরের কথা সভ্য দুনিয়ায় যতটা অধিকার দাবি করাই এখনও সম্ভব হয়নি, মেয়েদের তার চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদা ও অধিকার ইসলামের স্বীকৃত বিধান অর্থাৎ আইন।

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীগণ চারপাশের সমাজজীবনে দেখা আচারআচরণকেই মনে করেন ইসলাম ধর্মের বিধান। এই বিভ্রান্তির জাল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা তাঁরা কোনদিন করেননা। বরং এই বিভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে ইসলাম ধর্মের বিরোধিতাকে নিজের প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। আর তাঁদের প্রভাবে সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও বিভ্রান্তি বেড়ে যায়। এই শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি উপাসকগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইসলাম ধর্মের কোন নিয়মকানুনের সঙ্গেই পরিচিত নন, তাই জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগও করেননা—অনেকেরই ইসলামের অবশ্য পালনীয় (ফরজ) কর্তব্যের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র মুসলমান পরিবারে জন্মে অধিকারে তাঁরা নিজেদের মুসলমান বলেন এবং ঈদের

নামায (যা ফরজও নয়) তাতে যোগ দেন। আর এক শ্রেণী আছেন যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীই নন এবং কিছু জানেনও না। কেবলমাত্র পিতৃদত্ত নামের মধ্যেই তাঁদের মুসলমানত্ব নিহিত। প্রসঙ্গতঃ বলি এভাবে মুসলমান হওয়ার যে প্রথা তাও একটা গভীর ভ্রান্তি। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। আল্লাহ্, রাসূল (সাঃ), আল্লাহ্র বাণী কোরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর বাণী হাদিস নির্দেশিত জীবনচর্চায়, যে আস্থাবান সেই মুসলমান। প্রকৃত মুসলমান হতে গেলে মুসলমান পিতামাতার সন্তান হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তেমনি আবার অনেক মুসলমান পিতামাতার সন্তান যে মুসলমান হবেনই তেমন কোন মানে নেই। ইসলামের আদর্শে যে বিশ্বাসী আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর ওপরে যে ঈমান এনেছে সেই মুসলমান। সংঘাতের শুরু এখান থেকেই। কেবলমাত্র নিজেদের মুসলমান নামের সুযোগটুকু নিয়ে, ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল না হয়েই, নিজেদের সাধারণ যুক্তি দিয়ে ফতোয়া জারী করে থাকেন। যাঁরা যে আদর্শ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা রাখেন না তার সমালোচনা করেন কিভাবে! এটি বিশ্বস্বীকৃত যে যাঁরা যে আদর্শে বিশ্বাসী—যে আদর্শ মেনে চলেন ও পালন করেন কেবলমাত্র তাঁদের বক্তব্যকেই গ্রাহ্য মনে করা হয়। বিশেষ আদর্শের বিরোধী কারও বক্তব্যকে, সেই আদর্শবাদীরা গ্রহণ করেছেন এমন নজির বিশ্বইতিহাসে এখনও নেই। বরং বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সে আদর্শ সম্পর্কে সমালোচনামূলক মনোভাব প্রকাশ করলে তাকে বহিষ্কার করা হয়। ইসলামও একটি আদর্শ। সুতরাং এক্ষেত্রেও ঐসব ইসলামী আদর্শ বহির্ভূত ব্যক্তিদের বক্তব্য সঙ্গত কারণেই অগ্রাহ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে নিজ নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জনসমাজ একদল বামপন্থী ও অপরদল দক্ষিণপন্থী নামে চিহ্নিত। বামপন্থায় আস্থাশীল নন এমন কারও কোন বক্তব্যকেই যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করাকে বামপন্থীগণ অগ্রাহ্য করেন। দক্ষিণপন্থীরাও একইভাবে ভাবেন। তবে এঁরা কেউই মৌলবাদী বা ও প্রগতিশীল বিশেষণে ভূষিত হননি। কিন্তু ইসলামী আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা ইসলামবিরোধীদের যুক্তিগুলো অগ্রাহ্য করলেই মৌলবাদী, মোল্লাতান্ত্রিক ইত্যাদি আখ্যায়

ভূষিত হন। এটাও আসলে একটি মানসিক সংকীর্ণতা। এইসব দ্বন্দ্ব ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঞ্চনাকারীকে আরও সুযোগ করে দিচ্ছে। ইসলাম ঘোষিত ধর্মীয় বাঁধন কঠোর হওয়ার পরিবর্তে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলি হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

যাঁরা ইসলাম ধর্মের বিধানগুলি বুঝতে চান ও বোঝাতে চান তাঁরা মৌলবাদী ও মোল্লাতান্ত্রিক আখ্যার কশাঘাতে জর্জরিত হচ্ছেন। ইসলাম-প্রদত্ত নারীদের এইসব অধিকারগুলি বিশ্লেষণে নানাভাবে তাঁরা বাধাপ্রাপ্ত হন, কোণঠাসা হয়ে যান। যাঁরা তাঁদেরকে বাধা দেন সেই প্রগতিপন্থীরা একটা কথা খুব বলেন যে ভারতীয় মুসলমান সমাজে রামমোহন বিদ্যাসাগর জন্মাননি সেজন্য মুসলমানদের এই করুণ দশা। ঠিক কথা। কিন্তু তাঁরা কি করে বিস্মৃত হন রামমোহন বিদ্যাসাগর কেউই হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেননি। তাঁরা প্রকৃত নিয়মকানুন যা কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজ স্বার্থে চাপা দিয়ে রেখেছিল সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেদিক থেকে ইসলামের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন আদর্শ—যা সমাজে অনেক ক্ষেত্রে আজ অনুপস্থিত, তাকেই প্রতিষ্ঠা করার কথা বললে মৌলবাদী বলে গালাগালি দেওয়া হয়।

এই জায়গা থেকেই আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে, যাতে নারীর ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও স্বার্থগুলি ফরজ নামায-রোজার মতই সমান গুরুত্ব পায় তার জন্য মানুষকে সচেতন করতে হবে। মুসলমান নারীদেরও সমাজের কাছে কোরআন নির্দেশিত অধিকারগুলি আদায়ের দাবি তুলতে হবে। বিবাহকালীন চুক্তি মত দেয় মাহ্‌র স্বামীর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই নগদ অর্থে কিংবা ফিক্সড্ ডিপোজিটরূপে দাবি করতে হবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে ভ্রাতা বা অন্য কোন অংশীদার যাতে বঞ্চিত করতে না পারে তার দাবি করতে হবে। স্ত্রীর অর্জিত সম্পদ যাতে স্বামী হস্তগত না করেন তার দাবি তুলতে হবে। পিতৃগৃহ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ও নিজের অর্জিত সম্পদ যাতে স্বামী আত্মসাৎ না করতে পারেন তার জন্য প্রত্যেকটি নারীকে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে সামজিকভাবে

বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুসলমান নারীসমাজকে ইসলামের পথেই সংঘবদ্ধ হতে হবে।)

শিক্ষিত মুসলিম মেয়েদের ইসলামকে জানা ও পড়াশোনার মাধ্যমে একটি ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ করতে হবে যে, ভারতীয় সংবিধান কিংবা হিন্দু কোডের মাধ্যমে মেয়েদের যে সম্পত্তির অধিকার ও বিবাহের কনট্রাক্ট এখন স্বীকৃত হয়েছে, ইসলাম মুসলমান মেয়েদের জন্য ১৪০০ বছর আগে থেকেই আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপকভাবে তার স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমান যুগের নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এখনও ইসলাম প্রদত্ত ব্যাপক অধিকারের সমান অধিকারের দাবিই ওঠেনি। বর্তমানে শিক্ষিত সজাগ মুসলমান মহিলাগণের উচিত ইসলামী শরীয়ত সংরক্ষণ (মহিলা শাখা) প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলন গড়ে তোলা। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, মূর্খ মুসলমান সমাজের সামনে ইসলামের দেওয়া নারীর অধিকারগুলিকে তুলে ধরা এবং এ ব্যাপারে অসহায় নারীদের সহায়তা করে তাদের দাবি আদায়ে সাহায্য করা—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশের সামনে ইসলামের দেওয়া নারীর অধিকারগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি বিশ্লেষণ করা— এগুলি হওয়া দরকার এ আন্দোলনের আদর্শ। ইসলাম ধর্মের দেওয়া অধিকারই যে প্রকৃতপক্ষে নারীর সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষার উৎকৃষ্ট হাতিয়ার সে সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সংগঠিত করতে হবে।

ইসলাম ধর্মের নিয়মানুসারে পর্দা মেনে মহিলাদের পক্ষে আলোচনা সভা, কনফারেন্সে যোগ দেওয়ায় কোন বাধা নেই। মুসলিম দেশগুলিতে মেয়েরা মসজিদে নামায পড়তে যান। ফলে সেখানে প্রতিদিনই পাঁচবার আলোচনা, ভাববিনিময় ইত্যাদি সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের দেশে মুসলমান মেয়েরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমাদের দেশে মহিলাদের স্বাভাবিকভাবে সমবেত হওয়ার সুযোগ নেই। এখানে একটা কমিটি করে—কারও বাড়ীতে বসার ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে পারস্পরিক সমস্যা আলোচনা করে তা সমাধানের পথ করতে হবে এবং ইসলামের দেওয়া নিজেদের অধিকার সুরক্ষিত করবার কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করতে হবে। পুরুষগণ যাতে ইসলামী বিধান মেনে মেয়েদের অধিকার রক্ষায় সচেতন হন ও সহযোগিতা করেন তার দাবি তুলতে হবে।

একটি মূল কথা মনে রেখে অগ্রসর হতে হবে যে আইনে স্বীকৃত হওয়া আর বাস্তবে অধিকার পাওয়া এক নয়। এ সত্য শরীয়তী আইন ও দেশের সাধারণ আইন উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। একটি বিষয় সচেতন হতে হবে যেভাবেই হোক না কেন আইনে স্বীকৃত হলেই বাস্তবে পাওয়া হয় না।

পৃথিবীতে ইসলামী আইনই সর্বপ্রথম পিতা, স্বামী বা পুত্রের কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ নারীর এক বলিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন অধিকার স্বীকার করে নেয়। শুধু তাই নয় পাছে উইল বা টেণ্টামেন্টারী সাকসেশন দ্বারা মেয়েদের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয় সে জন্য সম্পত্তির একতৃতীয়াংশের বেশী উইল করার অধিকার ইসলামী আইনে নেই। আইনের নীতি ও ব্যবস্থায় পারিবারিক সম্পত্তি, প্রাইমা জেপিটার (প্রথম পুত্রকে অগ্রাধিকার) পালক বা দত্তক পুত্র গ্রহণ ইত্যাদি দ্বারা মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তির উপর নিরবচ্ছিন্ন অধিকারকে সংকোচনের সুযোগ না দিয়ে একটা বৈপ্লবিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু ভারতীয় অমুসলিম মহিলাগণ এখনও এসকল অধিকার থেকে বঞ্চিত।

মুসলমান সমাজের নারীগণের ইসলামী আইনে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর মানুষ ওয়াকফ আল আওলাদ বা বংশ নিবন্ধ ওয়াকফ করে মেয়েদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। যদিও এই কাজ কোরআন ও সুন্না কখনই প্রশ্রয় দেয়নি ; তবুও তা সমাজে তার সর্বগ্রাসী পক্ষ বিস্তার করেছে। পুরুষসমাজের নানাবিধ চক্রান্ত এবং নারীর অসহায়তা ও অজ্ঞতার ফলে ইসলামের কল্যাণকর বিধানগুলি চরমভাবে অবহেলিত।

এটা সর্বজনবিদিত যে স্ত্রীকে মাহ্‌র বিবাহের রাত্রেই নগদ সম্পূর্ণ বা চাইবামাত্র অর্দ্ধেক দিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং অবশিষ্ট অংশও স্ত্রীর দেওয়া সময়সীমা অনুযায়ী পরিশোধ বাধ্যতামূলক। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষগণ এই মাহ্‌র নগদ অর্থে স্ত্রীকে দেনও না, আর স্ত্রীগণও তাদের এই অধিকারগত ন্যায্য পাওনা স্বামীর কাছে দাবি করেন না। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পদ ও সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। অনেক ক্ষেত্রে ভাইরা কৌশলে বোনেদের অংশ থেকে বঞ্চিত করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বোনেরা দাবি করেন না। সংসার জীবনে ও সাংসারিক কাজকর্মের বাইরে কিছু উপার্জন করলে বা পিতৃসম্পত্তির অংশ হিসাবে কিছু পেলে নানা অজু-

হাতে ও সংসারের প্রয়োজনে পুরুষগণই (স্বামী) তা আত্মসাৎ করে নেন এবং স্ত্রীর নিঃস্ব অবস্থাই চলতে থাকে। অথচ স্ত্রীর এই সম্পদ ও সম্পত্তিতে স্বামীর সামান্যতম অধিকারও নেই। কিন্তু সমাজে নারীপুরুষের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টিই হয়েছে কম।

(তাই আমাদের দেশে দেখা যায় পুরুষ ত্রিবিধ পথে নারীদের অধিকার হরণ করেন। প্রথমতঃ ভ্রাতা হিসাবে পিতৃহীন ভগ্নীর অংশ আত্মসাৎ করেন, দ্বিতীয়তঃ স্বামী হিসাবে স্ত্রীকে দেয় মাহ্‌র নগদ অর্থে দেননা আবার স্ত্রীর প্রাপ্ত পৈতৃক অংশে নিজ অধিকার বিস্তার করেন। তৃতীয়তঃ পিতা হিসাবেও অনেক সময় কন্যাকে বঞ্চিত করেন। এই ভাবে পুরুষ সমাজ মেয়েদেরকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন এবং ইসলামের ফরজ (বাধ্যতামূলক পালনীয়) আইন লঙ্ঘন করছেন।

(বঙ্গীয় সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রাতার আর্থিক ক্ষতি হবে শুধুমাত্র এই আশঙ্কাতেই ভগ্নীকে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ থেকে ছলে বলে কৌশলে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অনেক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারেই পিতার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে দিয়ে নানা কৌশলে সমূহ সম্পত্তি বা বেশীর ভাগ সম্পত্তি ভ্রাতা নিজ অনুকূলে দলিল করিয়ে নিয়ে ভগ্নীদের বঞ্চিত করেন। বহু ভগ্নী আছেন যাঁরা সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ভ্রাতার কাছ থেকে সম্পত্তির অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননা বরং বছরে কয়েকদিন পিত্রালয়ে গিয়ে থাকেন। ভ্রাতার কাছ থেকে কিছু কাপড়চোপড় পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এক্ষেত্রে নারী নিজের অধিকার নিজেই বিসর্জন দেন। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ভ্রাতা পিতৃহীনা বোনকে বছরে কয়েকদিন করে বাড়ীতে এনে আদর আপ্যায়ন করেন এই আশংকায় যে অন্যথায় সে তার পৈতৃক অংশ দাবি করে বসবে। এই প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অনেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ভূমিকাও পালন করেন। অর্থাৎ নিয়মিত নামায রোযা পালন করেন, কোরআন পাঠ করেন। বহু ভ্রাতাকে দেখা যায় ভগ্নীর অসচ্ছল সংসারের দুঃস্থ পুত্রকন্যার সামনেই নিজ ছেলেমেয়েদের জন্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে আসেন। অথচ দুঃস্থ ভগ্নীর সন্তান সন্ততির জন্য তাঁর কোন সহানুভূতিই থাকেনা। এই সব ভাইরা কিন্তু ঐ ভগ্নীকে নানাভাবে পৈতৃক অংশ থেকে বঞ্চিত করেন।

এঁরা একটিবারের জন্য ভেবেও দেখেননা তিনি যা করছেন তা পিতৃ অর্জিত সম্পদ থেকে করছেন, যাতে ঐ অসহায় ভগ্নীর পূর্ণ অধিকার ও অংশ আছে। আমরা জানি সবক্ষেত্রেই ভ্রাতাগণ নিজেদের স্বপক্ষে নানান যুক্তি খাড়া করেন। কিন্তু ভুলে যান আল্লাহ্‌র ঘোষিত আইনকে অমান্য করে যতই মনুষ্য সুলভ যুক্তি খাড়া করুননা কেন—ধর্মীয় আইনে তার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্‌র বিচার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। প্রকৃত অংশীদারের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ ছাড়া কোনভাবেই আল্লাহ্‌র বিচার থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। পৃথিবীর আইনকে অনেক কৌশলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা যায় কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তাই পবিত্র কোরআনে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছেন এ কাজের জন্য "অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন।"

এই হলো বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের প্রকৃত চিত্র। একাধিক বিবাহ ব্যবস্থা রোহিত করার কথা বললে এঁরাই কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনের দোহাই পাড়েন। সমাজের এই চিত্রই অমুসলিমদের ইসলামী শরীয়ত আইন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। কারণ ইসলামী আইনের মঙ্গলময় দিক আমরা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। অন্যদিকে অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমান জনসমাজে ইসলামের প্রকৃত জীবনাচরণ প্রতিফলিত হতে পারেনি।

অথচ ইসলামের বিধান হলো সম্পত্তির কোরআন নির্ধারিত অংশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বণ্টন। এই অংশ বণ্টন সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের ওয়াকিবহাল থাকা বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে শিক্ষালাভ ধর্ম শিক্ষার সমতুল্য। ইমাম বোখারী বলেছেন ফারায়েজ (অংশ বণ্টন) শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দ্বীনি (ধর্মীয়) শিক্ষার সামিল। হযরত ওমরও ঐ মত পোষণ করেছেন।

॥ ত্বালাক তথা বিবাহ বিচ্ছেদ—১ ॥

কোরআন ও সুন্নার আলোকে ত্বালাকের রূপ রেখা ঃ

ত্বালাক আরবী শব্দ। ভারতীয় উপমহাদেশে শব্দটি অতি পরিচিত। **ত্বালাক** শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো যে কোন বন্ধন কেটে দেওয়া বা ছিন্ন করা। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী এই শব্দের অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ করা বা বিবাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে যৌথ বন্ধন নীতি স্বীকৃত ছিল তার অবসান ঘটানো বা স্বামী স্ত্রী পরস্পর বন্ধনমুক্ত হওয়া। মুসলমান সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল, অনৈক্য, মতবিরোধ কিংবা দৈহিক, প্রাকৃতিক বা নৈতিক কারণে স্বামী স্ত্রী একত্রে বসবাস সম্ভব না হলে বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতিতে **ত্বালাক** শব্দ প্রয়োগ করে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা ইসলামী বিধানে অনুমোদিত।

'বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত কঠোর। "পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের জন্য যা কিছু বৈধ ঘোষণা করেছেন সেই সকল ঘোষণার মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় ঘোষণা হলো ত্বালাক।"[১] ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদ সেই ক্ষেত্রেই মেনে নিয়েছে যেখানে বিচ্ছেদ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। যে ব্যক্তি একটার পর একটা বিবাহ করে এবং একটার পর একটা বিবাহবিচ্ছেদ করে ইসলাম সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র শত্রু বলে মনে করে। ইসলাম পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের আচরণ দিয়েই তাকে মুসলমান থাকতে হয়। বংশ পরম্পরায় কেবল একটি নামকরণের মধ্য দিয়ে কেউ মুসলমান হতে পারবে সেরকম বিধান ইসলামে নেই। সুতরাং যাঁরা কোরআনের আদর্শবিরোধী কাজ করেন তাঁরা দেশ, সমাজ ও সর্বোপরি ইসলাম এবং আল্লাহ্‌র শত্রু। কাজেই এই ধরনের মানুষদের কার্যকলাপ ইসলামের পদ্ধতি বা নিয়ম এই ধারণা সমাজ থেকে নির্মূল করা প্রয়োজন।

একটি হাদিসে আছে "হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া

১. আল হাদিস ঃ আবু দাউদ

সাল্লাম এক ব্যক্তির চতুর্থবার বিবাহের সংবাদ জানালেন; তিনি জানতেন পূর্বের তিনজন স্ত্রীকে ঐ ব্যক্তি বিনা দোষেই ত্বালাক দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বললেন, "যে পুরুষ বারবার স্ত্রী বদল করে এবং যে নারী বারবার স্বামী পরিবর্তন করে তাদের উভয়কেই আল্লাহ্ নিজ শত্রু বলে গণ্য করেন ও অভিশাপ দেন।"[১]

আর একটি হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে যে "হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) খবর পেলেন যে আবু আইয়ুব আল আনসারি তাঁর স্ত্রী উম্মে আইয়ুবকে ত্বালাক দিতে বদ্ধ পরিকর হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে আইয়ুবকে ভালভাবে চিনতেন এবং আরও জানতেন যে আবু আইয়ুব কোন সঠিক কারণের ভিত্তিতে ত্বালাক দিচ্ছেন না। তিনি মন্তব্য করলেন, "অবশ্যই উম্মে আইয়ুবের ত্বালাক একটি বিরাট পাপ।"[২] রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন, "জিব্রাঈল (আঃ) নারীগণের সমস্যার প্রতি আমার এত বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার এটাই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে একমাত্র প্রামাণ্য ব্যভিচার ও ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ ব্যতীত অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ত্বালাক দেওয়া যাবেনা।"[৩]

ইমাম জাফর সাদেক উল্লেখ করেছেন যে "হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্র কাছে দাম্পত্য সুখে পূর্ণ গৃহের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই আর ত্বালাক হয়েছে এমন গৃহের চেয়ে অপ্রিয় কিছু নেই।"[৪] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেন, "বিবাহ কর কিন্তু ত্বালাক দিও না, কারণ যখন ত্বালাক ঘটে তখন আল্লাহ্তাআলার আর্শ (সিংহাসন) কম্পিত হয়।"

ত্বালাক সম্পর্কে ইসলাম এত ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও কেউ কেউ মনে করেন স্ত্রী ও তার পিতৃ পরিবারের সমর্থন সাপেক্ষে যে ত্বালাক ঘটে সে ত্বালাক আল্লাহ্র অপ্রিয় নয়। ত্বালাক তখনই ঘৃণ্য হয়ে ওঠে যখন তা একপক্ষ মেনে নেয় না। ব্যাপারটি কিন্তু মোটেও তা নয়। কন্যার অভিভাবকগণের সম্মতি ত্বালাকের ঘৃণ্যতাকে একেবারেই হ্রাস করে না। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের মাধুর্য ও সুদৃঢ় বন্ধন।

---

১. আল হাদিস : বোখারী শরীফ ২. আল হাদিস : বোখারী শরীফ
৩. আল হাদিস : বোখারী শরীফ ৪. আল হাদিস : বোখারী শরীফ

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বর্তমান কালের তথাকথিত mutual Separation ইসলামের দৃষ্টিতে সমান ঘৃণ্য। ইসলাম জীবনকে এরকম খেলাচ্ছলে নেওয়ার বিরোধী। ইসলাম সুদৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নৈতিক সামাজিকতার মধ্য দিয়ে এক অনাবিল জীবনধারার পথ নির্দেশ দিয়েছে।

স্ত্রী ও তার পরিবারের সম্মতিতে হোক, স্বামী স্ত্রী সমঝোতার মধ্য দিয়েই হোক—ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই ত্বালাককে ঘৃণ্য কাজের পর্যায়ে রেখেছে। স্ত্রী কিংবা তাঁর পিতৃপরিবারের সম্মতি **ত্বালাক**-কে কখনই সম্মানে উন্নীত করতে পারে না।

তবুও ইসলামে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ নয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ এত ঘৃণ্য হওয়া সত্ত্বেও তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি। এইখানেই ইসলামী বিধানের সার্বজনীনতা, উদারতা এবং সূক্ষ্ম সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। একতরফা কিংবা খণ্ডিত বিধান দিয়ে নরনারীর জীবন বিষময় করে তোলেনি। সেজন্যেই ইসলাম বিবাহ-বিচ্ছেদকে একমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই মেনে নিয়েছে। এবং কোরআনে এ সম্পর্কে যে ধরনের বিধান দেওয়া হয়েছে তাতে বিবাহ বিচ্ছেদ করা অর্থাৎ ত্বালাক দেওয়া অতি সহজ ব্যাপার নয়। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বর্জন করতে চাইলে তাকে উপযুক্ত কারণ ও প্রমাণ উপস্থিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পবিত্র কোরাআনে। একতরফা ভাবে পুরুষের স্বেচ্ছাসিদ্ধান্তের সুযোগ পবিত্র কোরআনে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছে। কোরআনের বিধান মানলে পুরুষ স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগই পেতে পারে না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজে যা ঘটছে তাকে ইসলামের বিধান মনে করে ইসলামী নীতিগুলিকেই দায়ী করা হচ্ছে। কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সন্ধানের দায়িত্ব পালন করতেও উদ্যোগী নন। অথচ ইসলামের বিধানের জন্যই সব গেল গেল রব তুলছেন। বাস্তবে যাই ঘটুক না কেন কোরআনের বিধানে কোনভাবেই 'ত্বালাক'-কে উৎসাহ ও শ্রেয় কাজ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ত্বালাক-কে প্রতিরোধ করার জন্য

কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সে পদ্ধতি অনুসৃত হলে কখনই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারেনা—একমাত্র অপ্রতিরোধ্য ক্ষেত্র অর্থাৎ যে পর্যায়ে পৌঁছে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে না দিলে বা কঠোর নিয়মে বাঁধা থাকলে মানুষকে জীবনের মূল্যে হলেও, বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করতে হয়, সে অবস্থা ছাড়া।

বিবাহের মধ্য দিয়ে দুটি পৃথক ব্যক্তিসত্তা নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও শর্ত পালনের চুক্তিতে মিলিত হয়। কিন্তু সংসার জীবনে চলার পথে গড়ে ওঠে পরস্পরের প্রতি এক স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি, প্রেম, ভালবাসা, মমতা। দুটি প্রাণের নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় এক ঐকতান। পুরুষ ও নারীর সমঝোতার ভিত্তিতে যত, তার চেয়ে অনেক বেশী একতাবোধ ও সহমর্মিতাবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে একটি সংসার। এরকম একটি সুখের নীড়ই দাম্পত্যজীবনে সবার আকাঙ্ক্ষিত। সেই আকাঙ্ক্ষিত পরিমণ্ডলে যদি বিচ্ছেদের ছায়া ঘনিয়ে আসে তা নিশ্চয়ই হঠাৎই আসে না। বহুদিনের পুঞ্জীভূত অনৈক্য, বিরোধ ও মতপার্থক্যের পরিণতিতেই দেখা দেয় বিস্ফোরণ। এই ফাটলের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ পরস্পর অগ্রসর হয় বিচ্ছেদের দিকে। ইসলাম এই বিচ্ছেদ চায় না ; তার কামনা সুস্থির ও সুদৃঢ় সংসার ও দাম্পত্য জীবন।

বিচ্ছেদের মত চূড়ান্ত পরিণতির দিকে মানুষকে যাতে যেতে না হয় সেজন্য কোরআন মানুষকে কতকগুলি সতর্কতামূলক পথের নির্দেশ দিয়েছে। বিবাহ দুটি হৃদয়ের ব্যক্তিত্বের বন্ধন। কাজেই দুটি ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংঘাত অনৈক্য, বিরোধ আসতেই পারে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সবার উপরে আছে শুভবোধ, বিবেচনা শক্তি, সর্বোপরি সামাজিক নৈতিকতাবোধ। এগুলি তাকে যে কোন চরম ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেয়। মানুষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই কোরআনে বিচ্ছেদের মত চরম জায়গায় পৌঁছানোর আগেই মানুষকে কতকগুলি পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন স্ত্রীর পক্ষ থেকে যদি কোন ত্রুটি ঘটে এবং তার পরিণতিতে যদি বিরোধ ঘনিয়ে আসে এমন ক্ষেত্রে কোরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "......স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর

তাদেরকে সতুপদেশ দাও। তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর*। যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করোনা।...” (৪ঃ৩৪)[১]

উপরোক্ত আয়াত থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হচ্ছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোন কারণেই বিরোধ দেখা দিক না কেন তাদেরকে পারিবারিকভাবে সতুপদেশ দিতে হবে। তাতে কাজ না হলে একই গৃহে পরস্পরের শয্যা পৃথক করতে হবে। পরস্পরের দূরত্ব হয়ত তাদের মধ্যেঅনুতাপের সৃষ্টি করতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। বিরহ জনিত হৃদয় বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করে সতর্ক হতে পারে। এই পর্যায়গুলি অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চিন্তা করার সুযোগ পায়। যে সংসার দুজনের মিলিত শ্রম ও হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, বিচ্ছেদ সেই সংসারের কি ভবিষ্যৎ ডেকে আনতে পারে তাও ভেবে দেখার অবকাশ পায়। সব বিরোধ অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে জয়ী হতে পারে মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবোধ, বিবেক, প্রেমপ্রীতি ও সর্বোপরি মানবিকতা। কারণ বিচ্ছেদ তো কেবল দুটি জীবনেই পূর্ণচ্ছেদ ডেকে আনেনা—অন্ধকার ভবিষ্যতে ঠেলে দেয় সংসার ও সন্তানসন্ততিদের। যে শিশুগুলির জীবন প্রস্ফুটিত হওয়ার সম্ভাবনায় ভরপুর, পরিপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষমান, তাদের সেই জীবনকে ধ্বংস করতে পারেনা বিবেকবোধ সম্পন্ন কোন পিতামাতাই। সেক্ষেত্রে ত্রুটি যাঁরই হোক না কেন নিশ্চয়ই তিনি সমঝোতায় আসবেন—এই নৈতিক মূল্যবোধেরই উদ্বোধন ঘটানোর নির্দেশ কোরআনে দেওয়া হয়েছে।

এই পদ্ধতিতেও যদি পরস্পরের বিরোধ নিষ্পত্তি না হয় তাহলে সামাজিকভাবে একটি মীমাংসার পথ সন্ধান করতে কোরআনে নির্দেশ দেওয়া

---

* কেবলমাত্র স্পষ্ট ও প্রমাণিত ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দৈহিক শাসন প্রযোজ্য। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোন বিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রী ব্যভিচারগ্রস্থ হলে ও তা শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী প্রমাণিত হলে ঐরূপ নারীপুরুষকে প্রস্থরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১. আল কোরআন—সূরা নেসা ঃ আয়াত—৩৪

হয়েছে। কারণ দাম্পত্য বিচ্ছেদ সামাজিক সমস্যাও ডেকে আনে। একটি সংসার এবং সন্তানসন্ততির জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অবিবেচনাপ্রসূত বিবাহবিচ্ছেদের সাংঘাতিক পরিণতি আজ গোটা পাশ্চাত্যসমাজকে জর্জরিত করে তুলেছে। ইসলাম সেই পরিণতিতে পৌছবার আগেই সমাজের হাতে বিবাহবিচ্ছেদকে রোধ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। একক বা পারিবারিক সিদ্ধান্তে যাতে বিবাহবিচ্ছেদ বা ত্বালাকের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা না ঘটে সেজন্য পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, **"ওয়াইন খেফতুম শেক্বাক্বা বায়নেহেমা ফাবআসু হাকামাম মিন আহ্‌লেহি ওয়া হাকামাম মিন আহ্‌লেহা, ইইঁ ইয়োরিদা এস্‌লাহান ইয়োওয়াফ্‌ফেকিল্লাহো বায়না হোমা, ইন্নাল্লাহা কানা আলীমান খাবীরা।"** অর্থাৎ "তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা[১] তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও ওর (স্ত্রী) পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে, তাঁরা উভয়েই মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।" (৪:৩৫)[২]

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরিবারে দুজন ব্যক্তি মধ্যস্থতা করেও যদি তাদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে না পারেন, তাদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির অবসান না হয়—সেই চরম পর্যায়ে এসে ইসলাম বিবাহবিচ্ছেদ অর্থাৎ ত্বালাককেই ঘৃণ্য পন্থা হিসাবে অনুমোদন দিয়েছে।

ইসলামের বিবাহবিচ্ছেদের নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে ইসলামের নবজাগরণ কালেই বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক বিধান ঘোষিত হয়েছিল। যে কোন মুসলমানের ত্বালাক দেওয়া বা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই নিম্নলিখিত কার্যকরী পন্থা গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে।

১. বিরোধ দেখা দিলে প্রথমে সৎ উপদেশ দিতে হবে। ২. অতঃপর পরস্পর শয্যা পৃথক করতে হবে। ৩. অতঃপর সালিশ নিযুক্ত করতে হবে।

---

১. সমাজ সংস্কারক তথা মধ্যস্থতাকারী ইমাম বা সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে বিষয় নিষ্পত্তি করার জন্য গঠিত কাউনসীল, পঞ্চায়েত ইত্যাদি।

২. আল-কোরআন-সূরা নিসা : আয়াত ৩৫।

৪. অতঃপর উভয়পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে।

এই চারটি পদ্ধতি প্রয়োগের পরেও যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন হয় তবে প্রথমে এক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর পরবর্তী ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পূর্বে পবিত্র থাকার সময় এক ত্বালাক দিতে হবে। এতে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবে না। এরপর দ্বিতীয় ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরুর পূর্বে আর এক ত্বালাক দিতে হবে। এই দ্বিতীয় ত্বালাকেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবেনা। এবার গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করে মন স্থির করতে হবে যে স্ত্রীকে গ্রহণ করবেন না বর্জন করবেন। একান্তই বর্জন করতে চাইলে তৃতীয় ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর পবিত্র থাকার সময় তৃতীয় তথা শেষ ত্বালাক দিতে হবে। এবার চূড়ান্ত ত্বালাক তথা বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল। এবার স্ত্রীকে সসম্মানে তাঁর পাওনা মিটিয়ে অভিভাবকের নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে। ইসলামের এই বৈজ্ঞানিক নীতি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ত্বালাক হবে না বরং স্বাভাবিক জীবনযাপন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এইভাবে কোন স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যখন ত্বালাক অবধারিত হয়ে পড়ে তখনও আবেগ, ক্রোধ, অস্থিরতা, স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হয়ে যাতে হঠাৎ ত্বালাক না দেওয়া হয়, সেজন্য বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর নির্দেশ কোরআনে রয়েছে। পবিত্র কোরআনে ত্বালাককে ঘৃণ্য ঘোষণা করে ত্বালাক প্রতিরোধ করার সম্ভাব্য সব কটি পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্রষ্টা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিচক্রকে সচল রাখতে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রী ও পুরুষ জাতি। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবসমাজও নারীপুরুষের যৌথ জীবনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে সভ্যতার স্রোতধারা নারী-পুরুষের যৌথ ভূমিকায়। তাই এই যৌথ জীবনকে সুশৃঙ্খল, রুচিশীল করার জন্য যাবতীয় নির্দেশ ও বিধান আল্লাহ্ সর্বশেষ দূত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজকেও পূর্ণতা দান করেছেন। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ—

"ইয়া আইয়্যোহান নাবীও ; এযাত্বাল্লাক তোমুন নেসায়া ফাত্বাল্লেক,

হুন্না, লে এদ্দাতে হিন্না ওয়া আহস্‌সুল এদ্দাতা, ওয়াত্তাকুল্লাহা রাব্বাকুম, লা তোখরেজুহুন্না মিম বোইউতোহিন্না ওয়ালা ইয়াখরোজনা ইল্লা আঁই ইয়াতীনা বে ফা-হেশাতিম মোবাইয়েনাতিন ; ওয়া তিলকা হোদুদুল্লাহে ; ওয়া মাঁই ইয়াতাআদ্দা হোদুদাল্লাহে ফাক্বাদ জ্বালামা নাফসাহু ; লা তাদরী লাআল্লাল্লাহা ইয়োহদেসো বাআদা যালেকা আমরান।" অর্থাৎ

"হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদিগকে ত্বালাক দিতে ইচ্ছা কর, ওদেরকে ত্বালাক দিও ইদ্দতের[১] (নির্দ্ধারিত সময়ের) প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দতের হিসাব রেখো. এবং তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো ; তোমরা ওদেরকে ওদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং ওরাও (নিজেরা) যেন বের না হয় যদি না ওরা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায় (ব্যভিচারে) ; এগুলি আল্লাহ্‌র বিধান, যে আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জাননা হয়ত আল্লাহ এর পর কোন উপায় করে দেবেন।" (৬৫ : ১)[২]

পবিত্র কোরআনে উপরোক্ত ঘোষণায় লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এখানে প্রথমেই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, নির্দেশক, সংগঠক, সংস্কারক, নেতা হিসাবে অহ্বান করা হয়েছে। বিষয়টিকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই সমগ্রজাতির নীতিনির্দ্ধারক, সংগঠক ও নির্দেশককে সর্বাগ্রে সতর্ক করে বক্তব্য বিষয় ঘোষিত হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে যত কিছু বৈধ ও অনুমোদিত বিধান আছে তার মধ্যে ত্বালাকই সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য বৈধ বিধান। আরও লক্ষণীয় যে ইদ্দতকালের হিসাব সম্পর্কে সতর্ক হতে বলা হয়েছে। ইদ্দতকাল মহিলাদের জন্য অত্যন্ত সংকট ও সতর্কতার কাল। জীবনের একটা অধ্যায়ের পরিবর্তন সূচীত হওয়ার কাল

---

১. ইদ্দত একটি বিশেষ অর্থবহ শব্দ। এর অভিধানিক অর্থ হলো গণনা করা। শরীয়তের অর্থ হলো বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়া বা স্বামীর মৃত্যুর পর নির্দ্দিষ্ট সময় গণনা করা। ত্বালাকের ক্ষেত্রে ৩ মাস (তিন ঋতুকাল) ১০ দিন, মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৪ মাস দশ দিন হলো ইদ্দত কাল।

২. আল-কোরআন : সুরা ত্বালাক : আয়াত ১

শুরু হয় এই সময় থেকে। তাই এই সময়কে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা উচিত। এই সময় একদিকে স্বামীদের যেমন স্ত্রীকে নিজ গৃহ থেকে বের করা অনুচিত। তেমনি আবার স্ত্রীদেরও সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোন অভিমান বা আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজেরা গৃহত্যাগ না করে। ইদ্দতকালের মধ্যে অর্থাৎ মাসিক রজঃস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পরও প্রথম ত্বালাক দেওয়ার পর যদি দৈহিক সম্পর্ক হয়ে যায়, তাহলে ঐ ত্বালাক বাতিল হয়ে যায়। তাই ইদ্দতকালে স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে থাকলে এ পথেও ত্বালাক প্রতিরোধ হতে পারে। যাতে ইদ্দত শুরু হওয়ার সময় নিজেরা পুনর্বিবেচনা করে ত্বালাকের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সুযোগ পায় সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ত্বালাক শুরু হলে ইদ্দতকালে নিজেদের সংশোধন করে পুনরায় তারা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। ইদ্দতকালে পুনর্মিলন হতে পারার সবরকম পন্থাকেই স্বাগত জানানো হয়। প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের শুরুতেই উভয় পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে আলোচনা বৈঠক করে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারায় আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ত্বালাকের সাধারণ নিয়মপদ্ধতি। আল্লাহ্ বলেছেন, "ত্বালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে···যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায় তবে তাতে তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী" (২:২২৮)[১]। পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে ত্বালাকপ্রাপ্তাকে তিন রজঃস্রাব কাল অপেক্ষা করতে বলার মধ্যে বিশেষ কারণ রয়েছে। একমাত্র ব্যভিচার গ্রস্তা ও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস পরিত্যাগকারিনী স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রে ত্বালাক চলাকালীন সময়ে স্বামীর গৃহে অবস্থানের নির্দেশ রয়েছে। এই নির্দেশের মধ্যে রয়েছে সমস্যা সমাধানের এক গভীর সুদূরপ্রসারী চেতনা। বিরোধের এই পর্যায়ে যদি স্ত্রী স্বামীগৃহে অবস্থান করে তাহলে হয়ত বা কোন মুহূর্তে তাদের কাছে নিজেদের ভুল ধরা পড়তে পারে—নিজেরা পুনর্বিবেচনা

১. আল-কোরআন—সুরা বাকারা : আয়াত ২২৮

করে পুনরায় বিবাহবন্ধন টিকিয়ে সুখী সংসারে ফিরে যেতে পারে। ত্বালাক যাতে কোনভাবে তাড়াহুড়ো করে কিংবা ঝোঁকের বশে ঘটে না যায়, তার জন্য আল্লাহ্ মানুষকে এভাবে একাধিকবার চিন্তাভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। যখনই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চরম বিভেদ ও তার পরিণতিতে ত্বালাক সংঘটিত হয়' তখনই যাতে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে না যায় তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা পবিত্র কোরআনের ঘোষিত বিধানে রয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ আরও ঘোষণা করেছেন—"এই ত্বালাক দুবার। অতঃ-পর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে ...(২ঃ২২৯)[১]।

পবিত্র কোরআনে ত্বালাক দেওয়ার জন্য যে পদ্ধতির ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো স্ত্রী যখন ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র[২] হবে তখন থেকে পরবর্তী ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পূর্বের সময় প্রথম ত্বালাক এবং আবার দ্বিতীয় ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর তৃতীয় ঋতু শুরুর পূর্বে দ্বিতীয় ত্বালাক—এই পদ্ধতিতে তিনটি ঋতুতে তিন ত্বালাক দিতে হয়। ইসলামের বিধানে এই দ্বিতীয় ত্বালাকের সময়কালের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মিলন হয়ে গেলে কিংবা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বা পরস্পর পরস্পরকে প্রেমপ্রীতি বশতঃ আকর্ষণ করলে ঐ ত্বালাক বাতিল হয়ে যায়। এই দুই ঋতুকালের মধ্যের দুই ত্বালাককে 'ত্বালাকে রেজয়ী'[৩] বলা হয়। এইভাবে প্রত্যেক ত্বালাকে একমাস কাল পরস্পর পরস্পরের কাছে থেকে ভাবনা চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে —ইসলাম ধর্মের বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে। এইজন্যই ত্বালাকের সময় স্ত্রীকে স্বামীগৃহে রাখার ও থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে পরস্পরের নিকটবর্তী থেকেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি পুনর্মিলন সম্ভব না হয়—চূড়ান্ত বিচ্ছেদ অবধারিত হয়ে ওঠে তখনও যাতে স্বেচ্ছাচারিতা না ঘটে সেজন্য

১. আল-কোরআন—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৯

২. ইসলামী পরিভাষায় এই পবিত্রতার সময়কে '**ত্বোহর**' বলা হয়।

৩. 'ত্বালাকেরেজয়ী' হলো এমন ত্বালাক যা বিবাহবন্ধনকে সমূলে বিনষ্ট করে না। স্ত্রী স্বীকৃত হোক বা না হোক স্বামী ইচ্ছে করলে ইদ্দতকালের মধ্যে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে।

কোরআন স্বামী ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন করে সালিস নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এই দুই ব্যক্তির মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা ঘটলেই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু যদি দেখা যায় মধ্যস্থতাকারীদ্বয় এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব নয় তখন তাদের সুপারিশে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রেও যাতে দ্রুত কিছু না ঘটে বা পরস্পর যাতে চিন্তা ভাবনার সুযোগ পায় এবং পরস্পরের প্রতি যাতে আকৃষ্ট হয় তার জন্য স্ত্রী স্বামীগৃহে থাকা অবস্থাতেই প্রত্যেক ত্বোহরে[১] একটি করে ত্বালাক দিতে হবে। এবং এইভাবে দ্বিতীয় ত্বোহরে দ্বিতীয় ত্বালাক দেওয়ার পর তৃতীয় ত্বোহরে তৃতীয় ত্বালাক দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এসব পদ্ধতি অনুসরণ করেও যদি দেখা যায় পরস্পর বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অটল, তাহলে আর জবরদস্তি না করে বিবাহবিচ্ছেদই মঙ্গলজনক।

একই সঙ্গে একাধারে তিনবার ত্বালাক শব্দ উচ্চারণ করলেই ত্বালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি ত্বালাক শব্দ বা ত্বালাকের বাক্যকে জোরদার করার উদ্দেশ্য কেউ স্বীয় স্ত্রীকে একত্রে 'তোমাকে ত্বালাক' 'তোমাকে ত্বালাক' 'তোমাকে ত্বালাক' তিনবার বা বহু বার উচ্চারণ করেও তাহলেও একটি মাত্র ত্বালাক গণ্য হবে। ত্বালাক শব্দকে জোর দেওয়ার জন্য ঐ শব্দের পুনঃরুক্তি তিনবার কেন তিন সহস্রবার করলেও একটি মাত্র ত্বালাক হবে। এক ত্বালাক কোন ভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় না। এরকম ত্বালাকের পরও স্বামী ইচ্ছে করলেই তাঁর স্ত্রীকে পুনঃগ্রহন করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন। বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ মোসলেম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে—হযরত এবনে আব্বাস বলেছেন "হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং খলিফা হযরত আবু বকরের সময় কাল পর্যন্ত একত্রে দেওয়া তিন ত্বালাক এক ত্বালাক গণ্য হত।"[২]

তিন বার ত্বালাক শব্দ উচ্চারণ বা ত্বালাক শব্দ প্রয়োগ করা মাত্রই

১. দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময়।

২. আল-হাদিস

ত্বালাক হয়ে যাওয়ার সামাজিক ধারণা ইসলামী শরীয়ত সম্মত নয় বা ইসলাম ধর্মের বিধি বা নিয়ম নয়। তবে যদি কেউ কোরআন, হাদিস, সুন্না ও শরীয়তের নিয়ম লঙ্ঘন করে সুদৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে স্পষ্টভাবে তিনটি পৃথক পৃথক ত্বালাক একত্রে প্রয়োগ করেন তাহলেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য, ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ও পৃথক অর্থ স্পষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। এরূপ ত্বালাক প্রয়োগকারী অন্যায়কারী, পাপাচারী ও হীন কার্যকারী হিসাবে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এরকম ঘটলে ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর জন্য অবৈধ।

আমাদের দেশে যেভাবে সমাজে তিন ত্বালাক প্রচলিত তা কোরআন ও সুন্নার পরিপন্থী। এইভাবে একসঙ্গে বিবেচনাহীন ভাবে তিন ত্বালাক দেওয়া কোনভাবেই ইসলামের শরীয়ত সিদ্ধ নয়। এভাবে ত্বালাক দেওয়া হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নত তরিকা নয়। এরকমভাবে ত্বালাক দেওয়া শরীয়তের নিয়ম বিরুদ্ধ ও সুন্নত বিরোধী কাজ। কেউ এভাবে স্ত্রীকে ত্বালাক দিলে অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে ঐ ব্যক্তি গোনাহগার (পাপাচারী) হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "এইসব আল্লাহ্‌র সীমারেখা। তোমরা ওটা লঙ্ঘন করোনা। যারা এইসব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারা জালেম (সীমালঙ্ঘনকারী)" (২ ঃ ২২৯)[১]

'ফতহুর বারী' নামক বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে রয়েছে "হযরত আনাস বর্ণনা করেছেন যে দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ)-এর সামনে একত্রে তিন ত্বালাক প্রদান-কারীকে উপস্থিত করা হলে তিনি তার পিঠে বেত্রাঘাত করতেন।" নাসায়ী নামক বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে "একদা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ পেলেন যে, সে তার স্ত্রীকে একত্রে তিন ত্বালাক দিয়েছে। এ খবর শুনে অত্যধিক রাগান্বিত হয়ে সমাবেশে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা অবস্থাতেই কোরআনের বিধান নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। হযরতের (সাঃ) রাগ ও অসন্তুষ্টি

১. আল-কোরআন—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৯

এত অধিক ছিল যে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! ঐ ত্বালাক দাতাকে হত্যা করে ফেলব কি?"[১]

সুতরাং একত্রে তিন ত্বালাক দেওয়া কোরআনের বিধান নিয়ে খেলা করারই সামিল। একমাত্র স্পষ্ট ব্যভিচারের ক্ষেত্র ছাড়া কোনভাবেই এই একত্রে তিন ত্বালাকের অধিকার প্রয়োগ শরীয়ত অনুমোদিত নয়। যদিও ঐরূপ ত্বালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হয়ে যাবে বলে অধিকাংশ ইমাম একমত, তবুও এটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদর্শ বিরোধী ও কোরআনকে নিয়ে খেলা করার মত ঘোরতর অপরাধ বলে ঘোষিত। সকল ইসলামী আইনবিদগণের ঘোষণায় এই ত্বালাককে শারীয়তের বিধানে 'বেদয়ী' বা শরীয়তের নিয়ম বিরুদ্ধ ত্বালাক বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে একত্রে তিন ত্বালাকের বিষয় উল্লেখ নেই তবে তিন ত্বালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে উল্লিখিত হয়েছে। ইদ্দতের[১] প্রতি লক্ষ্য রেখে ত্বালাক দেওয়ার বিধান কোরআন ঘোষিত নীতি। তাই একত্রে তিন ত্বালাক দেওয়ার পদ্ধতি মুসলমান সমাজকে বর্জনীয় হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখতে একত্রে তিন ত্বালাক যাতে না ঘটে তার জন্য মানুষকে সতর্ক করতে হবে। কোরআন ও সুন্নার নিয়ম মেনে যাতে ত্বালাক হয় অর্থাৎ প্রথমে দুপক্ষের অভিভাবকের মধ্যস্থতায় বিরোধ মেটানো ও তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ অতঃপর স্বামী যাতে স্ত্রীকে সসম্মানে নিজ গৃহে রেখে এক এক ত্বোহরে এক এক ত্বালাক দেন তার প্রতি সমাজ ও ধর্মীয় নেতাদের নজর দিতে হবে। এবং এই সময় উভয়কে সৎ উপদেশের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে যাতে তৃতীয় ত্বালাক না হয়ে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে পুনঃগ্রহণ করে। দ্বিতীয় ত্বালাকের পর ভাবতে হবে আর ত্বালাক দেবেন কিনা। কারণ আর একটি ত্বালাক দিলে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণের সুযোগ থাকবেনা। তখন অনুতপ্ত হলেও এক ঘৃণ্য পদ্ধতির মধ্য দিয়ে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে হবে। যথেচ্ছ ত্বালাক যাতে না ঘটে সেজন্যই এসব সতর্কতা। কোরআনে বলা হয়েছে, "অতঃপর যদি সে তাকে ত্বালাক দেয়

১. আল-হাদিস: নাসায়ী।

তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যেপর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত না হবে।” (২ : ২৩০)[১]। সুতরাং এই ঘৃণ্য পন্থার সম্মুখীন হওয়ার আগেই গভীরভাবে চিন্তা করার দরকার।

কোনভাবেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা সম্ভব না হলে স্ত্রীর উপর কোন অত্যাচার না করে, তার কোনরকম সম্মানহানী না ঘটিয়ে, তার প্রাপ্য মাহ্‌র ও তার নিজস্ব অর্জিত সম্পদ তাকে অর্পণ করে, সসম্মানে অভিভাবকের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। এটাই কোরআনের বিধান। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, “যখন তোমরা স্ত্রীকে ত্বালাক দাও এবং তারা ইদ্দত কাল উত্তীর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে। কিন্তু অন্যায়রূপে তাদের ক্ষতি করে সীমা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখোনা।[২] যে এরূপ করে সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করোনা এবং তোমাদের প্রতি অবদান ও কেতাব এবং হেকমত[৩] যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন তা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়।” (২ : ২৩১)[৪]

---

১. আলকোরআন—সূরা বাকারা, আয়াত ২৩০

২. ‘কেউ যেন এটা ধরে না নেন যে এই স্বাধীনতা তার স্বমত চরিতার্থতার সুযোগ ; যে কেউ আল্লাহ্‌র এই আইনকে দুর্বল নারীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে তার নৈতিক ও ধর্মীয় পদস্খলন গণ্য হবে।—হোলি কোরআন—আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী, নোট নং ২৬২ দ্রষ্টব্য।

৩. সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়বস্তুকে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে। যে কেউ শিল্প বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম বিষয়কে ভালভাবে অয়ত্ত করে তাকে ‘হাকিম’ বলে। এখানে ‘হেকমাত’ শব্দ দ্বারা ব্যবহারিক জ্ঞান বোঝান হয়েছে।—লেসানুল আরব।

৪. আল-কোরআন—সূরা বাকারা : আয়াত ২৩১

॥ ত্বালাক তথা বিবাহ বিচ্ছেদ—২ ॥

ইসলামে নারীও ত্বালাকের অধিকারিণী ঃ

নারীজাতি সম্পর্কে ইসলামের যে নীতিটি বর্তমানকালে বহু সমালোচিত সেটি হলো ত্বালাক। বলা হয় ইসলাম পুরুষকে ত্বালাক দেওয়ার যথেচ্ছ অধিকার দান করেছে, আর নারীকে এ অধিকার থেকে করেছে বঞ্চিত। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজব্যবস্থাই এ ধারণা তৈরী হতে সাহায্য করেছে। আগেই আমরা দেখেছি ইসলাম পুরুষকে ত্বালাক দেওয়ার যথেচ্ছ অধিকার দান করেনি। ঠিক একইভাবে এও সঠিক নয় যে, ইসলাম নারীর হাতে ত্বালাকের অধিকার দেয়নি।

পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "...তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়; যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবেনা এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে তারা আল্লাহ্‌র সীমা-রেখা রক্ষা করে চলতে পারবেনা তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। এই সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা......।" (২ ঃ ২২৯)[১]

পবিত্র কোরআনের এই ঘোষণার তাৎপর্য হলো যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক প্রেমপ্রীতি সৃষ্টি না হওয়ার দরুণ স্ত্রীর এ রকম আশংকা হয় যে দাম্পত্য জীবনে তারা পরস্পরের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না এবং এ অবস্থার জন্য একা স্বামী দায়ী এবং দোষীও নয় সেক্ষেত্রে স্বামী যা সম্পদ স্ত্রীকে দিয়েছে তার সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ স্বামীকে ফেরৎ দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিতে পারে। এটি ইসলামী আইন তথা শরীয়ত সম্মত কাজ। অর্থাৎ এরকমভাবে স্ত্রীর ত্বালাক নেওয়া জায়েজ বা বৈধ। স্ত্রীর এইভাবে ত্বালাক নেওয়াকেই বলা হয় 'খোলা' ত্বালাক।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম ধর্মের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত

---

১. আল-কোরআন—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৯

বৈপ্লবিক নীতিতে নারীদেরও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর বা বিবাহবিচ্ছেদের দাবি জানানোর অধিকার স্বীকৃত। এই অধিকারকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'খোলা ত্বালাক' বলা হয়। তবে পুরুষকে যেমন যথেচ্ছ ত্বালাক দেওয়ার অধিকার ইসলামে দেওয়া হয়নি তেমনি নারীকেও দেওয়া হয়নি। পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন কতকগুলি নিয়ম আছে, নারীর ক্ষেত্রেও তেমনি কতকগুলি নিয়ম আছে, যেগুলি মেনে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো যায়।

এটা ঠিক যে পুরুষ যেভাবে দুজন সাক্ষীর সাক্ষাতে ত্বালাক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা স্ত্রীকে ত্বালাক দিতে পারেন, ইসলাম নারীকে সভাবে ত্বালাকের অধিকার দেয়নি।* নারীদেরকে ত্বালাক পাওয়ার জন্য কাজী বা কোর্টের কাছে স্বামীর দুর্ব্যবহার, উপেক্ষা, নির্ম্মমতা ও অন্যান্য কারণ জানাতে হয় এবং নির্ধারিত মাহ্‌র ছেড়ে দিতে হয়। তবে স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতেই তার দাবি মতই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া ইসলামে স্বীকৃত। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "স্বামীর অপরাধ ছাড়া যে নারী ত্বালাক চায় সে আল্লাহ্‌ ও ফেরেশতা কর্তৃক অভিশপ্ত।" অপর এক হাদিসে আছে 'যে মহিলা তার ত্বালাকের অধিকার নিয়ে খেলা করে সে ভণ্ড বা কপট।' পুরুষের ত্বালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন বিধিনিষেধ রয়েছে মহিলাদের এই ত্বালাকের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নানা নৈতিক বিধিনিষেধ রয়েছে সমাজ ও সংসারকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্য। তাছাড়া নারীপুরুষ উভয়কেই ত্বালাকের অধিকার প্রয়োগের জন্য আর্থিক মূল্যও দিতে হয়। স্বামীর ত্বালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন নারীর প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হয়, স্ত্রীর ত্বালাক নেওয়ার ক্ষেত্রে তেমনি তার ধার্য্য বা প্রাপ্য মাহ্‌র স্বামীর অনুকূলে ছেড়ে দিতে হয়।

ইসলাম ধর্মের মোটেই অভিপ্রেত নয় যে সমাজে ত্বালাক ঘটুক। ত্বালাক যাতে সহজে না ঘটে, ত্বালাক যাতে নারীপুরুষের হাতে খেলনার মত হয়ে না দাঁড়ায় তার জন্য ইসলাম যেমন সতর্কতামূলক বিধান দিয়েছে, তেমনি আবার ত্বালাক প্রথা রুদ্ধ হয়ে যাতে সমাজে নারীপুরুষের জীবন বিষময় হয়ে না দাঁড়ায় তারজন্য ত্বালাকের অধিকার শর্তসাপেক্ষে নারীপুরুষ উভয়কেই দেওয়া হয়েছে।

মহিলাগণের তালাকের অধিকার ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা ইসলামের সর্বশেষ সংস্কারক ও নীতিনির্ধারক বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও খলিফাদের যুগের কিছু সর্বজনস্বীকৃত ঘটনার উল্লেখ করছি।

এক বিখ্যাত ঘটনা হলো সাবেত বিন কায়েস-এর দুই স্ত্রীর তালাকের ঘটনা। এদের একজন হলেন আবি সালুল কন্যা জামিলা। জামিলা স্বামীর আকৃতি অপছন্দ করতেন। জামিলা একদিন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে এসে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তাঁকে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন অবস্থাতেই আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে একত্রে সংসার করা সম্ভব নয়। আমার স্বামী কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে আসছিলেন। আমি আমার মুখাবরণ তুলে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে তিনি সর্বাধিক কালো, সর্বাপেক্ষা বেঁটে ও সর্বাপেক্ষা কদাকার দেখতে।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে "আল্লাহ্‌র শপথ আমি তাঁর নৈতিক ও ধর্মীয় চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছিনা, কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁর কদাকার চেহারা বরদাস্ত করতে পারছিনা।" এবনে মাযা তার হাদিস গ্রন্থে বলেছেন যে, জামিলা এমন মন্তব্যও করেছেন, "যদি আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হওয়ার ব্যাপার না থাকত তাহলে আমি তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করতাম।" ফতুহুর বারী নামক গ্রন্থে রয়েছে জামিলা বলেছিলেন, "ওগো আল্লাহ্‌র নবী, আপনি দেখেছেন আমি কত সুশ্রী কিন্তু সাবেতকে দেখতে খুবই কদাকার।" ইমাম বোখারী তাঁর হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে, সাবেত এবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তির পত্নী হযরত নবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ সাঃ! সাবেত এবনে কায়েসের দ্বীনদারী (ধর্মাচরণ) সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই কিন্তু আমি একজন মুসলমান হয়ে ইসলামবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ব তা আমার কাছে অসহনীয়। কারণ আমার পক্ষে সাবেতকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে স্বামীর হক আদায় করা বা তার সঙ্গে বসবাস করা মোটেই সম্ভব নয়।' হযরত এ কথা শোনার পর ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার স্বামী মাহ্‌র হিসেবে তোমাকে যে খেজুর বাগান প্রদান করেছেন তা ফেরৎ দেবে কি? তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ অবশ্যই, প্রয়োজনে তারও অধিক দিতে

প্রস্তুত।' হযরত (সাঃ) তাকে অতিরিক্ত দিতে নিষেধ করলেন এবং সাবেতকে নির্দেশ দিলেন, 'মাহ্‌র স্বরূপ তোমার দেওয়া খেজুর বাগান ফেরৎ নিয়ে তাকে ত্বালাক দিয়ে দাও।"[১]

ইমাম মালেক ও আবু দাউদ-এর বর্ণনানুসারে দেখা যায় সাবেত বিন কায়েসের অন্য স্ত্রী হাবিবা বিনতে শাহিদ এক প্রভাতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট এলে হযরত তাকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করায় হাবিবা জানালেন, "আমি এবং সাবেত আর যৌথ জীবন টানতে পারছিনা।" যখন সাবেত এলেন হযরত (সাঃ) তাঁকে বললেন, "তোমার স্ত্রী তোমার সম্পর্কে এই কথা বলেছেন। সুতরাং তুমি তাঁকে ত্বালাক দিয়ে দাও। ইবনে মাযা বলেছেন—হাবিবা অভিযোগ করেছিলেন যে সাবেত তাঁকে এত প্রহার করেছেন যে তাঁর হাড় ভেঙ্গে গেছে।" ঘটনা যে ভাবেই ঘটুক হাবিবার অভিযোগের ভিত্তিতেই হযরত (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়ে দেন।[২]

চতুর্থ খলিফা হযরত ওমরের সময় একজন মহিলার ত্বালাক চাওয়ার বিষয় তাঁর গোচরে আনা হয়। তিনি ঐ মহিলাকে তাঁর স্বামীকে পরিত্যাগ না করে বিবাহিত জীবন টিকিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ মহিলা তাঁর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। তখন হযরত ওমর তাকে এক নোংরা ঘরে তিন দিন বন্দিনী রাখার নির্দেশ দেন। চতুর্থ দিনে হযরত ওমর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কেমন ছিলেন। জবাবে ঐ মহিলা বলেন তিনি প্রকৃত মানসিক শান্তি ঐ তিন দিনই পেয়েছেন। তখনই ওমর বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেন।

আরও একটি পৃথকধর্মী ঘটনা হলো—হযরত এবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন বরীরাহ্‌ নামে এক রমণী (ইনি ক্রীতদাসী) তাঁর স্বামী মুগীসকে খুবই অপছন্দ করতেন। এই অপছন্দের কারণে খোলা ত্বালাক নিয়ে মুগীসকে ত্যাগ করেন। স্বামী মুগীস বরীরাহ্‌কে গভীরভাবে ভালবাসতেন তাই বিবাহবিচ্ছেদের পর মুগীস বিরহ বেদনায় অস্থির হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে

১. আল হাদিস : বোখারি শরীফ বাং ৬ষ্ঠ খণ্ড হাদিস নং ২০৮২।

২. আল হাদিস : আবু দাউদ ও এবনে মাযা

লাগলেন। হযরত নিজে আব্বাসের কাছে মন্তব্য করেন, 'হে আব্বাস, বরীরাহ্‌র প্রতি মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বরীরাহ্‌র উপেক্ষা বড়ই আশ্চর্যজনক।' এরপর হযরত (সাঃ) বরীরাহ্‌কে বলেন, "তুমি মুগীসকে পুনঃগ্রহণ করলে বড় ভালো হতো।" একথা শুনে বরীরাহ্‌ হযরতকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন?" তিনি বললেন, "না আমি শুধুমাত্র সুপারিশ করছি।" তখন বরীরাহ্‌ বললেন, "হুজুর, তাঁর প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।"[১]

উপরোক্ত চারটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের ত্বালাক চাওয়ার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। সাবেত বিন কায়েসের ঘটনায় স্পষ্ট হচ্ছে যে স্বামী কুৎসিৎ হওয়ার জন্য অপছন্দ করে স্ত্রী চাইলে ত্বালাক পাওয়ার অধিকারিণী। আরও একটি ব্যাপার স্পষ্ট হচ্ছে যে মহিলাদের কোর্টের বা সামাজিক নিয়মেদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা কাজির কাছে ত্বালাকের আবেদন জানানোই যথেষ্ট। এ বিষয় স্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা যাচাই না করেই শুধুমাত্র স্ত্রীর দায়িত্বেই বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়াও অনুমোদিত। কোর্ট বা সামাজিকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা কাজি বিবাহবন্ধন টিকিয়ে রাখার জন্য নারীকে শুধুমাত্র অনুরোধ করতে পারেন—এর বেশী কিছু নয়।

সুতরাং কোন মহিলা চাইলে তাঁর ত্বালাক পাওয়া বৈধ এবং কেউ কোনভাবেই তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকারী নয়। সুতরাং মহিলাগণকে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার ইসলাম দেয়নি এমন অভিযোগ মিথ্যা তো বটেই, এমনকি ইসলাম-বিরোধী।

তবে সদুপদেশের মাধ্যমে ত্বালাক রোধ করার যে বিধি ইসলাম ঘোষণা করেছে তা নারীপুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। মহিলাদের ত্বালাক দাবির ক্ষেত্রেও কোর্ট বা সামাজিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে একটি বিষয় সুনিশ্চিত হতে হবে যে স্ত্রী কেবল মাত্র যৌন আকর্ষণের জন্য ত্বালাক চাইছেন, নাকি সত্যসত্যই স্বামী কোনভাবে যৌন রোগগ্রস্ত হওয়ায় বা দুর্ব্যবহার, উপেক্ষার ও অপছন্দের জন্যই স্ত্রী এমন দাবি করছেন। স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা অপছন্দ ইত্যাদি

১. আল হাদিস : বোখারী শরীফ ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাংলা তৃতীয় সংস্করণ হাদিস নং ২০৮৩

অভিযোগ থাকলে তার সত্যতা অনুসন্ধান করে স্ত্রীর অভিযোগ যাচাই করতে হবে।

খোলা ত্বালাকের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত্র বিশেষে নারীপুরুষের সম্মতিতেই দেনমোহর ফেরতের পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি এ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় ও তা শেষপর্যন্ত স্ত্রী সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোর্টে নিয়ে যান এবং কোর্ট যদি দেখে স্বামীর অত্যাচার অবিচারই স্ত্রীকে ত্বালাক চাইতে বাধ্য করেছে তাহলে কোর্ট চাইলে দেনমোহর ফেরৎ না দেওয়ার নির্দেশও দিতে পারে। কোর্ট যদি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ, স্ত্রী মানসিক ও দৈহিক স্বেচ্ছাচারিতার জন্যই ত্বালাক দাবি করেছেন, তাহলে নির্ধারিত মাহ্‌র সহ আরও অধিক আর্থিক মূল্য স্বামীকে দিয়ে তবেই ত্বালাক অর্জনের নির্দেশ দিতে পারবেন।

এ ছাড়াও ইসলাম ধর্মের বিধানে মহিলাগণ নিম্নলিখিত কারণেও ত্বালাক গ্রহণের অধিকারিণী। ১. নাবালিকার বিবাহ হয়ে থাকলে, সাবালিকা তথা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে অপছন্দ ঘোষণা করে ত্বালাক গ্রহণ করতে পারেন। ২. স্বামীর কাছ থেকে পরিপূর্ণ ভরণপোষণ না পেলে ত্বালাক গ্রহণ করতে পারেন। ৩. ধর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও স্ত্রী ত্বালাক গ্রহণের অধিকারিণী। ৪. স্বামী পুরুষত্বহীন হলে স্ত্রী ত্বালাক দাবি করতে পারেন। ৫. স্বামী সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত হলে স্ত্রী ত্বালাক পাওয়ার অধি-কারিণী। ৬. স্বামী ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে ফেলে রেখে চলে গেলে। ৭. স্বামী নিখোঁজ হলে। ৮. স্বামীর দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হলে স্ত্রী ত্বালাক চাইতে পারবেন।

কোরআনে নারীদের বিবাহের ব্যাপারে অভিভাবকগণকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার নারীকেই দেওয়া হয়েছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই প্রসঙ্গে প্রতিক্ষেত্রেই এই মনোভাব পোষণ করতেন যে নারীগণ বিবাহের ব্যাপারে অবশ্যই অভিভাবকগণের সঙ্গে পরামর্শ করবেন ও তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করবেন ; কিন্তু অভিভাবকগণ যদি অবিবেচনাপ্রসূত এমন কোন সিদ্ধান্ত তাঁর উপর চাপিয়ে দেন যা কিছুতেই

তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে নারীদের অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

যদি ভরণপোষণের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীর যথোপযুক্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করেন তবে স্ত্রী ত্বালাক দাবি করতে পারেন। এক্ষেত্রে কোর্ট স্বামীকে স্ত্রীর উপযুক্ত ভরণপোষণ করার আদেশ দান করবে। কোর্টের আদেশ স্বামী কার্যকরী না করলে কোর্ট স্ত্রীর দাবি মত বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেবেন। আর স্বামী যদি নিজের দারিদ্র্যের জন্য স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে সম্পূর্ণ ভাবে অপারগ হন এবং এই অবস্থার জন্য স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে চান সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হাম্বলের মতে সঙ্গে সঙ্গেই কোর্ট বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ দেবেন অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই ত্বালাকের অধিকারী হবেন। ইমাম শাফীর মতানুসারে এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীকে তিনদিন সময় মঞ্জুর করা হবে যাতে সে স্ত্রীর উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। ইমাম মালেক এক্ষেত্রে এক বা দুই মাস সময় মঞ্জুর করার পক্ষপাতী।

স্বামী অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলে স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করতে পারেন এবং তাঁর দাবি মত বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হতে পারবে।

স্বামী পুরুষত্বহীন হলে স্ত্রী ইচ্ছা করলেই কোর্টের কাছ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। এরকম ক্ষেত্রে কোর্ট বা কাজি স্ত্রীর দাবিমত সঙ্গে সঙ্গে ত্বালাক মঞ্জুর না করে স্বামী যাতে চিকিৎসার সাহায্যে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে পারেন, তার জন্য একবছরের সময় দেবেন। এই সময়কালের মধ্যে স্বামী আরোগ্য লাভ করলে স্ত্রীর সংশ্লিষ্ট কারণে বিবাহবিচ্ছেদের দাবি বাতিল হবে। অর্থাৎ স্ত্রী খোলা ত্বালাকের অধিকারী থাকবেন না।

স্বামীর সংক্রামক ব্যধি থাকলে স্ত্রী খোলা ত্বালাকের অধিকারী কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকলেও স্বামী মারাত্মক ধরনের সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত হলে স্ত্রীর খোলা ত্বালাকের সপক্ষে অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ-গণ মত দিয়েছেন।

স্বামী দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকলে এবং তাঁর সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হলে, স্ত্রীও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকারিণী হবেন। আবার যদি এমন অবস্থার পূর্বেই স্ত্রীর জন্য ধৈর্যধারণ, মানবীয় কারণ বা অন্নবস্ত্রের

অভাবে জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ে, তবে স্ত্রী খোলা ত্বালাক দাবি করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে স্ত্রীকে স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে হবে। এক্ষেত্রে ফয়শলাকারী কোর্ট বা ইসলামী পঞ্চায়েত অথবা সামাজিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিল, কমিটি, ব্যক্তি ইত্যাদিকে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানের উদ্যোগ নিয়ে তবেই তার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে হবে। এই সকল কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়া সুনিশ্চিত মনে হলে এই সময় থেকে চারবছর পূর্ণ হওয়ার পর বিবাহ বাতিল বলে ঘোষিত হবে। এরপর স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দতকাল পালন করে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবেন।

স্ত্রীর ত্বালাক দাবি করার উপরোক্ত কারণগুলি থাকলে কোনভাবে ত্বালাক পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধাসৃষ্টি করা যাবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত ধারণা যে ইসলাম নারীকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়নি এটি সর্বৈবভাবে অসত্য। এদেশে মুসলমানদের আরও দুর্দিন যে তাঁরা বর্তমানে শিক্ষায় যতই অগ্রসর হোন না কেন, নিজ ধর্মীয় আদর্শের বিধানগুলি জানার জন্য কোন পড়াশোনা করেন না। আর তাই ভিত্তিহীন, তথ্যহীন প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তারা গলা মেলান তার সঙ্গেই। অথচ তাঁরা এমন এক গৌরবময় ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, যে ধর্ম শুধুমাত্র ধর্মীয় আচারের মধ্য দিয়ে নিজ মুক্তি সাধনের পথ বাতলায়নি, জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে সুন্দর, সুষ্ঠু ও ভারসাম্যময় করার জন্য আইন রচনা করেছে, জীবনাচরণ ঠিক করে দিয়েছে। প্রগতিশীলতার শংসা-পত্র পেতে গেলেই ইসলাম বিরোধিতার ভূমিকায় নামতে হবে এই সর্বনাশা দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁদের নামসর্বস্ব মুসলমান করে তুলছে। পাশ্চাত্ত্য জগতের দিকেই যদি একবার তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন নিয়ম-নীতিহীন লাগামছেঁড়া জীবনে ডুবে গিয়ে সেখানকার সমাজ কি বিষময় পরিণতি ডেকে এনেছে। পাশ্চাত্ত্যেও এ নিয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে যে নারী পুরুষের এই অবাধ জীবন যাপন ফেলে ফিরে যেতে হবে অতীতে। সারা পৃথিবীর আধুনিক প্রগতিশীল জীবনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিণতি ইসলামের আইনকানুনের প্রতি মুসলমান নারী পুরুষের দৃষ্টি ফেরাতে যথেষ্ট। এ দৃষ্টান্ত থেকে যদি শিক্ষা না নিতে পারা যায়

তাহলে একই করুণ পরিণতির মধ্যে আমাদের জীবনের মাশুল গুণতে হবে।

ইসলামী আইনে ত্বালাকের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রে ত্বালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদকে বেশ কয়েকটি প্রকার পদ্ধতি ও প্রকৃতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ প্রাপ্তবয়স্ক, সজ্ঞান ও জাগ্রত স্বামীর দেওয়া ত্বালাকই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ নাবালক ও ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রীকে ত্বালাক দিলে ত্বালাক সাব্যস্ত হবে না। পুরুষ কেবলমাত্র নিজ স্ত্রীকেই ত্বালাক দেওয়ার অধিকারী। স্বামী ব্যতীত পরিবারের অন্য কেউ স্ত্রীকে ত্বালাক দিতে পারেনা, দিলে তা নিরর্থক হবে।[১] ফেকাহ শাস্ত্রে ত্বালাককে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ১. **ত্বালাকে আহসান** অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট বিবাহবিচ্ছেদ। ২. **ত্বালাকে হাসান** অর্থাৎ উত্তম বিবাহবিচ্ছেদ। ৩. **ত্বালাকে বেদয়ী** অর্থাৎ শরীয়তের নিয়ম বিরুদ্ধ বিবাহবিচ্ছেদ।

১. **ত্বালাকে আহসান :** যে স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনবাস ও দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে এমন স্ত্রীকে এক ত্বোহরে এক ত্বালাক দেওয়ার পর আর ত্বালাক না দিয়ে, স্ত্রীর ইদ্দতকালের মধ্যে তাকে স্পর্শ না করা অবস্থায় তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হলে ঐ রিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এইভাবে ত্বালাক দেওয়াকে ত্বালাকে আহসান বলে। এই ত্বালাকের পর পরবর্তীকালে যে কোন সময় স্বামী ইচ্ছে করলে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারেন।

২. **ত্বালাকে হাসান ঃ** যে স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনবাস ও দৈহিক সম্পর্ক সম্পন্ন হয়েছে তাকে ক্রমান্বয়ে তিন ঋতুর মধ্যবর্তী পবিত্র থাকার সময় তিন ত্বালাক দেওয়ার রীতিকে ত্বালাকে হাসান বলে। এই দুই প্রকার ত্বালাকই সুন্না ও শরীয়তের বিধিসম্মত।

৩. **ত্বালাকে বেদয়ী :** একই ত্বোহরে একাধিক শব্দ ব্যবহার করে দুই বা তিন ত্বালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানকে ত্বালাকে বেদয়ী বলে। এইভাবে ত্বালাক দিলে ত্বালাক হবে কিন্তু ত্বালাক প্রদানকারী পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হবে অর্থাৎ গোনাহগার হবে।

---

১. দররুল মুখতার, পৃঃ ৩৭১

হযরত (সাঃ)-এর নীতি অনুযায়ী ত্বালাকের ক্ষেত্রে যে দুটি বিষয় লক্ষণীয় তাহল ঃ—

১. ত্বালাকের সংখ্যা ঃ সংখ্যা বলতে স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনবাস হোক বা না হোক প্রত্যেক ত্বোহরে একটি মাত্র ত্বালাক দেওয়াকে বোঝায়। এটা হলো সুন্নত তরিকা অর্থাৎ রাসূলের (সাঃ) পন্থানুসারে ত্বালাক।

২. ত্বালাকের সময় ঃ নির্জনবাস সম্পন্ন হয়েছে এমন স্ত্রীকে এমন ত্বোহরে ত্বালাক দিতে হবে যাতে নির্জনবাস হয়নি। আর যে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহের পর আদৌ নির্জনবাস হয়নি তাকে যে কোন সময়ে ত্বালাক দেওয়া সুন্নত সম্মত। আবার যেসকল স্ত্রী নাবালিকা, বৃদ্ধা, গর্ভবতী বা অন্য কোন কারণে ঋতুমতী হয়নি তাদের ত্বালাকের ক্ষেত্রে সুন্নতী পন্থা হলো চাঁদের হিসাব অনুযায়ী এক এক মাস অন্তর এক ত্বালাক দেওয়া। সাধারণভাবে তিরিশ দিনকে এক এক মাস গণ্য করাও শরীয়ত স্বীকৃত প্রথা। সুন্নত অনুসারে ত্বালাক দিতে হলে প্রত্যেক দু ত্বালাকের মধ্যে একমাস কাল বিরতি দিতে হবে।[১]

স্ত্রীকে স্বামীর পুনঃগ্রহণের অধিকারের ক্ষেত্রে ত্বালাক দুপ্রকার। যথাঃ—

১. রাজয়ী ঃ এই ত্বালাকে ইদ্দতকালের মধ্যে স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াই তাকে পুনঃগ্রহণ করতে পারেন। তবে ইদ্দত কাল সম্পূর্ণ হয়ে গেলে স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে তবেই বিবাহ করা যাবে এবং পুনঃবিবাহের সময় দুজন সাক্ষী রাখাও ভাল।

২. বায়েন ঃ তিন ত্বালাক বায়েনের ক্ষেত্রে পূর্বস্বামীর সঙ্গে সরাসরি বিবাহ নিষিদ্ধ। বায়েন ত্বালাকের পর পুনঃ বিবাহ করতে হলে ত্বালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীকে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে বিবাহ করতে হয় এবং ঐ স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সম্পন্ন করার পর যদি ঐ স্বামী ত্বালাক দেয় বা তার মৃত্যু ঘটে তখন ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তবেই প্রথম স্বামীর সঙ্গে পুনঃ বিবাহ বৈধ হবে[২] তিন ত্বালাক না ঘটার জন্য সতর্কীকরণ স্বরূপ এই ঘৃণ্য পদ্ধতির বিধান ইসলামে দেওয়া হয়েছে।

---

১. মাজমাউল আনহার পৃঃ ৩৮২

২. ঐ ঐ পৃঃ ৪৩৮

ত্বালাক দেওয়ার জন্য যে সব শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ—

১. **সরীহ্ ঃ** ত্বালাকের জন্য নির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগকে সরীহ বলে যেমন—"আমি তোমাকে ত্বালাক দিলাম।" বা "আমি তোমাকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলাম।" এরকম সুনির্দিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করলে সর্বদাই এক ত্বালাক 'রাজয়ী' হবে। এমনকি তিন ত্বালাক দেওয়ার মানসিক ইচ্ছা নিয়ে এরকম সুনির্দিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করলে এক ত্বালাকই হবে। একে বলে সরীহ্।

২. **কেনায়া ঃ** ত্বালাকের ক্ষেত্রে পরোক্ষ শব্দ প্রয়োগকে শরীয়তের ভাষায় কেনায়া বলে। যেমন তুমি একাকিনী, তুমি মুক্ত হও। এই সকল পরোক্ষ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা দুই বা তিন ত্বালাকের জন্য মনস্থির করলেও এক ত্বালাকই গণ্য হবে। একে বলে কেনায়া।

এছাড়া ইসলামী শরীয়তে আরও কয়েকভাবে ত্বালাকের জন্য ব্যবহৃত কিছু শব্দ বিশেষভাবে পরিচিত। যথা—**ঈলা, জেহার, লেয়ান**।

১. **ঈলা ঃ** স্বামীর ত্বালাক না দেওয়া সত্ত্বেও শপথের দ্বারা যেভাবে ত্বালাক সম্পন্ন হয়ে যায় তাকে ঈলা বলে। যদি কোন স্বামী শপথ করে স্ত্রীকে বলে যে, "আল্লাহ্‌র শপথ আমি তোমার সঙ্গে চার মাস কিংবা ততোধিক কাল নির্জন বাস ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করব না, এবং ঐভাবে ঐ স্বামী চার মাসের মধ্যে শপথ অনুযায়ী নির্জনবাস ও সহবাস না করে তাহলে চার মাস পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্ত্রীর উপর বায়েন ত্বালাক হয়ে যাবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আর যদি ঐ চারমাসের মধ্যে শপথ ভঙ্গ করে নির্জন বাস ও সহবাস করে তাহলে আর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না। অর্থাৎ ত্বালাক হবে না। কিন্তু শপথ ভঙ্গের জন্য খেসারত (কাফ্‌ফারা) দিতে হবে। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে। "যারা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (২ ঃ ২২৬)[১]

সুসংহত পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্যই ইসলাম এরূপ বিধান

১. আল-কোরআন—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২২৬

দিয়েছে। স্বামীগণ যাতে স্ত্রীদের প্রতি কঠোর না হয়ে পড়েন এবং সামাজিক সম্পর্ক রহিত হয়ে না থাকেন সেজন্যই এই সতর্কতা। স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘকাল পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখার চিন্তা যাতে কোন স্বামী না করেন তার জন্যই এই কঠিন বাঁধন।

২. **জ্বেহার** ঃ জ্বেহারের প্রথা ও ভাষা আরব দেশে প্রচলিত ছিল। ত্বালাকের উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে বলে "তুমি আমার মায়ের মত" কিংবা এরকম উদ্দেশ্যে বলে যে, মা যেরূপ হারাম তুমি আমার জন্য সেরূপ হারাম তাহলে তাতে ত্বালাক হবে না, জ্বেহার হবে। জ্বেহার হওয়া অর্থ অনুরূপ বাক্য প্রয়োগ করলে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম বা সঙ্গমের ভূমিকা স্বরূপ কোন কিছু করাও হারাম। এমনকি ঝগড়ার সময়ও এই ধরনের বাক্য স্ত্রীকে বললে জ্বেহার হয়েছে ধরা হয়। অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি এই ধরনের অশ্লীল ও অশোভন বাক্য ব্যবহার করলেই তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ গণ্য হবে। এইভাবে স্ত্রীর প্রতি অশোভন বাক্য প্রয়োগ বন্ধ করাই এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য।' এই নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেতে হলে রমজান মাস ছাড়া অন্য সময়ে একাদিক্রমে দুমাস রোজা রাখতে হবে। তবেই এ অপরাধের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ সম্ভব। রোজা রাখার সময় কোনরকমে একদিনও যদি বিরতি ঘটে যায় তাহলে পুনরায় ৬০টি রোজা রাখতে হবে। কেউ যদি রোজা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে ৬০জন দুঃস্থকে পরিতৃপ্তি সহকারে দুবেলা আহার করাতে কিংবা ৬০ জনের সাদকায়ে ফেতরা[১] পরিমাণ অর্থ দান করতে হবে। তবে কেউ যদি 'তুমি আমার মায়ের মত' না বলে, কেবল মাত্র 'মা' বলে সম্বোধন করে তাহলে জ্বেহারও হবেনা ত্বালাকও হবে না এবং কিছুই ক্ষতিপূরণ করতে হবে না। আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক হবে সুন্দর সুরুচিপূর্ণ, কোন ভাবে তাতে অশ্লীলতা থাকবে না, এটাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ জ্বেহার সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের জ্বেহার[১] করে তারা জেনে রাখুক, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়।

---

১. আরবী 'জাহর' শব্দটির অর্থ পৃষ্ঠদেশ। প্রাকইসলামী যুগে যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে বলত "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ" তাহলে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেত। এভাবে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়াকেই 'জেহার' আখ্যা দেওয়া হয়।

যারা তাদের জন্ম দান করে কেবল তারাই তাদের মাতা, ওরাতো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চই আল্লাহ্ পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (৫৮:২)[১]

এই জ্বেহারের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "...যৌন কামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুমাস সিয়াম (রোজা) পালন ; যে তাতেও অসমর্থ সে ষাট জন অভাবগ্রস্থকে আহার করাবে ; এটা এজন্য যে তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি ' (৫৮ : ৪)[২]

লেয়ান : ইসলামী শরীয়তে ব্যভিচার গ্রস্থ হওয়া কঠিন পাপ বলে চিহ্নিত এবং এর জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে। বিবাহিত নারীপুরুষ ব্যভিচার গ্রস্থ হলে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করা হলো ইসলামী বিধান। শরীয়ত সম্মত প্রমাণ ব্যতিরেকে কারো উপর ব্যভিচারের অপবাদ চাপিয়ে দিলে অপবাদকারীর শাস্তিও অতি কঠোর। সেক্ষেত্রে অপবাদকারীকে আশীটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং তার কোন সাক্ষ্য কোর্ট বা বিচারালয়ে কখনই গ্রহণ করা হবে না। চারজন প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষী হাজির করতে সক্ষম না হলে কেউ নিজের চোখে কাউকে জেনা (ব্যভিচার) করতে দেখলেও চুপ করে থাকতে হবে। যতদিন না চারজন প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষী যোগাড় করতে পারে ততদিনের মধ্যে প্রকাশ করলেই তাকে বেত্রদণ্ড ভোগ করতে হবে।

কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ চোখে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে এবং চারজন সাক্ষী যোগাড় সম্ভব না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিষয়টি স্বামীর পক্ষে কিছুতেই চেপে যাওয়া সম্ভব নয়। তেমনি স্বামীকে ব্যভিচারগ্রস্থ দেখলেও স্ত্রীর চুপচাপ থাকা সম্ভব নয়। স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখেন ও প্রকাশ করতে চান তাঁকে তাহলে বিচারকের বা কাজির দরবারে চারবার শপথ তথা হলফ করে তাঁর দাবির সত্যতা ঘোষণা করতে হবে এবং পঞ্চমবার বলতে হবে, "স্ত্রীর প্রতি আমার অভিযোগ মিথ্যা হলে আমার উপর যেন আল্লাহ্র

১. আল কোরআন—সূরা মুজাদালা, আয়াত ২

২. আল কোরআন—সূরা মুজাদালা আয়াত ৪

লানৎ (অভিশম্পাত) নেমে আসে। এর ফলে স্বামী সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারায় আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেন। আবার স্ত্রী যদি স্বামীর আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে এবং চারবার হলফ করে স্বামীর আনীত অভিযোগকে মিথ্যা বলে দাবি করে এবং পঞ্চমবারে শপথ করে বলে, "স্বামীর আনীত অভিযোগ সত্য হলে অর্থাৎ আমি ব্যভিচার গ্রস্থা হলে আমার উপর আল্লাহ্‌র লানৎ (অভিশম্পাত) নেমে আসবে। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণের ফলে দুজনেই ব্যভিচার করার শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এভাবে ঘটা বিবাহবিচ্ছেদকে **লেয়ান** বলে। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ।" (২৪ঃ ৬)[১]

এইভাবে শপথ করার পর কোনভাবেই এই বিবাহ টিকিয়ে রাখা সমীচীন নয়। সেজন্যই শরীয়ত এরকম ক্ষেত্রে বিবাহ ছিন্ন করার বিধান দিয়েছে। নইলে প্রতিনিয়তই এ রকম ঘটনার সৃষ্টি হয়ে সমাজে এক নোংরা পরিবেশ তৈরী হতো। এর দ্বারা যাতে কোনভাবে কেউ স্বেচ্ছাচারী না হয়ে ওঠে সেজন্য পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছেন, "যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি।" (২৪ঃ ২৩)[২]

শরীয়তের দৃষ্টিতে ত্বালাকের যে রূপ রেখা বিভিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছে এ পর্যন্ত সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ত্বালাক সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিও আলোচিত হয়েছে। এবার আমরা সাধারণ ভাবে তালাকের উপর বিশ্ব সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে একটু বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনার সূচনা করব।

---

১. আলকোরআন—সূরা নূর ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯

২. ঐ —সূরা নূর ঃ আয়াত ২৩

।। তালাক তথা বিবাহ বিচ্ছেদ—৩ ।।

"নারীদের সঙ্গে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কোমল ব্যবহার অবলম্বন সম্পর্কে আমার উপদেশ, পরামর্শ ও আদেশ তোমরা রক্ষা করে চলো।"

"নারীকে ভালবাসা হচ্ছে নবীদের ন্যায়নীতির অঙ্গ।"

—হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)

বিবাহবিচ্ছেদ ও সেই বিচ্ছেদজনিত পারিপার্শ্বিক কুফল ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আজ বিশ্বমানবসমাজ এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। সুদূর অতীতে মানবসভ্যতা যখন এত উন্নত ছিলনা তখনও মানুষকে এমন এক জটিল সামাজিক অশুভ পরিণামের মোকাবিলা করতে হয়নি। বিবাহ-বিচ্ছেদ এক মারাত্মক ব্যাধির মতই ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে।

বিশ্বের প্রতিটি বুদ্ধিজীবী মানুষ এ সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। আইনবিদ, বিচারক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই সামাজিক ব্যাধির নিরাময়ের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা সবরকম-ভাবে চেষ্টা করছেন যাতে দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে তাকে শক্তি-শালী ও স্থিতিশীল করা যায়। তাঁরা বিবাহের এমন একটা রূপ দিতে চেষ্টা করছেন যাতে পারিবারিক সম্পর্ক সহজে ভেঙে পড়তে না পারে! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সর্বস্তরের মানুষের সব প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত করে এ ব্যাধির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। সংখ্যাগত তথ্য প্রমাণ করে যে বছরের পর বছর বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। আরও বহু পরিবার আসন্ন সর্বনাশের প্রতীক্ষা করছে। যে সকল সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধের জন্য ও দাম্পত্যসম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য আইনের কড়াকড়ি ছিল বা এখনও আছে, সেখানে এসেছে আরও নূতন এবং নির্মমতম উপসর্গ—তা হলো বধূহত্যা। দাম্পত্যসম্পর্ক সুখময় না হলেও আইনের বেড়াজালে যখন স্ত্রীকে ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ছে তখন নিরীহ ও অসহায় নারীটিকে জীবনদান করে সব সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে।

কোন শারীরিক ব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দিলে মানুষ বস্তুগত ও বুদ্ধিগত অধ্যাবসায় দ্বারা সে ব্যাধিকে আয়ত্ত ও পরাজিত করার চেষ্টা করেছে। দেখা গেছে সেইসব ব্যাধি অনেক হ্রাস পেয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে নির্মূলও হয়েছে। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ নামক সামাজিক ব্যাধিটির ক্ষেত্রে ঘটছে ঠিক বিপরীত অর্থাৎ চারদিক হতে যত এর হাত থেকে মুক্তির চেষ্টা হচ্ছে এ ততই বেড়ে চলেছে।

আধুনিক জীবনে বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমানতা ঃ

অতীতে বিবাহবিচ্ছেদ, এর অশুভ পরিণতি, বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার কারণ, এর ক্রমবর্ধমানতা বা এর থেকে মুক্তির পথ এসব ব্যাপারে কোন চিন্তাভাবনা ছিলনা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তবুও অতীতে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সামান্য। ছিন্নভিন্ন পরিবারের সংখ্যাও ছিল যৎসামান্য। অবশ্য বিবাহবিচ্ছেদের কারণগুলি অতীতের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশী সক্রিয়। সমাজ জীবন বর্তমানে এমন জায়গায় পৌঁচেছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অনৈক্য এবং পারিবারিক সম্পর্কের শিথিলতার কারণগুলি অত্যন্ত প্রকট ও একত্রিত হয়েছে। আর সেজন্যই সমাজ বিজ্ঞানী ও সমাজচিন্তাবিদগণের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমানতা উর্দ্ধগামী। আজ চিন্তার বিষয় হলো যে এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যেক সমাজে এটি মহামারীরূপে দেখা দেবে—ফলে সব সমাজই ছিন্নভিন্ন আদর্শহীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত হবে।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন সভ্যতার উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গেছে তখন কেন তাদের জীবনে এতবড় সংকট সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করছে। পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যের রহস্য যখন মানুষের করতলগত, তখন কেন নিজের জীবনের নিশ্চয়তা তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। অণু থেকে পরমাণুর সন্ধান সে যখন জেনে ফেলেছে তখন নিজের জীবনটা কেন দুর্বিসহ যন্ত্রনায় মাথা কুটে মরছে।

এটি একটি ব্যাধি। মারাত্মক ব্যাধি। একদিন যে মানুষ পরম ভালোবাসায় সমাজবন্ধনে আবদ্ধ হতে শিখেছিল—সেই সমাজ এই নিদারুণ সংকটের জগদ্দল পাথর চাপা পড়ে মৃত্যুর দিন গুণতে বাধ্য হবে। পরম

মমতায় যে পারিবারিক বন্ধন মানুষকে নূতন নূতন সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে—আজ সেই বন্ধন মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। যে কোন ব্যাধি নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন তার উৎস সন্ধান করা। আমাদেরও এই সর্বজনীন সমস্যার মূল কোথায় সেটি খুঁজে বের করতে হবে। প্রথমেই বিচার করতে হবে বিবাহবিচ্ছেদ ভাল না মন্দ। বিবাহবিচ্ছেদ অবাধ করার প্রয়োজন, না প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করার।

প্রথমতঃ বিবাহবিচ্ছেদ যদি মানুষের জীবনে শুভ হয় তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যাধিক্য কোন উদ্বেগের কারণ নয় বরং একে স্বাগত জানানো উচিত। দ্বিতীয়তঃ তা যদি মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করা প্রয়োজন। বিবাহের মাধ্যমে তৈরী যে যৌথ-জীবন তাকে চিরস্থায়ী করার জন্য কঠোর হওয়া দরকার। বিবাহিত জীবনে ফাটল ধরাতে পারে, শিথিল করতে পারে এই মহতীসম্পর্ক তেমন পারি-পার্শ্বিক কারণগুলি সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া আর একটি তৃতীয় ভূমিকা মানবসমাজের রয়েছে—সেই ভূমিকাই মনে হয় সঠিক, সুচিন্তিত ও সকলের গ্রহণযোগ্য। সেটি হলো আইনের দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদের দ্বার রুদ্ধ না করা এবং প্রকৃত কারণ থাকলে বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ শর্ত-সাপেক্ষে সহজ করা। অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ সেখানে উন্মুক্ত করা উচিত, যেখানে এটি অপরিহার্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। যে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে কোন মূল্যেই যৌথ জীবনযাপন করা সম্ভব নয়, তাঁরা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। আইনের সাহায্যে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করে কিছুটা উন্মুক্ত রাখা হলে সমাজের এমন কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার যাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কারণগুলি সমাজ ও পরিবার থেকে দূরীভূত হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনৈক্য এবং তার পরিণতিতে বিরোধ ও বিচ্ছেদ শেষপর্যন্ত সন্তানসন্ততির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর একাকীত্ব—এগুলির উৎস যেখানে, তার বিরুদ্ধে সমাজের কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমাজ ও পারিবারিক পরিবেশে দাম্পত্যবন্ধন টুকরো টুকরো করার সমস্ত উৎসগুলি যদি জিইয়ে রাখা হয় তাহলে কখনই কোন আইনের দ্বারা এই মারাত্মক সমস্যাটির প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না।

দেশের আইনবিভাগের দৃষ্টিতে বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ উন্মুক্ত রাখা যথাযথ বিবেচিত হলে ঠিক করতে হবে কোন অবস্থায় এবং কি নিয়মে বিবাহবিচ্ছেদ কার্যকরী করার সুযোগ দেওয়া হবে। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার কেবল স্বামীর থাকবে না কেবল স্ত্রীর কিংবা উভয়ের তাও বিচার্য। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই একই পদ্ধতিতে বিবাহবিচ্ছেদ করার অনুমতি আইন দেবে অথবা তাঁদের যে কোন একজনের অগ্রাধিকার থাকবে, থাকলে কেন থাকবে ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিবাহবিচ্ছেদের সমস্যাটিকে আমরা পাঁচটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে পারি।

১. বিবাহবিচ্ছেদকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং একে নিয়ন্ত্রণ না করে বরং নৈতিক ও আইনগত বাধাগুলি অপসারণ করা।

যাঁরা বিবাহকে কেবলমাত্র যৌনসুখের উৎস বা মাধ্যম বলে গণ্য করেন তাঁরাই এ মতকে সমর্থন করবেন। এঁরা বিবাহকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বলে কল্পনাও করেন না। তাঁরা মনে করেন না যে পারিবারিক সংহতি সমাজের অন্যতম সম্পদবিশেষ, সমাজের সুস্থতার লক্ষণ। পরিবর্তে তাঁরা বলেন 'দ্বিতীয় প্রেম অধিকতর উপভোগ্য'। এই মতাবলম্বীগণের কাছে সামাজিক মূল্যবোধ ও পারিবারিক শান্তি নিতান্ত তুচ্ছ ও বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। এঁরা অবজ্ঞা করেন নিরবচ্ছিন্ন বিবাহিত জীবনের আনন্দ, বিশুদ্ধতা, বন্ধুত্ব ও সর্বোপরি সুখানুভূতিকে। তাঁদের কাছে এগুলি নিতান্তই মূল্যহীন। বিবাহিত জীবনে দুটি প্রাণের আত্মিক ঐক্যের যে বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও স্মারকচিহ্ন অঙ্কিত হয় তাঁকে এঁরা অমান্য করেন।

২. দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। এটি দুটি হৃদয় ও আত্মার মিলন এবং একে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। বিবাহবিচ্ছেদ শব্দটিকেই মনুষ্যসমাজ থেকে বিদায় করা দরকার। যে পুরুষ ও নারী বিবাহের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তাঁদের আদর্শ হওয়া উচিত আমৃত্যু এই বন্ধনকে অটুট রাখা।

ক্যাথলিক চার্চ এই মতবাদটিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্ষা করেছিলেন এবং কোনকিছুর বিনিময়েই একে বিসর্জন দিতে সম্মত ছিলেন না।

আজকের যুগে এ আদর্শে বিশ্বাসীগণের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। একমাত্র ক্যাথলিকপন্থী ইটালি ও স্পেন ব্যতীত কোথাও এই আইন বিধিবদ্ধ নেই।

বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা চিরস্থায়িত্বের আদর্শ অবশ্যই প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। বাস্তবজীবনে দাম্পত্যসম্পর্কের স্থায়িত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু কখনও কখনও এই তুটি অতি কাছের মানুষের মনেও চিড় ধরে। কোন কোন ক্ষেত্রে একত্রে বাস করা কঠিন ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরকম ক্ষেত্রে পবিত্রতা সুরক্ষা, অবিচ্ছেদ্যতা আর আইনের কঠোরতার দোহাই দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা হাস্যকর ব্যাপার।

৩. বিবাহবন্ধনের অবসান ঘটানো কিংবা ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকারী হলেন স্বামী। কারণ স্ত্রীর পক্ষে এ ব্যাপারে বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এটিই হলো তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রাচীনকাল হতে এই বিশেষ অধিকারটি স্বামীই ভোগ করছেন, কিন্তু বর্তমানে এই মতবাদের কোন সমর্থক মিলবেনা। তাই এই মতবাদ নিয়ে কোন বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই।

৪. চতুর্থ মতবাদ হলো বিবাহ অতি পবিত্র প্রথা। পারিবারিক শান্তিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বিবাহবিচ্ছেদের আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার হয়ে পড়ে। উপরন্তু এই কানাগলি থেকে বেরিয়ে আসার পথ উভয়ের জন্য সমান হওয়া উচিত।

যাঁরা পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অধিকারের অভিন্নতাকে সমর্থন করেন এবং একেই সমানাধিকার বলে মনে করেন তাঁরা এই চতুর্থ মতবাদটি সমর্থন করেন। স্ত্রীর ক্ষেত্রে যেসব শর্ত ও সীমা প্রয়োগ করা হয় এই মতবাদের সমর্থকগণ স্বামীর ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রয়োগের কথা বলেন। তাঁরা একথাও বলেন পুরুষের ক্ষেত্রে এই কানাগলি থেকে নিষ্ক্রমণের যে সুযোগ-সুবিধা আছে সেগুলি নারীরও পাওয়া উচিৎ। নারীপুরুষের ক্ষেত্রে এই আইনগত পার্থক্যকে এঁরা নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও পক্ষপাতমূলক বলে মনে করেন।

৫. এ সম্পর্কে পঞ্চম ও সর্বশেষ মতটি হলো বিবাহ অত্যন্ত পবিত্র নৈতিক বন্ধন। সামাজিক ও পারিবারিক শান্তিকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা

দরকার। বিবাহবিচ্ছেদ অপ্রীতিকর ও ঘৃণ্য প্রথা। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ও তার পিছনে উৎসাহদানকারী সবরকম পরিস্থিতি সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা দরকার। সেইসঙ্গে যে দাম্পত্যবন্ধন কোনমতেই অটুট থাকা সম্ভব নয়, সেরকম ক্ষেত্রে তা ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে আইনের অহেতুক কড়াকড়ি থাকাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সেক্ষেত্রে এই বন্ধন থেকে মুক্তির পথ স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্য উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন। তবে পুরুষ ও নারীর সৃষ্টিগত পার্থক্যের জন্যই অধিকারের কিছুটা পার্থক্য থাকবেই।

এই শেষ মতটিই বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে ইসলাম নির্দেশিত পথ। ইসলামী দেশগুলি এই আইন অনুসরণ করে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য মতাদর্শ ও তার ফলশ্রুতি ঃ

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ বলে গণ্য হতো। তাঁদের দৃষ্টিতে বিবাহ এক আধ্যাত্মিক বন্ধন। এ বন্ধন একবার রচিত হলে নারী পুরুষ কারুরই অধিকার নেই তা ছিন্ন করার। একবার বিবাহ বন্ধনে বাঁধা পড়লে হাজার অনৈক্য, বিরোধ, তিক্ততা ঘটলেও, সংসার বিষময় হয়ে উঠলেও সে বন্ধন থেকে নির্গত হওয়ার কোন পথ নেই। এই আদর্শের প্রতিক্রিয়া এত তীব্র ছিল যে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তার বিপরীত এক আইন। দীর্ঘদিন ঐ বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে তারা এবার উল্টো মুখে চলে বিবাহ বিচ্ছেদকেই করে তুলেছেন অতি সহজসাধ্য। একটি সামাজিক সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে জন্ম দিয়েছেন আর এক সর্বনাশা বিধ্বংসী পরিণতি। বিবাহ বিচ্ছেদের অতি সহজ সরল আইন অধিকাংশ দাম্পত্যজীবনকে করে তুলেছে অস্থির-ধৈর্যহীন। স্বামী-স্ত্রীর চলার পথে সামান্যতম মতপার্থক্য ঘটলে-কিংবা অপছন্দের কিছু হলেই তাদের সামনে হাতছানি দেয় বিবাহ-বিচ্ছেদের উন্মুক্ত পাহারাহীন সিংহদুয়ার। বিবাহ বিচ্ছেদের এই অতি সহজ সরল রাজপথের হাতছানি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে

গৃহ ও পারিবারিক জীবন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে হাজার হাজার শিশুর জীবন।

রোমান ক্যাথলিকচার্চের দৃষ্টিতে বিবাহ একটি ঐশ্বরিক ব্যাপার তাই এ বন্ধন আমৃত্যু স্থায়ী। বিবাহ একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বিংশ শতাব্দীতে এসে রোমান ক্যাথলিক দেশগুলিতে রোমান ক্যাথলিক বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদকে আইনতঃ মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র সাউথ ক্যারোলিনা বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদনের বিপক্ষে দাঁড়ায়।

বিবাহ বন্ধন আমৃত্যু একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রোটেস্ট্যান্টগণ এই মতবাদ কখনও গ্রহণ করেননি। প্রোটেস্ট্যান্ট নেতৃবৃন্দ সকলেই একমত ছিলেন যে ব্যভিচারিতার ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ অবশ্যই হওয়া উচিত। তাঁদের অনেকে স্বামী-স্ত্রীর যে কোন একজনের সংসার ত্যাগ করে পলায়নকে বিবাহ বিচ্ছেদের একটি কারণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ছিলেন। প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারপন্থীদের বিবাহ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলির আইনসভাকে প্রভাবিত করে এবং আইনসভাগুলি কয়েকটি কারণের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদকে অনুমোদন দেন। ব্যভিচার ও বন্ধ্যাত্ব ছাড়াও স্বামী-স্ত্রী যে কেউ অন্যপক্ষের উপরে অত্যাচার করলে সেক্ষেত্রেও বিবাহ বিচ্ছেদকে বহু দেশ আইন সম্মত বলে মেনে নেয়। কোন কোন দেশ স্বামী স্ত্রী যে কারও কিছু দুর্ব্যবহারকেও বিবাহ বিচ্ছেদের উপযুক্ত কারণ বলে মেনে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রে যে কারও নিষ্ঠুরতা প্রমাণে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনানুগ করা হয়। তাছাড়াও আইনে বলা হয় স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের অপরাধ-মূলক কাজ ও তার ফলে প্রাপ্ত শাস্তির জন্য অপরপক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে আরও বলা হয়েছে স্ত্রীর ভরণপোষণে সক্ষম স্বামী তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা মঞ্জুর হবে। কিছু দেশের আইনে আছে স্বামী-স্ত্রী যে কেউ চাইলে অপর পক্ষের মাদকাশক্তির জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ দাবি করতে পারে। নর্থ ক্যারো-লিনার আইনে আছে যে একবছর ব্যাপী কোন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মিলনে অসম্মত হলে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী যে কারও

দ্বারা কোন অপরাধ মূলক কাজ ঘটলে অপর পক্ষ তাঁর কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ দাবি করতে পারে। স্বামী স্ত্রী যে কেউ একজন বিবাহকে তাঁর জীবনে বোঝা স্বরূপ মনে করলে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। স্বামী স্ত্রী যে কারও বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন সম্মত। যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রামক ব্যাধি, যৌন অক্ষমতা, যৌন ও অন্যান্য ব্যাধি, পাগলামি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ। আধুনিক বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে এ সবই বিবাহ বিচ্ছেদের সাধারণ কারণ হিসেবে স্বীকৃত। একমাত্র ইউরোপে ইংলিশ আইন যৌন কারণ ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদ বা বাতিল স্বীকৃত নয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল কমিশনের The Majority Report অনুমোদন করেন যে ভবিষ্যতে ব্যভিচার, তিন বৎসর বা ততোধিক কাল ইচ্ছাকৃত নিরুদ্দেশ, নিষ্ঠুরতা, নিরাময় অযোগ্য পাগলামী, মাদকাশক্তি (যা প্রথম বিচ্ছিন্নতাকালে সারানো সম্ভব হবেনা) ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনত স্বীকৃতি পাবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সই বিবাহ বিচ্ছেদকে সবচেয়ে সহজ করেছে। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে বলা হয় যে বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি মাত্র। তাই প্রত্যেকেরই বিবাহ বিচ্ছেদ করার স্বাধীন অধিকার আছে। অন্যান্য সব আধুনিক কারণগুলি ছাড়াও ফ্রান্সে স্বামী-স্ত্রীর স্বেচ্ছা বিবাহ বিচ্ছেদকেও আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এরকম ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই একটি পারিবারিক কাউন্সিলের কাছে যেতে হয়, তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ফ্রান্সের আইনের চেয়েও সহজতর। সেখানে দুজনের অথবা যে কোন একজনের স্বেচ্ছাসম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন স্বীকৃত। রেজিষ্ট্রী খাতায় বিবাহ নথিভুক্ত হওয়ার আগে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পুরুষ নারী কাউকেই কোন নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয় না। একমাত্র সন্তানসন্ততি থাকলেই বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সোভিয়েত আইন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক পন্থী ইটালি ও স্পেনে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনতঃ স্বীকৃত নয়। ইটালীর নাগরিকগণ বর্তমানে এই আদর্শের বিরুদ্ধে

মুখর হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদের আইনানুগ অধিকার চাইছেন যাতে অসুখী দাম্পত্য সম্পর্কগুলির একটা সমাধান করা যায়। ইটালির Daily Express নামক সংবাদপত্রে Marriage in Italy Slavery of Women নামক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে ইটালিতে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন স্বীকৃত না হওয়ায় বহু মানুষ অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে। এই প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে "At present more than five million Italians believe that their lives are nothing but sheer sin and illicit relationships." একই সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদের অননুমোদনই ইটালির জনসাধারণকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে চলেছে। এই একটি কারণেই বহু মানুষ ইটালির নাগরিকত্ব ত্যাগ করছেন। বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ধর্মের পরিপন্থী হবে কিনা এ সম্পর্কে ইটালির একটি সংস্থা মহিলাগণের মতামত সংগ্রহ করে। ৯৭% শতাংশ মহিলা দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু চার্চ তার স্বমতে অটল—তারা বিবাহ বন্ধনের পবিত্রতা ও চিরস্থায়ীত্বের সমর্থনে যুক্তিজাল বিস্তার করে চলেছে।

সারা বিশ্বের বিবাহ বিচ্ছেদ আইন গুলি পর্যালোচনা করে পাওয়া যাচ্ছে এককালে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোরতর বিরোধী খৃষ্টধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্ত্য জগৎ বিপরীতমুখী চরমপন্থার চোরাবালিতে নিমজ্জমান। বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বাগত জানাতে গিয়ে তাঁরা এমন তুচ্ছ কারণে বিচ্ছেদ অনুমোদন করেছেন যে দাম্পত্যজীবন পরিণত হয়েছে পুতুল খেলায়। এমনকি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা, যেখানে ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার চেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ একটু কঠোর, সেখানেও বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বর্ধমান। আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর আইন বিবাহ বিচ্ছেদের হ্রাস ঘটাবে, পারিবারিক জীবন স্থিতিশীল হবে—এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। আইনের শিথিলতাই যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। হাস্যকর কারণের উপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। কোন স্ত্রী নালিশ জানালেন তাঁর স্বামী কখনও তাঁকে গাড়ী ড্রাইভিং-এর সুযোগ দেন না, কেউ-বা নালিশ জানালেন তাঁর স্বামী দেরী করে বাড়ি ফেরেন। এসব

তুচ্ছ নালিশের ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত আইনে নারী পুরুষ উভয়কে বিবাহ বিচ্ছেদ করার সম অধিকার দান করা হয়। এই আইন স্বীকৃত হওয়ার পর সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। একটি সংখ্যাতথ্যে দেখা যায় ঐ আইনের ফলে ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর বিবাহ বিচ্ছেদ ৩৫% শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতে হিন্দু ধর্মে আজও বিবাহ একটি পবিত্র ঐশ্বরিক বন্ধন হিসেবে স্বীকৃত। বিবাহ আমৃত্যু অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু ভারতের আধুনিক সিভিল কোড বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদকে কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দান করেছেন। এই আইনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমঝোতায় Mutual Divorce সহজ। কিন্তু স্বামীর তরফে কোন সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রার্থনা করলে এবং তা মঞ্জুর হলেও স্ত্রীর সারাজীবনের ভরণপোষণের হাত থেকে মুক্তি পান না। ফলে জীবন যত বিষময় হয়ে উঠুক না কেন কোন ক্ষেত্রেই স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের মত জায়গায় যেতে পারেন না। আইনের এই জটিলতার মধ্য দিয়ে বিচ্ছেদের বদলে হাজার হাজার বধুর জীবন অকালে ঝরে যাচ্ছে কিংবা স্বামী গোপনে ব্যভিচার করছেন সাময়িক সুখের আশায়।

বিবাহ বিচ্ছেদ আজকে বিশ্বজোড়া সংকট ঃ

বিংশ শতাব্দীতে বিবাহ বিচ্ছেদ বিশ্বজোড়া সংকটের আকার ধারণ করেছে। এ বিষয়ে অভিযোগও বিচিত্র। যেখানে আইনের দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কিংবা কড়াকড়ি আছে সেখানকার মানুষের অভিযোগ, বিবাহ বিচ্ছেদের দ্বারা প্রতিকারের পথ বন্ধ বলেই বহু ব্যর্থ বিবাহ বন্ধনকে জোর করে টিকিয়ে রাখতে হয়। ফলে এ অবস্থায় বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে জীবনসংহার করতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর অমোঘ নিয়মের অনুশাসনই কার্যকরী হচ্ছে অর্থাৎ অধিক ক্ষমতাশালী অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাশালী বা দুর্বলকে হত্যা করে মুক্তির পথ খুঁজছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে তো বিবাহ দায় থেকে মুক্ত হতে অহরহ বধূ হত্যা চলছে। বর্তমানে বধূ হত্যা আমাদের জাতীয় সমস্যার আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদের

দুয়ার নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে মুক্ত সেখানে আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে ; পারিবারিক বন্ধনের অনিশ্চয়তা নিয়ে জমছে অভিযোগের পাহাড়। সমাজ জীবনে দেখা দিচ্ছে অবাধ বিচ্ছেদের অশুভ প্রভাব—নানান অস্বাস্থ্যকর উপসর্গ।

ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদকে সর্বাধিক ঘৃণ্য করে একটি বাঁধনের মধ্যে ছাড়পত্র দিয়েছে। তবুও ইসলামের মূল আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হতে হয় বহু নারীকে। দীর্ঘদিন দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করে, জীবনের অমূল্য ও সুন্দর সময়টা যে ব্যক্তির জন্য ব্যয় করেছেন তাঁর কাছে হয়ে ওঠেন আপাংক্তেয়। যে সংসারটি পরম মমতায় সাজিয়ে তুলেছিলেন সেটিকে তাঁর হাত থেকে অকস্মাৎই ছিনিয়ে নেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর জীবন থেকে সব নির্ভরতার অবসান ঘটে। এক চরম হতাশাময় অন্ধকার ভবিষ্যতে তিনি নিক্ষিপ্ত হন। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের চারিত্রিক পদস্খলনও এই অনর্থের কারণ হয়। অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ তাঁকে অমানুষ ও উচ্ছৃঙ্খল করে দেয়।

দ্বিতীয় অমানবিক কাজটি ঘটে বিবাহবিচ্ছেদ না ঘটানোর মধ্য দিয়ে। অনেক সময় দেখা যায় কারও দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কোনভাবেই যৌথ জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু স্বামীরই বিবাহবিচ্ছেদ করার অধিকার আছে স্ত্রীর নেই—এই প্রচলিত ধারণার সুযোগ নিয়ে স্ত্রীকে মুক্তি না দিয়ে অকারণে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। অজ্ঞ মুসলমান সমাজে এই দুধরনের ধারণাই প্রচলিত। বিশেষতঃ অর্থনৈতিক কারণে সমাজের যে স্তরে অহরহ দাম্পত্য কলহ বিদ্যমান, সেখানে পুরুষ অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে অত্যাচারের খড়গহস্ত প্রসারিত রেখেছে এবং নারীও অনুরূপ ধারণাকে ঠিক জেনে চরম অত্যাচারে নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি ক্ষেত্র ও উপযোগ অনুসারে স্বস্ব ক্ষেত্রে নারীপুরুষ উভয়েরই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার ইসলামে স্বীকৃত।

কোন কোন বিশেষ কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তাদের মধ্যে পুনরায় সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠার আশা আর থাকে না। পুনর্মিলনের সব প্রচেষ্টাই বিফল হয় ; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক গভীর তিক্ততা জন্ম

নেয় ; তারা পৃথকভাবে বসবাস করে এবং বাস্তবে তাদের একে অপরকে কিছু দেওয়ার থাকে না। এরকম পরিস্থিতিতে যে কোন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একমত হবেন যে যেখানে দাম্পত্য সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই সেখানে আইনসম্মত বিচ্ছেদই কাম্য। তাহলে উভয়েই নূতনভাবে জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তবুও কিছু মানুষ ইসলামী বিধানের অপপ্রয়োগ করে স্ত্রীর মুক্তিদানে বিরত থাকেন।

এই ধরনের ব্যক্তিগণ প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিধান ও আদর্শ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। নামেমাত্র তাঁরা মুসলমান। ইসলামের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও তাঁরা এ ধরনের কাজ করেন ইসলামের দোহাই দিয়ে। ফলে সমাজে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত চেতনা, সত্যই ইসলাম বিবাহবিচ্ছেদ এভাবে প্রয়োগ করেছে কিনা তা জনসমক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকছে। আজকের দিনে সমাজে কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক কারণে ঘটা অনর্থগুলোকেই ইসলামের নিয়ম বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু এদেশের সর্বস্তরের বঞ্চনার ফলে যেসকল মুসলনান অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত, যারা অশিক্ষা, কুশিক্ষার শিকার হয়ে মনুষ্যরূপী পশুত্বের জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতিকেই ইসলাম ধর্মের বিধান বলে তুলে ধরে আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত-অজ্ঞ ও চতুর মানুষ গোটা মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন ; সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চালাচ্ছেন ইসলামী বিধানটা বদলে দেওয়ার।

ইসলামী বিধান সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল নন তাঁরাই বলেন ইসলাম যথেচ্ছ বিবাহবিচ্ছেদ করা, আবার প্রয়োজনে না করে স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেওয়ার ছাড়পত্র স্বামী অর্থাৎ পুরুষের হাতে তুলে দিয়েছে। এই কারণে মুসলমান সমাজে নারীজীবন এক অন্ধকারময় পরিবেশে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে। মুসলমান সমাজে যাঁরা এমন আচরণ করেন তাঁরা আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগেন যে সম্পূর্ণ সঠিক পথে তাঁদের ধর্মীয় ও আইনগত অধিকার প্রয়োগ করেন। স্বাভাবিক কারণে প্রতিবাদ উঠছে। যাঁরা ইসলামের মূল আদর্শ সম্পর্কে খোঁজ রাখেন তারা প্রশ্ন তোলেন ইসলাম সকলরকম অবিচারের বিরুদ্ধে এবং ইসলামের বিধান সত্যবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলে এই অবিচারের

বিরুদ্ধে কোথায় ইসলাম প্রতিরোধ তৈরী করেছে? পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখা গেছে এই আচরণ আদৌ ইসলামী বিধান নয়। ইসলাম এই নৃশংসতাকে কোন অবস্থাতেই স্বীকৃতি দেয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষিত জনসমাজের এক বিরাট অংশের ইসলামী বিধান সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাই এরকম অন্যায় নৃশংসতাকে ইসলামের নামে চালাতে সাহায্য করেছে।

অধুনা ভারতীয় প্রগতিশীল (!) শিক্ষিত জনসমাজ মনে করছেন ইসলামী বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়েই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু ইসলাম যখন এরকম কোন একপেশে বিধান রচনা করেনি, নারীপুরুষ উভয়কেই শর্তসাপেক্ষে সব অধিকার দান করেছে তখন তার পরিবর্তন কেন—যথাযথ প্রয়োগই তো এই নৃশংসতার অবসান ঘটাতে পারে। তাই সংকীর্ণতা ছেড়ে উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থরক্ষার যত চিন্তা আধুনিক আইনে করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী মঙ্গলময় ইসলামী আইন। ইসলাম এমন কোন একপেশে বিধান রচনা করেনি যে তা কোন যুগে পৌঁছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে—আজ পর্যন্ত হয়ওনি। কাজেই সর্বযুগ ও সকল সমাজে সমান ফলপ্রসূ এই আইনের পরিবর্তন নয়—এর যথার্থ প্রয়োগের প্রতি সবার সজাগ দৃষ্টি রাখাই মূল লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহবিচ্ছেদ অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অপ্রিয়। ইসলাম সুদৃঢ় ও অবিচ্ছেদ্য দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দান করে—পথনির্দেশ দেয়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ইসলাম বিবাহবিচ্ছেদকে এত অপ্রিয় ও ঘৃণ্য বলে মনে করলে তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি কেন। মদ্যপান, জুয়াখেলা, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি, ব্যভিচার ইত্যাদিকে তো ইসলাম কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিবাহবিচ্ছেদকে সেভাবে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি। একে আইনসঙ্গত রেখে অপ্রিয় ঘোষণা করার পিছনে কি যুক্তি আছে। একদিকে ইসলাম যে ব্যক্তি স্ত্রীবর্জন করে তার প্রতি ভ্রূকুটি হেনেছে, ঘৃণা প্রদর্শন করেছে, অন্যদিকে সে যখন স্ত্রীবর্জন করতে চায় তখন তার বিরুদ্ধে কোন আইনের বাধার প্রাচীর তোলেনি।

অত্যন্ত সুসঙ্গত ও যথার্থ প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই রয়েছে ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি—যা সর্বযুগের জন্য উপযোগী ও বাস্তবসম্মত। ইসলামের সেই কল্যাণময় আদর্শ ও পন্থা বিশ্লেষণ করে দেখার উদার মানসিকতা এদেশে তৈরী হয়নি। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যে সংস্কৃতির বীজ এদেশে রোপিত হয়ে এখানকার মৃত্তিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় বিস্তার করেছে· আজও তার সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রমাণে কি দারুণ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তথাকথিত শিক্ষিত মুসলমানগণও এ অজ্ঞতাকে নিজের পক্ষে প্রগতিশীলতার সার্টিফিকেট হিসেবে ব্যবহার করেন। আর ঠিক এই কারণেই ইসলামের কল্যাণকর প্রথাগুলিকে বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সমস্ত তর্কবিতর্কের উর্ধ্বে স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে দাম্পত্য সম্পর্ক কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মসূচী কিংবা চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারেনা। দাম্পত্যসম্পর্ক গড়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির উপর ভিত্তি করে। বিশেষ আইনের উপর ভিত্তি করে এর বহিরঙ্গীন কাঠামোকে রূপ দেওয়া যায় মাত্র,: অন্তর্নিহিত দিক থেকে অন্যসকল সামাজিক চুক্তির সঙ্গে বিবাহের চুক্তির আকাশপাতাল তফাৎ। পৃথিবীতে এমন কোন আইন নেই যা মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত হৃদয়ানুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দুটি মানুষের হৃদয়ের বন্ধনকে কতকগুলি যান্ত্রিক চুক্তির ভিত্তিতে রচনা করা সম্ভব নয়। তাই বিবাহচুক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম দিক আছে যা অন্য কোন চুক্তির মধ্যে নেই। বিবাহ সেজন্যই আকস্মিকভাবে স্থির হওয়া অনুচিত। অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে যে কোন বিবাহ স্থির করা উচিত।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে প্রাকৃতিক বিধানের ভিত্তি হলো স্বাধীনতা ও সাম্য। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে নিয়মকানুন তৈরী হোক না কেন তা হওয়া উচিত স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে। বিবাহ বন্ধনের মধ্যে এই স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ প্রকাশমান। তবে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থে ব্যঞ্জনাময়। বিবাহের মত বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যেও প্রকৃতি দত্ত বিধান নিহিত রয়েছে। দাম্পত্য-জীবনের প্রাকৃতিক বিধানকে যেমন সুচিন্তিত ভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন তেমনি বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত পরিস্থিতিকেও সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ইসলামে বিবাহ আর বিবাহ বিচ্ছেদ

কোনটাতেই ধর্মাধর্মের সম্পর্ক নেই বরং সেখানে প্রকৃতি প্রদত্ত ন্যায়ানুগ প্রয়োগ পদ্ধতিই মুখ্য। আর এই প্রকৃতিগত সামাজিক ন্যায়াচরণই ইসলামের ধর্মাচরণের মূল ভিত্তি।

বিবাহের অর্থ দুটি প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে জীবনে একটা ঐক্যতান সৃষ্টি। আর বিবাহ বিচ্ছেদ অর্থ ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতা। নরনারীর যৌথজীবনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি এক বিস্ময়কর সম্পর্ক স্থাপন করেছে। প্রকৃতি সৃষ্টি লগ্নেই একজনের মধ্যে জন্ম দিয়েছে কর্তৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা, অন্য জনের মধ্যে জন্ম দিয়েছে সৌন্দর্য ও মোহময়তার কাছে নিজেকে ঐকান্তিক ভাবে সমর্পণ করার আকাঙ্ক্ষা। এক পক্ষের অনুভূতির উৎস হলো একটি ব্যক্তিত্বকে পাওয়া, অন্যপক্ষের অনুভূতির ভিত্তি হলো একজনের হৃদয় জয় করা। প্রকৃতি বিবাহের ভিত রচনা করেছিল একতা বোধ ও সহমর্মিতা বোধের উপরে—উভয়ের দৈনন্দিন কর্মের সমঝোতার ভিত্তিতে নয়। একটি পরিবার গড়ে ওঠে কোমল ও সুন্দর অর্থাৎ স্ত্রী ও মাতাকে কেন্দ্র করে। আর তা পরিভ্রমণ করে একটি শক্ত ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ পিতার চতুর্দিকে। এইরকম একটি সুসমঞ্জস সংগঠনের মধ্যে যখন অনৈক্য, বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন আসে তখনও প্রয়োজন একটি সুসমঞ্জস পদ্ধতির অনুসরণ। বিশেষ করে যেখানে মানবিক জীবন জড়িত—বস্তু নয়। আর যে মানবিক সম্পর্ক-গুলির মূল কেন্দ্র তাকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

যে সম্পর্ক ভালোবাসা ও সহমর্মিতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে—কাজের বণ্টনের ভিত্তিতে নয়—সেখানে বলপ্রয়োগে কাউকে কিছুতে বাধ্য করা যায় না। নিয়মকানুন প্রয়োগ করে দুজন মানুষকে কাজের ভিত্তিতে সহকর্মীরূপে বাঁধা যায়। দুজন সহকর্মী জানে তাদের সম্পর্ক যৌথ কর্মের উপর নির্ভরশীল। কাজেই তাদের কাজের প্রতি সততাই কাম্য। সেখানে সমাদর যোগ্যতার। তাই কর্মভিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ বহুদিন একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু দুজন ব্যক্তিকে কোনমতেই একে অপরকে ভালোবাসতে বা একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হতেবাধ্য করা সম্ভব নয়। আইনের জোরে পরস্পরের সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ করা যেতে পারে কিন্তু সুখদুঃখে সমব্যথী করা সম্ভব নয়।

বিবাহের প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করেই ইসলামের বিবাহ সম্পর্কিত আইন গড়ে উঠেছে। ইসলাম মনে করে নারীর ভূমিকা এমন হবে যাতে সে পরিবারে ভালোবাসা ও সম্মান অর্জন করবে। সুতরাং কোন কারণে স্ত্রী যদি সে স্থান থেকে বিচ্যুত হয় এবং স্বামীর ভালোবাসা, আন্তরিকতা নির্বাপিত হয়, স্ত্রীর প্রতি স্বামী স্নেহমমতার অনুভব হারিয়ে ফেলেন তাহলে পরিবারের ভিত ও প্রধান খুঁটিটাই ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যভাবে বলা যায় প্রকৃতি-রচিত একটি সামাজিক সম্পর্ক প্রাকৃতিক কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এরকম ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু একবার যদি বিবাহ-সম্পর্কের প্রকৃতিদত্ত ভিতটিতে ধ্বংসের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—তখন ইসলাম তাকে জিইয়ে রাখার কথা চিন্তাও করে না। তাই কৃত্রিমভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইসলাম কোন আইনের বিধান তৈরী করেনি। পারিবারিক জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্য ইসলাম কতকগুলো নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। ইসলাম নারীর নিজেকে ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলাম নারীকে স্বামীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করতে উপদেশ দিয়েছে। নিজের অন্তর্নিহিত গুণরাশি দ্বারা স্বামীর প্রেরণাদাত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ইসলামের ধর্মাচারণের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম নারীর কল্যাণময়ী রূপের বন্দনা করে এবং মনে করে প্রত্যাখ্যান নয় আকর্ষণ দ্বারা ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া যায়। আর তাতেই রচিত হয় একটুকু শান্তির নীড়। সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর প্রতি স্নেহশীল, মমতাময় হতে এবং ন্যায়নিষ্ঠ ও কোমল আচরণ করতে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বামীকে হতে হবে মুখর। ইসলাম স্বামী স্ত্রীর সকল আমোদ প্রমোদ পরিবার ও সামাজিক সুশৃঙ্খল আচরণের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখায় বিশ্বাসী। ইসলাম মনে করে বহু জনসমাবেশ কাজকর্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য তা উপযুক্ত নয়। এই আদর্শকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ইসলামের পরিবার সম্পর্কিত সুপারিশ বা মতামত। এই জন্যই ইসলামে বিবাহের বহিরঙ্গ কাঠামোটা হলো সম্পূর্ণভাবে একজন পুরুষের সঙ্গে

একজন নারীর ন্যায়-ভিত্তিক সামাজিক চুক্তি। তাদের পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করার মধ্যেই সুপ্ত থাকে পরিবারের অন্তর্নিহিত প্রেমসম্পদ। বিবাহের এই শর্তটির প্রয়োজনীয়তা সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে। নৈতিক ভাবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে তোলে সুস্থতা, পলায়ন মনোবৃত্তি নয়। কিন্তু এই সবকিছুই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব যদি সমাজের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ পরিবারকে পাহারা দেওয়া ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার একান্ত ইচ্ছা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য মানুষের থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর ও পুরুষের সবচেয়ে বড় অসম্মান স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা থেকে বিচ্যুতি। তাদের সবচেয়ে বড় অপমান কোনকারণে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া। এরকম পরিস্থিতিতে স্বামীর আশ্রয় ও অন্নগ্রহণ যে কোন নারীর জীবনে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। আইন ঐ ব্যক্তিকে বাড়ীতে স্ত্রীকে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু আইন দ্বারা কোনভাবেই তাদের স্বাভাবিক অবস্থান, দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। স্ত্রীর বস্তু প্রাপ্য যথা ভরণপোষণ বা আশ্রয়ের অধিকারের সুরক্ষা করার ক্ষমতা আইনের আছে কিন্তু এমন ক্ষমতা নেই যে স্বামীকে ভালোবাসায় উৎসাহিত করে স্ত্রীকে কেন্দ্র করে যে সাংসারিক পরিমণ্ডল তৈরী হয়েছিল তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

অতএব প্রেমপ্রীতির উদ্দাম শিখা যখন উভয়ের হৃদয় থেকে নির্বাপিত হয় তখন বিবাহ মিলনের প্রকৃতিদত্ত রূপটি আর বজায় থাকেনা—থাকা সম্ভব নয়।

আর একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক যে স্ত্রীর মন থেকে যদি ভালোবাসা ও দাম্পত্য জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষার নির্বাসন ঘটে তাহলে কি হবে। তখন কি পারিবারিক জীবনের স্রোতধারা থাকবে, না থাকবেনা। যদি অব্যাহত থাকে তাহলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্থানগত কি পার্থক্য যে পুরুষের ঔদাসীন্য ও বীতরাগ বিভেদ আনতে পারে। পারিবারিক ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। অথচ নারীর বীতরাগ পরিবার ভাঙনের কারণ হবে না। যদি তা হয় অর্থাৎ স্ত্রীর উষ্ণ ভালোবাসার নির্বাপন পরিবারের ভাঙন ডেকে আনে এবং যদি স্ত্রী স্বামীর প্রতি তার বীতরাগ ঘোষণা করে তখন কি বিবাহিত সম্পর্কের

সমাপ্তি ঘোষণা বিবেচনাযোগ্য? সেক্ষেত্রে স্ত্রীকেও কি বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দান করা হবে?

পারিবারিক জীবন নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রী উভয়পক্ষের মমতার উপরে—একজনের নয়। কিন্তু নারীপুরুষের মানসিকতার গঠন ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রাকৃতিক নিয়মেই নারীর ভালোবাসা ও মমতা অত্যন্ত চাপা ও স্থায়ী। কিন্তু তা জন্মায় তার প্রতি পুরুষের প্রেমপ্রীতি, আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার ফলশ্রুতি হিসেবে। অতএব নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণের ফলশ্রুতি হলো পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ। দুপক্ষের ভালোবাসার চাবিকাঠিই প্রকৃতি দিয়েছে পুরুষের, অর্থাৎ স্বামীর হাতে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ভালবাসে ও তার প্রতি বিশ্বস্ত হয় তাহলে স্ত্রী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীকে ভালবাসে ও তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। এটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে নারী তার প্রকৃতি অনুযায়ী পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী আকৃষ্ট করার অধিকারী এবং নারীর আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ আসলে পুরুষের বিশ্বস্ততারই ফলশ্রুতি।

প্রকৃতি বিবাহের স্বাভাবিক সমাপ্তি ঘটানোর চাবিকাঠি পুরুষের হাতে অর্পণ করেছিল। অন্যকথায় বলা যায় পুরুষ স্ত্রীর প্রতি তার বীতরাগ ও অবহেলার দ্বারা স্ত্রীকে অবিশ্বস্ত ও শীতল করে তোলে। অপর দিকে স্ত্রীর দিক থেকে ঔদাসীন্য শুরু হলে তা স্বামীর ভালোবাসা ও মমতাকে শুধু আক্রান্ত করেনা বরং চরম অশান্তির কারণ বর্ধিত করে। সুতরাং পুরুষের ওদাসীন্য উভয় তরফের ঔদাসীন্য সৃষ্টি করে কিন্তু নারীর ঔদাসীন্য দুতরফেই একই রকম প্রভাব ফেলতে পারে না। পুরুষের ভালোবাসার নির্বাসন বিবাহের মৃত্যু ডেকে আনে, ডেকে আনে পারিবারিক জীবনের সমাপ্তি। কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উদাসীনতা কিংবা বীতরাগ সংসারকে অর্ধমৃত করে তুললেও পুনর্জীবনের আশা থাকে। স্ত্রীর দিক থেকে বীতরাগ শুরু হলে স্বামী যদি বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত হন তাহলে তিনি ভালোবাসা ও মমতার স্পর্শে স্ত্রীর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। আর স্ত্রীর ভালোবাসাকে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনার জন্য আইনের জোরে কিছুদিন দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করার মধ্যে স্বামীর

কোন অপমান নেই। কিন্তু একজন মহিলার পক্ষে স্বামীর ভালোবাসা পুনরুদ্ধারের জন্য আইনের বলপ্রয়োগ কিংবা নিজের জন্য সমর্থক ইত্যাদির আয়োজন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অপমানকর। স্ত্রীর বীতরাগ জন্মানোর পিছনে স্বামীর নিষ্ঠুরতা কিংবা নীতিহীনতা নয় যদি অন্যতর কোন কারণ বর্তমান থাকে সেক্ষেত্রেই এ ধরনের প্রতিষেধক কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি অত্যাচারী হন এবং স্বামীর অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় অতিষ্ট হয়ে স্ত্রী বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন—সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করা দরকার। অমানবিকভাবে কেউ কেউ বিবাহ বিচ্ছেদ করা থেকে বিরত থাকেন। অত্যাচার ও নিষ্ঠুর পীড়ন চালানোর জন্যই সেক্ষেত্রে স্বামীরা স্ত্রীকে জোরপূর্বক আটকে রাখেন। নিশ্চয়ই এই নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধের জন্য স্ত্রীদের আইনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

সংক্ষেপে বলা যায় নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য হলো পুরুষের প্রয়োজন মমতাময়ী নারীকে, নারীর প্রয়োজন পুরুষের প্রেমপূর্ণ হৃদয়, ভালোবাসা। স্বামীর মমতাময় সহায়তা নারী জীবনে এত বেশী মূল্যবান যে বিবাহ ব্যতীত তার জীবন হয়ে ওঠে চরম একাকীত্বে পূর্ণ। অন্যদিকে নারীর কল্যাণময়ী স্পর্শ ব্যতীত পুরুষের জীবন পরিণত হয় রুক্ষ কঠোর মরুভূমিতে।

পরিবার গড়ে ওঠে স্নেহ-মমতার অনুভবে ঃ

আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে হবে সহানুভূতি, একাত্মতা, সহযোগিতা, মমতাকে ভিত্তি করে যে সম্পর্ক তৈরী হয়—সকল রকম ঝড় ঝঞ্ঝাকে মেনে নেওয়ার, তার সঙ্গে লড়াই করার মত শক্তি দান করে যে মমতা পূর্ণ আচরণ তার গুরুত্ব অপরিসীম। পিতামাতার যৌথজীবনের প্রেম-প্রীতি ভালোবাসাই সঞ্চারিত হয় মায়ের মাধ্যমে সন্তানদের মধ্যে। কেবল মাত্র আইন প্রয়োগে এই সম্পর্ক কি গড়ে তোলা যায়?

ইসলাম খণ্ডিত নয় একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান রচনা করেছে। ইসলাম মানুষের প্রতিটি আচরণ বিধি তৈরী করে দিয়েছে। তাই ইসলাম পুরুষকে নির্দেশ দান করেছে প্রকৃত অর্থে স্ত্রীকে ভালবাসতে, তার সর্বপ্রকার সুখসুবি-

ধার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে কোন ফাটল ধরলে আইনের শাসনে বেঁধে রাখার মত অযৌক্তিক বিধান রচনা করেনি।

সাধারণ নিয়মে যেখানে হৃদয়, আত্মত্যাগ, আন্তরিকতার প্রাধান্য—সেখানে আইনের শক্তির স্থান কোথায়? পারিবারিক কর্তব্য ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্যের মতই মূল্যবান। ইসলাম পরিবারকে সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে দেখে তাই পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সে রচনা করেছে এক অভূতপূর্ব নিয়মকানুন।

পাশ্চাত্ত্য ধ্যানধারণায় পুষ্ট আমাদের সমাজে একদিকে পুরুষের জন্য অনুমতিযোগ্য এমন উত্তেজক পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যাতে সহজেই নিজ সংসার সর্বোপরি স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠতা ও আকর্ষণ নষ্ট হয়। অন্যদিকে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীর ওপর আইনপ্রয়োগের কথা বলা হচ্ছে। ইসলাম এরকম পারম্পর্যহীন সমাধানের বিধান দেয়নি। ইসলাম রচনা করেছে অত্যন্ত ভারসাম্যমূলক জীবনবিধান। জীবন-সমস্যার সমাধান করেছে জীবনবিচ্ছিন্নতার বোধ থেকে নয় জীবনঘনিষ্টতার বোধ থেকে।

ইসলাম পারিবারিক জীবনে সুস্থতা ও শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে আপোষহীন। মানবিক সম্পর্কের জটিলতাগুলি ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পর্যালোচনা করেছে, যা পাশ্চাত্ত্য মানসিকতায় একেবারেই অনুপস্থিত। সাম্য ও স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করতে গিয়ে তাঁরা পারিবারিক জীবনের স্নেহমায়া, মমতা, প্রেমভালোবাসাকে একেবারে অস্বীকার করেছেন। মানবিক সম্পর্কগুলির প্রতি অজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাহীনতা পাশ্চাত্ত্য জগতে জন্ম দিয়ে চলেছে নিত্য নতুন জটিলতা।

আসলে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তির শক্তি সমতা নয়, ভালোবাসা। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ও তথাকথিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নারীস্বাধীনতার নেত্রীগণ মুক্তকণ্ঠে পারিবারিক ক্ষেত্রেও সাম্যবাদের জয়ধ্বনি করেন। তাঁরা খবরও রাখেননা চৌদ্দ শতবছর আগে পৃথিবীতে কি অভূতপূর্ব সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিল ইসলাম। বর্তমানের নারী স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলনকারীগণ পরিবারের শান্ত নীড়ে স্বাধীনতা আর সাম্যের ঝড় তুলেছেন। সে আন্দোলনের ঝড়ে আজ সুখী

সংসারের ছোট্ট নীড় ছিন্নভিন্ন। আর তার ফলে নীড়হারা, ছন্নছাড়া হতভাগ্য সন্তানের হাহাকারে পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ার আকাশবাতাস দীর্ণ। ইসলাম চিন্তা ও বুদ্ধির আলোকের এই দীনতা দেখায়নি। সুস্থ সমাজ গড়তে, বলিষ্ঠ জাতি গড়তে ইসলাম পরিবারের ছত্রছায়াকে চোখের মণির মত লালন করার জন্য জীবনাচরণ রচনা করেছে। পারিবারিক বন্ধনে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যা সাম্যবাদের অনেক উর্ধ্বে। পরিবার ও পরিবারের মানুষদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একমাত্র সাম্যের আইন যথেষ্ট নয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্য শব্দটি অতি ব্যবহারে তার অন্তর্নিহিত অর্থ হারিয়ে বসেছে। বর্তমানে অধিকাংশেরই ধারণায় সাম্যের অর্থ—অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য। অধিকার ও দায়িত্ব যে পরস্পর নির্ভরশীল—তাদের সম্পর্ক যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা তাঁরা ভুলে যান। তাঁরা মনে করেন অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই তাঁদের কর্তব্য শেষ। অতীতে পুরুষগণ নারীদের প্রতারণা করত। তাই তাঁরা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জোরদার আন্দোলন করছেন। এই আধুনিক সমাজ-আন্দোলনে নারীর অধিকার প্রাপ্তি কতটা ঘটেছে জানিনা। কিন্তু বর্তমানে নারীও পুরুষকে প্রতারণা করছে। এ যেন এক ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠাই হয়েছে। প্রতারণার অবসান নয় প্রতারণার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট। অতীতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতো দশ শতাংশ এবং সেগুলির অধিকাংশ ঘটত পুরুষ দ্বারা। বর্তমানে কোন কোন দেশে বিবাহবিচ্ছেদের হার ৪০% পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এর প্রায় অর্ধেক ঘটে স্ত্রীর পক্ষের আর্জিতে। ভারতের সিভিল কোড অনুসারে পুরুষ কোন অভিযোগের ভিত্তিতে সহজে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারেন না। করতে পারলেও তাঁকে প্রাক্তন স্ত্রীকে খোরপোশ দেওয়ার বিরাট অর্থনৈতিক বোঝা, প্রয়োজনে সারাজীবন বহন করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই পুরুষের পক্ষ থেকে সাধারণতঃ বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন ওঠেনা। স্ত্রীর সম্মতি থাকলে অবশ্য বিবাহবিচ্ছেদ ভারতীয় সিভিল কোড অনুসারে খুবই সহজ। ভারতে বিবাহবিচ্ছেদের এই সহজতম পথটিই অনুসৃত হয়। অর্থাৎ আদালতে স্ত্রীরা বিবাহবিচ্ছেদের প্রার্থনা করেন অথবা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ-উদ্যোগে আপোষরফার মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এই দুই ক্ষেত্রে স্বামীকে

বিবাহবিচ্ছেদ করার অপরাধে কোন অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহন করতে হয়না। বর্তমানে স্ত্রীর হাতেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষমতা আসায় তথাকথিত সাম্যবাদীগণ উল্লসিত। এতদিন পুরুষই ছিল বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক—তারা ছিল অত্যাচারী নিষ্ঠুর। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানে নারীরাও একই পথের পথিক। তারাও বিশ্বাসভঙ্গ করে—তাদের মধ্যে সততা একাত্মতার ক্রমাবনতি ঘটছে। এর চেয়ে শুভ কি হতে পারে! দীর্ঘজীবি হোক সাম্য! ধ্বংস হোক অসাম্য! আগে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানের পিতা হয়েও পুরুষ স্ত্রী সন্তান বিসর্জন দিয়ে নূতন প্রেমের সন্ধানে ছুটত। বর্তমানে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের পরেও দীর্ঘদিন স্বামীসন্তানসহ একত্র বসবাস করার পরেও নারী নিজ হাতে গড়া সংসার নীড়কে পরিত্যাগ করে নূতন কোন মোহে ছুটে চলে। সে মোহ হতে পারে ব্যক্তিস্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা অথবা অন্য কোন মোহ। আপন সন্তানের চেয়েও নিজ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ও স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা তাদের কাছে অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে নারীপুরুষ আজ একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে একীভূত।

অসংখ্য সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার, নারী পুরুষের চারিত্রিক দুর্বলতার সংস্কার ও পারিবারিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে আমরা আধুনিক প্রজন্ম তাকে ধ্বংস ও নড়বড়ে করার পথে দ্রুত নিয়ে চলেছি। আর তারপরেও আমরা আহ্লাদে চিৎকার করছি, উল্লাসে ফেটে পড়ছি,, আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছি যে আমরা সাম্যের পথে অগ্রগামী। হয়ত সেদিন দূরবর্তী নয় যেদিন নৈতিক অবনতি, দুর্নীতিপরায়ণতা, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষকে নারী অচিরেই পরাজিত করবে।

এই অসংখ্য জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় বলেই ইসলাম বিবাহবিচ্ছেদকে অপ্রিয় ও ঘৃণ্য ঘোষণা করেও নিষিদ্ধ করেনি।

পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিতে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি। স্পষ্টভাবে এই বক্তব্য রাখতে সক্ষম হয়েছি যে পরিবারের ধ্বংস ও বিবাহবিচ্ছেদের তীব্র বিরোধিতা করেছে ইসলাম। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে "যে ব্যক্তি বিবাহবিচ্ছেদ করে সে আল্লাহ্‌র শত্রু।" আর তাই পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ইসলাম বহু

ধরনের নৈতিক ও সামাজিক সতর্কতামূলক আচরণবিধি রচনা করেছে। ইসলাম বিবাহবিচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য পুরুষের উপর আইনগত অস্ত্র ও শক্তি প্রয়োগ করেনি ঠিকই। কিন্তু অন্যান্য প্রত্যেকটি মাধ্যম ও প্রত্যেকটি অস্ত্র প্রয়োগ করেছে বিবাহবিচ্ছেদকে প্রতিরোধ করতে।

ইসলাম স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদ থেকে সংযত করার জন্য ও স্বামীগৃহে স্ত্রীর স্থানকে চিরস্থায়ী করতে আইনের আশ্রয় নেওয়ার প্রবল বিরোধী। কারণ ইসলাম স্বামীগৃহে স্ত্রীর যে মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার কথা বারবার বলেছে—সেই মর্যাদাময় আসনের অধিষ্ঠাত্রীর জন্য এটা অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত। গৃহজীবনের প্রধান শক্তি হলো মমতা-ভালোবাসার অনুভূতি। সংসারের মধ্যে আবর্তিত ভালোবাসা মায়ামমতার গ্রহীতা ও মূল কেন্দ্র হলো নারী। নারীর মাধ্যমেই সেই মমতার বোধ সঞ্চারিত হয় সন্তানগণের মধ্যে। স্বামীর নিরুত্তাপ আচরণ ও বীতরাগ পারিবারিক পরিবেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নিরানন্দ করে তোলে। নারী যে ভালোবাসা পায় মাতৃত্বের মাধ্যমে তারই প্রভাব পড়ে সন্তানের মধ্যে। মা হিসেবে সন্তানের প্রতি বাৎসল্য নিয়ন্ত্রিত হয় স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালোবাসা দ্বারা।

স্বামীর প্রেম প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করলেই একজন নারী সক্ষম হন সন্তানদের অনির্বচনীয় স্নেহ ভালোবাসায় পূর্ণ করে দিতে। সন্তানসন্ততি পিতামাতার কাছে ছোট চারার মত। পিতা অসীম জলধি। মাতা তাঁর কাছ হতে স্নেহভালোবাসা আহরণ করে তা বর্ষণ করেন সন্তানরূপ চারাগাছের উপর। ধরিত্রী সুজলাসুফলা হওয়ার জন্য যেমন প্রয়োজন বর্ষণ তেমনি পরিবারের জীবন ফুল্লরিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রগাঢ় প্রেমপ্রীতি, স্নেহমমতা। ভুললে চলবেনা মাতার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান হয়ে ওঠে নির্মল, উজ্জ্বল, সমৃদ্ধ। যেখানে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুভূতি ও ভালোবাসার স্থান এত মূল্যবান, যা পারিবারিক জীবনে এক বিশেষ চেতনার উন্মেষ ঘটায়—সে সম্পর্ক আইনের আশ্রয়ে টিকিয়ে রাখার সার্থকতা কোথায়। প্রয়োজনই বা কি।

ইসলাম অমানবিক বিবাহবিচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিরোধী। একজন পুরুষ যদি স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন দাম্পত্যজীবনযাপন করেও, স্ত্রী হিসাবে আর একজন নুতন

নারীর সন্ধান করেন কিংবা অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে পূর্বতন স্ত্রীকে বিতাড়িত করেন—তখন তা হয় অমানবিকতার চূড়ান্ত। তথাপি ইসলাম এর প্রতিষেধক হিসাবে কোন অমানুষ স্বামীর উপর স্ত্রীকে গৃহে রাখার ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করার বিধান দেয়নি। ইসলাম মনে করে পারিবারিক জীবনে অবশ্যকাম্য স্বাভাবিকতার জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত অসঙ্গত।

আইন ও প্রশাসনের বলে কোন স্ত্রী স্বামীগৃহে নিজ অবস্থান কায়েম রাখতে পারলে তাঁর ভরণপোষণের ও আশ্রয়ের অভাবই মেটে—কিন্তু মর্যাদার আসনটি পেতে পারেন না। স্বামীর ভালোবাসাশূন্য যন্ত্রণা নিয়ে সন্তানসন্ততির জীবনকে পরিপূর্ণ করাও সম্ভব হয় না।

ইসলাম কোন অত্যাচারকেই সমর্থন করেনি। নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারও নয়। ইসলাম পুরুষকে উপদেশ দিয়েছে 'স্ত্রীদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও স্নেহভালবাসাপূর্ণ আচরণ করতে।' তথাপি ইসলাম বিধান দেয়নি, যে নারী পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু—সম্মানের আসনে যে মহিমাময়ী, স্নেহভালবাসা সঞ্চারিত করার মাধ্যম, এমন নারীর আসন আইনের জোরে এক অবিবেচক, অপদার্থ পুরুষের গৃহে স্থায়ী করতে হবে।

তথাকথিত প্রগতিবাদীগণ যা করেন ইসলাম ঠিক তার উল্টোটা করেছে। ইসলাম কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলার উৎসগুলির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেছে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ মানুষের সঙ্গে বসবাস করার জন্য বলপ্রয়োগ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তথাকথিত আধুনিকগণ জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা, যৌন যথেচ্ছাচারের পরিবেশ বাড়িয়ে তুলেছেন, আবার তার পরিণতিস্বরূপ যখন পারিবারিক জীবন ভেঙে পড়ছে তখন সেই অপদার্থ, কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে স্ত্রীর বসবাস আইনের জোরে স্থায়ী করতে চান।

ইসলাম অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সঙ্গে স্ত্রীর বসবাসের জন্য বলপ্রয়োগ করেনি। মানবজীবনের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্যটিও ইসলামের কাম্য। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই সৌন্দর্য রক্ষার কাজে ইসলাম সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ইসলাম তার অপ্রতিহত সাম্যবোধের দ্বারাই মধ্যযুগে আরবের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে অমানবিক স্ত্রীবর্জন বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, আইনপ্রয়োগে নয়,

সুস্থ জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার সাহায্যে। ইসলামের এই মহতী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে যাঁরা উদাসীন, যাঁরা গোটা ব্যাপারটির সমাধান করতে চান আইনপ্রয়োগে, প্রশাসনিক শাস্তি প্রয়োগে তাঁরা সফল হতে তো পারছেন না—বরং নারী-জীবনে নূতনতম এক অমানিশাকে ডেকে আনা হয়েছে, সেটি হলো বধূহত্যা। বধূ জীবনে নারীর নিরাপত্তা আজ বিপন্নপ্রায়। অপদার্থ বিশ্বাসঘাতক পুরুষ যাতে বিবাহবিচ্ছেদ করতে না পারে সেজন্য আইনের বেড়াজালে বাঁধতে গিয়ে ভারতীয় সমাজ নারীকে এগিয়ে দিয়েছে অকালমৃত্যুর অভিশপ্ত কুঠরিতে।

বর্তমানের নারীনির্যাতন ও বিবাহবিচ্ছেদজনিত সংকট শুধুমাত্র নারী-সমাজের সংকট নয়। এ সংকট বিশ্বমানবতার। মানবতার এ সংকট কোন ভয়াবহ পরিণতিতে অবসিত হতে পারে তা উপলব্ধি করতে হবে। সমস্যার মূল কারণ না খুঁজে কেবলমাত্র অন্ধের মত হাতড়ালে হবে না। বস্তুসর্বস্ব সভ্যতা মানুষকে কি দিয়েছে আর কি ছিনিয়ে নিয়েছে তার মূল্যায়ন করে মানুষকে চলার নির্দিষ্ট পথ ঠিক করতে হবে। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে আমরা নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছি। নারীজীবনের দুর্গতি মোচনেও আমরা জড়বাদী সভ্যতাকে অনুকরণ করতে চাচ্ছি। ভেবেও দেখছিনা এপথে চলে পাশ্চাত্তোর সামাজিক অবস্থা কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। যাঁরা নারীমুক্তির শ্লোগান দিচ্ছেন তাঁরা কোন মৌলিক আদর্শ তুলে ধরতে পারছেন না। তাঁরা এমন কতকগুলি দেশের অনুকরণ করতে চাচ্ছেন যাদের বাস্তব অবস্থা আমাদের চেয়েও শোচনীয় ও ভয়াবহ। আমরা নারীজীবনের দুর্গতি ও তার ফলস্বরূপ সমাজজীবনের সংকটকে পর্যালোচনা করলে দেখব প্রকৃতিদত্ত স্বভাবধর্ম ও বিধান লংঘনের ফলেই এসেছে এ করুণ পরিণতি। প্রকৃতির সর্বত্র একটি সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মের পরিবেশ বিরাজ-মান। যে কোন নিয়ম লংঘন করলেই অশান্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুগে যুগে মানুষকে সুস্থপথে ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ্ নবী ও রাসূলের মাধ্যমে বিধান প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তা কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মানুষের নিজের ওপর। সেই অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে সৃষ্টির সেরা মানুষ নেমে যাচ্ছে ধ্বংসের অতল তলে—পশুত্বের পর্যায়ে। এই পরিণতিকে রুখতে নীতিনৈতিকতাকে হাতিয়ার করে সংগ্রামে নামতে হবে। এ সংগ্রাম শুধু নারীর নয়, শুধু পুরুষের নয়, এ সংগ্রাম কোন নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর নয় —এ সংগ্রাম সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানবতার।

।। ইদ্দত বা প্রতীক্ষা কাল ।।

ইদ্দত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ গণনা করা। আর শরীয়তের অর্থে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়া বা স্বামীর মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময় গণনা করা।

ইসলামে বিবাহ বন্ধন চুক্তি ছিন্ন করা ও হওয়ার সঙ্গে ইদ্দত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ইসলামের বিবাহ বিচ্ছেদ আইন এমনভাবে রচিত যে ইদ্দত অনুসরণ না করে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। বিশ্বের কোন ধর্ম ও কোন আইনেই ইদ্দতের মত কোন নিয়মকানুন ও বিধান প্রচলিত নেই। কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে ইদ্দত কাল গণনার নির্দেশ রয়েছে।

ইসলাম ধর্মে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে পরস্পর চুক্তি-ভিত্তিক। আমাদের সাধারণ ধারণা রয়েছে যে পুরুষ বিবাহ করে এবং নারীর বিবাহ হয়। ইসলামের বিবাহ চুক্তিতে এই ধারণার কোন সমর্থন নেই। এক্ষেত্রে পুরুষ যেমন নারীকে বিবাহ করে, নারীও তেমনি পুরুষকে বিবাহ করে। ফলে এ চুক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেওয়া হয়, তখন পরস্পরের মধ্যে বিবাহজনিত যাবতীয় চুক্তিই ভেঙে যায়। দুটি মানবীয় জীবন, পরিবার, সমাজ এই একটি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে চক্রায়িত হয়। সেজন্যই ইসলামী আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। ইসলামী শরীয়তের বিধান মত কোরআন ও নবীর নীতি মেনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে ইদ্দতকালে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। দীর্ঘ যৌথ জীবন যারা কাটিয়ে এসেছে দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যে ঘটলেও, বিরোধ, অনৈক্যের ফাটলের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদের দিকে অগ্রসর হওয়া কালে, হয়ত অনুতাপে দগ্ধ, হতে পারে, হয়ত বা অনুশোচনার তীব্রতা তাদের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে ; আর সেই দোলাচল দুটি হৃদয়ে পুনরায় পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্যই ত্বালাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও এই প্রতীক্ষাকালের সুযোগ সৃষ্টি করেছে ইসলাম তথা কোরআনের আইন। সেজন্যই ইসলামের আইনে ইদ্দত বা প্রতীক্ষা কালের এত গুরুত্ব।

ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলে নারী-পুরুষের বিবাহিত জীবনের কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট থাকেনা। ইদ্দত কাল সমাপ্ত হলে ঐ দম্পতি একজন

অপরজনের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরস্ত্রী ও পর পুরুষ রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। একজন অপরিচিত নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গী, বিবাহ বিচ্ছিন্ন নারীপুরুষের ক্ষেত্রেও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী। এমনকি পরস্পরের সঙ্গে পর্দা ভেঙে দেখা সাক্ষাৎও নিষিদ্ধ বা হারাম।

ত্বালাকের পর ইদ্দতকাল একটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই এই সময়ের সঠিক হিসাব রাখার বিধান রয়েছে। ইদ্দতকালের যাবতীয় ও যথোপযুক্ত ভরণপোষণের দায়িত্বও সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর অর্পিত হয়।

নারীর প্রতীক্ষার সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট ভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিধান জারী হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই ইদ্দতের গণনা কাল অপরিসীম বিজ্ঞানভিত্তিক।

ত্বালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকাল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "ত্বালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী **তিন রজঃস্রাব** কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের জন্য বৈধ নয়।" (২ঃ ২২৮)[১]

আবার স্বামীর মৃত্যু হলে নারীর প্রতীক্ষাকালের জন্য পৃথক সময় নির্ধারিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণায় রয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীগণ **চারমাস দশদিন** প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ইদ্দত কাল পূর্ণ করবে তখন তারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয় অবহিত।" (২ ঃ ২৩৪)[২]

পবিত্র কোরআনের আর একটি ঘোষণায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে, "তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত কাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে জেনে রাখ তাদের ইদ্দত কাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনও রজঃস্বলা হয়নি তাদেরও ইদ্দতকাল অনুরূপ এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত কাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে

---

১. আল কোরআন—সূরা বাকরা আয়াত ২২৮

২. ঐ সূরা বাকরা, আয়াত ২৩৪

যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দেবেন।" (৬৫ ঃ ৪)[১]

আবার যদি বিবাহ চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর দাম্পত্য জীবন শুরু করার আগেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয় সেক্ষেত্রে ইদ্দতকাল সম্পর্কেও স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন নীতি নির্ধারিত হয়েছে। বিবাহ হলেও এক্ষেত্রে যৌথ জীবন যেহেতু শুরু হয়নি তাই বিচ্ছেদের অন্যতম শর্ত ইদ্দত পালনের দায়িত্ব বর্তায়না। অর্থাৎ বিবাহ চুক্তিকে যতক্ষণ না প্রকৃতপক্ষে সম্মান প্রদর্শন না করা হয় ততক্ষণ এর বিচ্ছেদের শর্তগুলির গুরুত্বও প্রযোজ্য নয়। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসী রমণীকে বিবাহ করার পর ওদের স্পর্শ করার পূর্বে ত্বালাক দিলে ওদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের থাকবে না। তোমরা ওদের কিছু দেবে* এবং সৌজন্যের সঙ্গে ওদেরকে বিদায় করবে।" (৩৩ ঃ ৪৯)[২] এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে, "যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ অথবা তাদের জন্য মাহ্‌র ধার্য করেছ তাদেরকে ত্বালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো।** বিত্তবান তার সাধ্যমত ও বিত্তহীন তার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত সংস্থানের (মোতআ)[৩] ব্যবস্থা করবে। এটাই সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য।" (আল-কোরআন-সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৩৬)

---

১. আল কোরআন-সূরা ত্বালাক, আয়াত ৪

* এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার কালে ধার্য নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক স্ত্রীকে প্রদান করা ইসলামী বিধান আর অন্যক্ষেত্রে 'মোতআ' দেওয়া কোরআনের বিধান।

২. ঐ সূরা আহযাব, আয়াত ৪৯

** যেহেতু এক্ষেত্রে স্ত্রী মাহ্‌র পাওয়ার অধিকারী হননা তাই সহানুভূতি সহকারে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের কিছু প্রদানের ব্যবস্থা করা সত্যপরায়ণদের কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। ইমাম বোখারী তাঁর হাদিস গ্রন্থের ২০৯৮ নং হাদিসের মসলায় একথা উল্লেখ করেছেন।

৩. **মোতআ** বলতে মহিলাদের ভোগবস্তু বা পূর্ণ পোষাক বোঝায়। স্বামী স্ত্রী উভয়ের অবস্থানুযায়ী ঐ পোষাক দিতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে মোতআ প্রদান ওয়াজেব। কারণ এক্ষেত্রে মাহ্‌র দিতে হবে না। অন্য ত্বালাকের ক্ষেত্রেও মোতআ প্রদান মুস্তাহাব।

এখন প্রশ্ন হলো কেন এই ইদ্দত কাল সঠিকভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেনই-বা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম সময় ভরণ পোষণ ও দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হলো। সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। শৃঙ্খলাহীন সমাজ মানবজীবনকেই বিপর্যস্ত করে তোলে। বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ইদ্দত পালনের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর অনুতাপ, অনুশোচনা কিংবা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে, সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ থাকে। ফলে ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ—সকলেই একটা বিরাট বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তিন রজঃস্রাব কাল ইদ্দত পালনের ফলে নিশ্চিত হওয়া যায় স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান আছে কিনা। এটি নারীর নিজ নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ গর্ভস্থঃ সন্তানের যৌথ পরিচয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শৃঙ্খলার পর্যায়ে পড়ে। এই শৃঙ্খলার অভাবে পাশ্চাত্য সমাজ এক বিধ্বংসী পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার বহু পূজারী, প্রগতির বহু ধ্বজাধারীগণ বলবেন কেন মাতৃপরিচয়ে সন্তান পরিচিত হতে পারবে না। নিশ্চয় পারে। কিন্তু পিতামাতার যৌথ পরিচয়ে। বালখিল্য হলেও এক্ষেত্রে মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি একা পিতা বা একা মাতা কোন সন্তান পৃথিবীতে এনেছেন তার প্রমাণ কি আজও পৃথিবীতে আছে। টেষ্ট টিউব বেবী? সেও কি পুরুষ নিরপেক্ষ অথবা নারী নিরপেক্ষভাবে ভূমিষ্ঠ করানো সম্ভব। কাজেই এসব চিন্তা বাতুলতা মাত্র। পিতামাতার পরিচয় নির্ধারণে ইদ্দতকাল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত পালনের ব্যাপারটি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিভিন্ন হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে। এইসব হাদিস দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা হয়েছে। যেমন মৃত স্বামীর স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে তার সন্তান প্রসবই তার ইদ্দতকাল। তার পরই সে অন্যত্র বিবাহ করার অধিকারিনী। এ ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিনের নিয়মটি কোনভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো সন্তানপ্রসব। কারো স্বামীর মৃত্যুর একমাস পরই যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে একমাসই হবে তার ইদ্দতকাল। সন্তান প্রসবের পর তাকে আর ইদ্দত পালন করতে হবে না। সন্তানপ্রসবই ইদ্দতের শেষ সীমা। একটি

হাদিসে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হচ্ছে ! উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন "সোবাই-য়াহ নাম্নী এক রমণীর গর্ভকালে তার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সে সন্তান প্রসব করে। এই সময়ে চার মাস দশদিন হতে যথেষ্ট বাকি ছিল। তাসত্ত্বেও সে হযরতের কাছে পুনঃ বিবাহের অনুমতি লাভ করে।"[১]

এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে গর্ভবতী স্ত্রীর জন্য তার গর্ভকালই হল তার ইদ্দত। যখনই সে সন্তান প্রসব করবে তখনই তার ইদ্দতকাল শেষ হয়েছে ধরা হবে। আবার ত্বালাকের পর তিনমাস দশ দিন ইদ্দতকালের মধ্যে গর্ভবতী প্রমাণ হলে তারও ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত গণ্য হবে।

ইদ্দতকালই স্বামী-স্ত্রীর বিবাহচুক্তি ছিন্ন হওয়ার শেষ সীমা রেখা। তাই ইদ্দতকালে স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ পোষণ বসবাসের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। তবে ব্যভিচারগ্রস্তা নারীকে ত্বালাক দেওয়ার পর স্বামী এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও দায়ী হবেন না, অন্যথায় সব ক্ষেত্রেই ইদ্দত কালে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও বসবাসের ব্যবস্থা না করে তাকে সংকটে ফেলা স্বামীর জন্য অবৈধ কাজ ! এই সময় স্ত্রীর যাবতীয় ব্যবস্থা করার জন্য স্বামীর প্রতি আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন।

"তোমরাতোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ বাড়ীতে বাস কর তাদেরকেও সেরূপ বাড়ীতে বাস করতে দিও ; তাদেরকে উত্যক্ত করে সংকটে ফেলোনা ; তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তান দিগকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গত ভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তা হলে অন্য নারী স্তন্য দান করবে।" (৬৫ ঃ ৬)[২] পবিত্র কোরআনে ইদ্দতকালে স্বামীর দায়িত্ব হিসাবে আরো ঘোষিত হয়েছে "বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। (৬৫ঃ৭)[৩]

---

১. আল হাদিস ঃ বোখারী শরীফ হাদিস নং ২০৯২ (বাং ৩য় সংস্করণ)
২. আল-কোরআন সূরা ত্বালাক ঃ আয়াত ৬
৩. ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ৭

॥ ভরণ পোষণ বা খোরপোশ ॥

ওয়া লিল মোত্বাল্লাক্বাতে মাতাউন বিল মাআরুফে, হাক্কান আলাল মোত্তাক্বীনা। অর্থাৎ "ত্বালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে প্রথামত[১] ভরণপোষণ[২] করা সাবধানীদের কর্তব্য। (২:২৪১)[৩]

আমরা ইতিপূর্বে মাহ্‌র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করেছি। মাহ্‌র আর ভরণপোষণকে অনেকেই এক করে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে মাহ্‌র ও ভরণপোষণ কোনভাবেই এক নয়। দুটি সম্পূর্ণ পৃথকধর্মী ব্যাপার : মাহ্‌র সম্পূর্ণরূপে নারীর নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পদ। অন্যদিকে ভরণপোষণ তার প্রাপ্য অধিকার এবং পুরুষের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব। ইতিপূর্বে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মে নারীপুরুষের আকৃতি প্রকৃতি যেমন পৃথক, তেমনি তাদের পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্যও পৃথক। আর ঠিক এজন্যেই নারীপুরুষের পরস্পরের প্রাপ্য অধিকারের চরিত্রও পৃথক।

মুসলিম নারী বিবাহকালে স্বামীর কাছ থেকে যে মাহ্‌র পান তা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আবিষ্ট হৃদয়ানুভূতি জনিত সম্মানজনক ও সম্ভ্রমপূর্ণ স্বীকৃতির স্মারক। এটি কখনই পুরুষের প্রভুত্ব কিংবা নারীর উপর অধিকার

---

১. '**প্রথামত**' বা '**নিয়মানুযায়ী**' অর্থে বুঝতে হবে ত্বালাকের শ্রেণী অনুসারে ইদ্দতকালে ত্বালাকপ্রাপ্তার জন্য ত্বালাক দাতার পালনীয় বিধান। যেমন যে নারীর নির্জনবাস হয়েছে বা যে নারীর নির্জনবাস হয়নি অথবা মাহ্‌র ধার্য হয়েছে বা হয়নি তার জন্য পৃথক পৃথক নিয়ম আছে। রেজয়ী ও বেদয়ী ত্বালাকের যে পৃথক নিয়ম রয়েছে এবং সেইমত ইদ্দত পালন এবং ইদ্দত পালনান্তে যে সকল ভিন্নধর্মী নিয়মনীতি ও বিধান রয়েছে সেই সকল নিয়মকে পবিত্র কোরআনে 'মাআরূফ' বা 'প্রথামত' বলা হয়েছে।

২. 'মাতাউন' শব্দের অর্থ হলো ১. খোরপোশ বা ভরণপোষণ ২. ভোগবস্তু। খোরপোশ বা ভরণপোষণ অর্থে এই শব্দ দ্বারা ইদ্দতকালে ত্বালাকের প্রকৃতি অনুযায়ী কখনও খোরপোশ দেওয়া ওয়াজেব (বাধ্যতামূলক), কখনও মোস্তাহাব (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মঙ্গল জনক কাজ) বোঝায়। ভোগ্যবস্তু অর্থে ত্বালাকের শ্রেণী অনুসারে কখনও পরিধেয় জামাকাপড় দেওয়া 'বাধ্যতামূলক' কখনও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মঙ্গলজনক কাজ বোঝায়।

৩. আল-কোরআন—সূরাবাকারা : আয়াত ২৪১

বিস্তার করার মত মানসিকতার ফসল নয় ; এটি পুরুষের রূঢ়তা বা প্রেমহীন-তার স্বাক্ষর নয়। নারীর দিক থেকে এটি তার বিশেষ শারীরিক গঠনের প্রতি পুরুষের মর্যাদাময় স্বীকৃতির দ্যোতক। মাহ্‌র একদিকে নারীর সম্মানের পরিচয় বহন করে, অন্যদিকে মাহ্‌র দ্বারা নারীর নিজস্ব সম্পদ অর্জন জনিত মানসিক তৃপ্তি ঘটে। সর্বোপরি মাহ্‌র প্রাপ্তি নারীর হৃদয়ে বস্তুগত মূল্যের চেয়ে নৈতিক মূল্যবোধ বেশী জাগ্রত করে।

ইসলামী আইনে মাহ্‌র বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নারীর কল্যাণ ও মর্যাদা-দানের মহিমায় এক অনন্য বিধান। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ভরণপোষণও বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য বহন করে। সমগ্র বিশ্বে সব জাতি ও ধর্মের মধ্যে মাহ্‌র যেমন অনন্য ও অতুলনীয়, তেমনি ভরণপোষণও বিশ্বের কোন আইনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তাই অমুসলিম ব্যবস্থায় ও অমুসলিম আইনে ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অতীত ও বর্তমানকালের নিয়মকানুনের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে ইসলামী আইনের কল্যাণকর বিশেষ দিকটি নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করা দরকার। আর তাহলেই এর অপরিসীম কল্যাণময় রূপটি স্পষ্ট হবে। মধ্যযুগীয়, মোল্লাতান্ত্রিক, মৌলবাদ ইত্যাদি বিদ্রূপাত্মক বিশে-ষণের আড়ালে সব কিছু ঢেকে ফেলার মানসিকতা থেকেই ভারতীয় সমাজ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বহু বৈজ্ঞানিক বিধানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। হয়েছে।

ইসলামী আইন ত্রিবিধ পথে নারীর ভরণপোষণের বিধান রচনা করেছে। প্রথমতঃ যে কেউ কারও দায়িত্বে থাকলে তার রক্ষণাবেক্ষণের নৈতিক দায়িত্ব নিতে বাধ্য। অর্থাৎ কারও দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার রক্ষণাবেক্ষণ দায়দায়িত্ব বহনের যাবতীয় দায়িত্ব কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ শৈশব থেকে বিবাহ-পূর্ব জীবনের সময়কালের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির দায়িত্ব হলো পিতা ও অভিভাবকের। এই ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কিন্তু মালিকানা বা কর্তৃত্বজনিত নয়। প্রত্যেক শিশুই পিতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকারী। যেহেতু পিতামাতার যৌথজীবনের ফসল হিসেবে শিশুর অস্তিত্ব বিশ্বজগতে

প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন পথে পিতা ও মাতার নিকট শিশুর এ অধিকার ইসলামী আইন ঘোষণা করেছে। ইসলামের এই ভরণপোষণের বিধান মানবিকভাবেই পিতামাতার উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিশুর লালনপালন সংক্রান্ত দায়িত্ব মাতা এড়িয়ে যেতে পারেন না; আবার যাবতীয় আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকার করা পিতার জন্য নৈতিক অপরাধ।

আবার পুত্র হিসেবেও পুরুষের উপর ইসলাম মাতাপিতার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করাও ইসলামী আইনে পুত্রের জন্য নৈতিক অপরাধ। এইভাবে ইসলাম ত্রিবিধ পর্যায়ে পুরুষের উপর এক কঠিন, কঠোর, দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব অস্বীকার করার কোন অধিকার পুরুষকে দেওয়া হয়নি।

প্রত্যেক মানুষের সমগ্র জীবনে ভরণপোষণের দায়িত্ব বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। প্রত্যেক শিশু সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার। পুত্রসন্তান উপযুক্ত হয়ে গেলে তার ভরণপোষণের ব্যাপারে পিতার আর কোন দায়িত্ব থাকেনা। কিন্তু কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে বিবাহ পর্যন্ত প্রত্যেকটি দায় দায়িত্ব ও তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার অবশ্যকরণীয় কাজের পর্যায়ে পড়ে। বিবাহ-পূর্ব জীবনে কন্যা যদি নিজ পরিশ্রমে কোন সম্পদ অর্জন করে, সে সম্পদে পিতামাতার অধিকার ইসলাম স্বীকার করেনি। নিজের অর্জিত সম্পদে নারীর পূর্ণ অধিকারকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে। বিবাহ-পূর্ব জীবনে পিতৃগৃহ থেকেই নারী অর্থসম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

বিবাহ পরবর্তী জীবনে একটি নারীর ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়। এই ভরণপোষণটি বিশেষ অর্থবহ। এটি মালিকানা কিংবা কর্তৃত্ব অর্জন জনিত দায়িত্ব পালন নয়। অর্থাৎ মালিকের বা প্রভুর যেমন অধীনস্থ দাসদাসীদের প্রতি ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে এ ভরণপোষণ সেরকম নয়। আবার পিতা কর্তৃক সন্তানের ভরণপোষণের প্রাকৃতিক দায়িত্বের অনুরূপ এ ভরণপোষণ নয়। এই দায়িত্ব অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ইসলামী বিধানে স্বীকৃত নয়। এ ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। কোন স্ত্রী যদি অগাধ

সম্পদ সম্পত্তি ও অর্থের মালিক হন বা প্রভূত পরিমাণ উপার্জনকারিণী হন আর স্বামীর যদি সম্পদ সম্পত্তি না থাকে কিংবা স্বল্প উপার্জনকারী হন তাহলেও স্বামীরই দায়িত্ব হচ্ছে পরিবারের খরচ বহন করা ও স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। সন্তানের কিংবা অধীনস্থ লোকের ভরণপোষণের দায়িত্বের সঙ্গে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনের পার্থক্য যথেষ্ট। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কেউ নারীর ভরণপোষণ না করলে নৈতিক ভাবে অপরাধী হয়, অন্যায়কারী বলে গণ্য হয়। এদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন না করলে বা অবহেলা করলে নৈতিক অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে আইনের দৃষ্টিতেও অপরাধী গণ্য হয়। স্ত্রী যত ধনশালীই হন স্বামী ভরণপোষণ না করলে আইনের আশ্রয়ে তা স্বামীর কাছ থেকে আদায় করার অধিকার স্ত্রীর আছে। এখন আমরা এই ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করব।

আমরা ইতিপূর্বে একাধিক আলোচনায় দেখেছি ইসলাম ধর্মের প্রত্যেক বিষয়েই মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে, যা মুসলমান মাত্রেই মেনে চলা ধর্ম পালনেরই অঙ্গ। ইসলাম ধর্ম বস্তুতপক্ষে কোন ধর্মীয় আচার সর্বস্ব ধর্ম নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ ও আচরণ ইসলামের নিয়ম মত পালনই প্রকৃতপক্ষে ধর্মপালন। আমরা এও দেখেছি স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। এমনকি স্ত্রীর ব্যক্তিগত হাতখরচ যোগানোও স্বামীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর প্রভূত সম্পদ সম্পত্তি অর্থ থাকলে বা অর্থ অর্জনের জন্য বেশী সময় থাকলেও নারীর পরিবারের প্রতি কোন আর্থিক দায় ভার বহনের দায়িত্ব ইসলামী আইনে ঘোষিত হয়নি। পরিবারের জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করা বা পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজনে স্ত্রীর কাজ করা সম্পূর্ণভাবে তার স্বেচ্ছাজনিত ব্যাপার।

স্বামী স্ত্রীর জন্য ব্যয়ভার বহন বা ভরণপোষণের বিনিময়ে তাঁকে অর্থ উপার্জনে বাধ্য করার বা উপার্জনের কাজে লাগানোর অধিকারী নন, কিংবা তাঁর কাছ থেকে কোন অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের অধিকারী নন। এ সকল ব্যাপারে স্ত্রীকে শোষণ বা বঞ্চনা করার কোন অধিকার স্বামীকে ইস-

লাম দেয়নি। এইভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায় দায়িত্ব একান্তভাবে স্বামীর। যেমন মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুত্রের এবং পুত্র এর বিনিময়ে কোনভাবেই কিছু পাওয়ার অধিকারী নয় ; কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার এবং তার বিনিময়ে পিতা কোনভাবেই কিছু পাওয়ার অধিকারী নন, তেমনি স্ত্রীর ভরণপোষণের বিনিময়েও স্বামী কিছুই পাওয়ার অধিকারী নন।

ইসলাম নারীর হাতে আর্থিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের সীমাহীন সুযোগ করে দিয়েছে। একদিকে তাকে পরিপূর্ণ ভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে নারীর এই সকল অধিকার ও সম্পদের উপর স্বামীর কোন হস্তক্ষেপ ইসলাম অনুমোদিত নয়।

পাশ্চাত্ত্য মতবাদের পূজারীগণ নারীর অধিকার সংরক্ষণের নামে ইসলামের বিধানকে সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন ভরণপোষণের নামে পুরুষ আসলে নারীর উপর নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং নারীকে নিজ কাজে নিয়োগ করে। একটি পশুর মালিক হিসেবে মানুষ যেমন তার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে তাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে ঠিক একই অবস্থা ঘটে নারীর ক্ষেত্রে। ইসলামী আইনকে আক্রমণ করে কেউ যদি বলেন যে এ আইন নারীর পক্ষাবলম্বন করে তার প্রতি অত্যধিক সদয় হয়েছে এবং পুরুষকে তার বেতনহীন পরিচারকে পরিণত করেছে। তা'হলে নারীর অধিকার রক্ষার নামে যাঁরা ইসলামী আইনের সমালোচনা করেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী যুক্তি এঁদের পক্ষে রয়েছে।

আসলে ইসলাম নারীর প্রতি পক্ষপাত বা সুবিধাজনক কিংবা পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক বা সুবিধাজনক এভাবে আইনকে খণ্ডিতভাবে নেয়নি কিংবা আইনে সে পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। ইসলাম নারী ও পুরুষ কারো সম্পর্কেই পক্ষপাতমূলক বিধান রচনা করেনি। ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনের সমৃদ্ধি, যে শিশুসন্তানগুলি তাদের দায়িত্বে বেড়ে উঠেছে তাদের উন্নতি এবং সর্বোপরি সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে একটি ভারসাম্যময় বিধান তৈরী করেছে।

ইসলামী ধারণায় নারীপুরুষের, তাদের সন্তানদের এবং সর্বোপরি সমগ্র

মানবসমাজের সমৃদ্ধি ও উন্নতি নির্ভর করে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলার উপরে। স্রষ্টার অমোঘ ও বিচক্ষণ সৃষ্টির মধ্যেই জীবনের চলার পদ্ধতি বিধৃত আছে। পুরুষ ও নারীর উভয়ের কখনই ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় তাদের ভালোবাসার বন্ধনের মাঝেও তাদের পৃথক দুটি ভূমিকা রয়েছে। নিজ নিজ স্বাভাবিক ভূমিকা অনুযায়ী আচরণ করলেই দাম্পত্য সম্পর্ক সুস্থির দৃঢ় ও ঐকতানমণ্ডিত হতে পারে।

ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত হওয়ার আর একটি কারণ হলো ভাবী প্রজন্মের জন্ম দেওয়ার জন্য সমস্তরকম যন্ত্রণা, দুর্ভোগ, জীবনীশক্তি ক্ষয় করেন মাতা। এটি মাতার উপর ন্যস্ত প্রকৃতিদত্ত দায়িত্ব। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা থেকে শুরু করে প্রসব ও সন্তান লালনপালন পর্যন্ত দীর্ঘসময় মাতা এক নিরবছিন্ন দায়িত্ব স্বীকার করেন। এ দায়িত্বের ভাগ কেউ বহন করতে পারেনা প্রকৃতি দত্ত নিয়মেই। এজন্যই ইসলাম পুরুষের উপরও এক নির্দিষ্ট দায়িত্বভার অর্পণ করেছে।

ইউরোপে নারীসমাজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার চৌদ্দশত বছর পূর্বেই কোরআন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু এ দুটির মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। ইসলাম মানবিকতা ও স্রষ্টার মহত্তম সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই নারীর সর্বোচ্চ অধিকারকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অন্যদিকে ইউরোপে নারীসমাজের স্বাধীন অর্থোপার্জনের স্বীকৃতি এসেছিল শিল্পবিপ্লবের পরিণতিস্বরূপ সস্তায় শ্রমিক পাওয়ার লক্ষ্যে। ইসলাম স্বীকৃত নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর ইউরোপের নারী সমাজের এই স্বাধীনতা-লাভের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। ইউরোপ নারী সমাজের প্রতি সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেনি। ইউরোপ নারীকে টেনে এনেছিল শ্রমবিক্রয়ের খোলাবাজারে!

ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু ভেঙে দেয়নি পারিবারিক বন্ধন; ধ্বংস করেনি পরিবারের মূল ভিত্তিভূমিকে। ইসলাম স্বামী স্ত্রী কিংবা পিতা ও কন্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ক্ষেত্র রচনা করেনি। আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে এবং নারীর অর্জিত সম্পদে একমাত্র নারীরই অধিকার ঘোষণা

করে ইসলাম শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়েছিল। মধ্যযুগের অন্যায় অবিচারের ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন সমাজে শোষিত, অত্যাচারিত নারী সমাজ শ্রমের বিনিময়ে নয়, আপন মানবিক অধিকারে অর্জন করেছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে গৃহকর্মের একঘেয়েমিতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল, কিন্তু বন্দী করেছিল কলকারখানার প্রচণ্ড পরিশ্রম আর শোষণের জেলখানায়। এ যেন কারও হাত থেকে এক গোছা চুড়ি খুলে নিয়ে তার চেয়ে বহুগুণে ভারী লোহার বেড়ি পরানো। ইউরোপে নারীসমাজ পুরুষের সঙ্গে কর্মে নিয়োগের সম অধিকার ও অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা অর্জন করে ঘর ছেড়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়েছিল কলেকারখানায়। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ঘরের বেড়াজাল থেকে মুক্তি তাদের জীবনে কি মর্মান্তিক রূপ ধরে এসেছিল তার অজস্র বাস্তব চিত্র বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কস তার বিশ্বখ্যাত 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন। তিনি নারী শ্রমিকের জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, "পথে পথে তাদের দেখা যায়—পরনে খাটো পেটিকোট, মানানসই কোট ও বুট এবং কখনো কখনো ট্রাউজার; তাদের দেখায় আশ্চর্যরকম সবলা ও স্বাস্থ্যবতী কিন্তু অভ্যস্থ অসচ্চরিত্রতার দ্বারা কলংকিতা; তাদের হতভাগ্য সন্তানগুলি, যারা বাড়িতে আকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে, তাদের উপরে নিজেদের এই ব্যস্ত ও স্বাধীন জীবন কি মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে, সে বিষয়ে তাদের নেই কোন ভ্রূক্ষেপ।"[১]

টালি ও ইট তৈরীর কারখানা, মোম তৈরী, রাসায়নিক কারখানায় ও ন্যাকড়া বাছাইয়ের কাজে হাজার হাজার মেয়ে নিযুক্ত থাকত। আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তা যেমন করুণ তেমনি সভ্যতার জন্য ভয়াবহ, "এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় পাপ এই যে এতে নিযুক্ত করা হয় তরুণী মেয়েদের এবং শিশুকাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা হয় সবচেয়ে লম্পট এক দঙ্গলের সঙ্গে। তারা যে মেয়ে, প্রকৃতি তাদের শেখাবার

১. কার্ল মার্কস—ক্যাপিট্যাল, বাংলা ২য় খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৪—৯৫

আগেই তারা হয়ে ওঠে একদল 'বেয়াড়া ছেলে', যাদের মুখে সব সময়ই লেগে আছে খারাপ কথা। পরণে কয়েক টুকরো ন্যাকড়া, হাঁটুর উপর পা অনেকটাই নগ্ন, চুল ও মুখ ময়লায় মাখা—এই মেয়েরা শালীনতা ও সংকোচের সমস্ত অনুভূতিকে অবজ্ঞাভরে ঝেড়ে ফেলে। খাবার সময়ে তারা মাঠের মধ্যে সটান শুয়ে পড়ে বা কাছের কোন খালে ছেলেদের স্নান করার দৃশ্য দেখে। সারাদিনের ভারি কাজের শেষে অপেক্ষাকৃত ভাল জামাকাপড় পরে পুরুষদের সঙ্গ ধরে সরাইখানায় যায়।"[১]

সংসারের ব্যয়ভার বহনে পুরুষের সঙ্গে সমান অংশীদার হতে গিয়ে সর্বপ্রথমে নারীকে হারাতে হয়েছে তার চরিত্র। আর দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন জীবনের মারাত্মক পরিণতি স্বরূপ এসেছে সন্তানদের নিরাপত্তাহীনতা ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ পরিবারের ভিত্তি ভূমিটাই দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। সংসারজীবন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিনিময়ে নারীকে সারা জীবনটাই মূল্য হিসাবে ধরে দিতে হয়েছে। আজও নারী-অধিকার ও নারী-স্বাধীনতা বলতে এই ধারাই প্রবহমান। আমাদের দেশেও কাগজ বাছাই কারখানা, কাগজ ভাঁজাই কারখানা, আচার তৈরীর কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা, ছাদঢালাই শ্রমিক, ইটভাঁটা ও টালি তৈরীর কারখানায় ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দীর যে চিত্র কার্লমার্কস এঁকেছেন তারই হুবহু প্রতিফলন দেখা যায়। ইসলাম সংসারের ব্যয়ভার বহনের জন্য নারীকে এই অমর্যাদাকর জীবন বেছে নেওয়া থেকে মুক্ত করেছে সম্পূর্ণরূপে। সংসারের প্রত্যেকে ভরণপোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল পুরুষের উপর। এর মধ্য দিয়ে তাকে প্রভুত্ব দান করেনি। ইসলাম নারীকে পুরুষের অধীনতা ও দাসত্ব পাশ থেকে মুক্ত করেছিল গৃহ ও বহিঃ পরিবেশ দুই ক্ষেত্রেই। অন্যদিকে পুরুষের জন্য গোটা পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্বভার বহনকে অবশ্যকরণীয় করেছিল। ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু তার উপরে কোন অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বের বোঝা চাপায়নি, এমনকি তার নিজের ভরণপোষণের দায়িত্বও নয়। নারীর শরীর ও মনে চাপ সৃষ্টি করে, তার

১. কার্লমার্কস-ক্যাপিট্যাল, বাংলা ২য় খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৭০—১৭১

মর্যাদা ও সৌন্দর্যের হানি ঘটায় এমন কোন দায়দায়িত্ব ইসলাম তার উপর চাপিয়ে দেয়নি।

স্বামী হিসেবে স্ত্রীর ভরণপোষণ অর্থাৎ পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্য, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পুরুষকে বাধ্য করা হয়েছে কোরআনের বিধানে। এটি পুরুষের অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে। পুরুষের এই দায়িত্ব পালনের সঙ্গে প্রভুত্বের কিংবা নারীর ভরণপোষণ পাওয়ার সঙ্গে দাসত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এমন দাস ব্যবস্থা পৃথিবীতে কোন দিন ছিলনা ও আজও নেই যে অধীনস্থ দাসদাসীর নিজস্ব সম্পদ থাকতে পারে কিংবা নিজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে কোন কাজ করতে পারে, প্রভু তাতে বাধা দিতে পারে না। পৃথিবীতে এমন প্রভু-ভৃত্যের উদাহরণ কি পাওয়া যাবে যেখানে প্রভু অধীনস্থ দাসকে হুকুমের সুরে কিছু বলার অধিকারী নয়। কারও ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করলেই যদি তার সঙ্গে প্রভু ও দাসের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য সম্পর্কগুলিও তো প্রভুত্ব দাসত্বের ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সকল ধর্ম, সকল আইন সন্তানের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পিতা অথবা পিতামাতার বলে মেনে নিয়েছে। তাহলে কি পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্পর্ক। ইসলাম পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ পুত্রের জন্য অবশ্যকরণীয় ঘোষণা করেছে। আমাদের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতেও এটি এখনও সর্বস্বীকৃত প্রথা। এক্ষেত্রেও কি পিতামাতা পুত্রের দাস ও পুত্র তাঁদের প্রভু কিংবা পিতামাতা পুত্রের সম্পত্তি। নিশ্চয়ই তা নয় বলেই সকলে একমত হবেন, তাহলে একই পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার হলেই কেন প্রভুত্ব ও দাসত্বের প্রশ্ন তোলা হয় এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। আরও একটি প্রসঙ্গের অবতারণা হতে পারে যে স্ত্রী দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ বলেই সন্তানহীনা হলেও স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দতের বেড়ায় বন্দী থাকতে হয়। এখানেও ইসলামের সুদূরপ্রসারী মানবিক ও বৈজ্ঞানিক বিধান অত্যন্ত সঠিক। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর চরমশূন্যতা ও শোকের কালে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন সান্ত্বনা ও সমবেদনা। জীবনের এই নিকটতম সঙ্গী হারানোর বেদনা স্বাভাবিক হতে সময় লাগে। এই দুঃসময়ে স্বামীগৃহে অবস্থান ও

গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে নারীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেনি, প্রতিষ্ঠা করেছে মানবিকতার এক চরম নিদর্শন। অন্ততঃ এদেশে এককালে স্বামীহারা হাজার হাজার নারীকে জীবন্ত মরতে হতো স্বামীর চিতায়। সুনির্দিষ্ট অংশপ্রাপ্তি আইনতঃ স্বীকৃত হয়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর উপার্জনহীনা নারীকে সম্পূর্ণভাবে শ্বশুরালয় কিংবা পিত্রালয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। সেদিক থেকে মুসলিম নারীর পায়ের তলায় মাটি তো যথেষ্ট শক্ত। মুসলিম নারী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহে বাধ্য হয়ে থাকেন না, থাকেন তাঁর অবস্থানের পূর্ণ অধিকার নিয়ে। কিন্তু অন্যত্র বিবাহ ইত্যাদির জন্য চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন অর্থাৎ অপেক্ষা অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মত। মৃত স্বামীর স্ত্রী গর্ভে কোন সন্তান ধারণ করেছেন কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যই এই বিজ্ঞানসম্মত বিধান দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে অপরিসীম মূল্য দেওয়া হয়েছে। অমর্যাদাকর কোন পরিস্থিতিতে নারীকে টেনে নামানোর ঘোরতর বিরোধী ইসলাম। তাই নারীকে শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে, সম্ভ্রম ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েও—সংসার নির্বাহের দায়িত্ব থেকে দূরে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে অপরিসীম মূল্য দেওয়া হয়েছে। অমর্যাদাকর কোন পরিস্থিতিতে নারীকে টেনে নামানোর ঘোরতর বিরোধী ইসলাম। তাই নারীকে শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে, সম্ভ্রম ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েও—সংসার নির্বাহের দায়িত্ব থেকে দূরে রেখেছে।

বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সমাজে ভরণপোষণের রূপরেখা ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর ভরণপোষণ বা খোর-পোশ নীতি বহু বিতর্কিত বিষয়। এদেশে যেহেতু ইসলামী অনুশাসন নেই, সেহেতু বিতর্কের জাল বিস্তৃত হয়েছে আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর পরিধিতে। পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত কোন ধর্মেই নারীর খোরপোশ ভরণপোষণ ইত্যাদি বিষয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ধর্মীয় আইন নেই। ফলে ইসলামী দেশ

ছাড়া সবদেশেই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন প্রযোজ্য। অপর দিকে ইসলাম ধর্মের নিজস্ব সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে এবং তা পালন করা ধর্মপালনেরই অঙ্গ। ভারতীয় উপমহাদেশে এ নিয়ে সংঘাতের উৎস এখানেই। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে যে সকল ধর্মীয় নিয়মাবলী আছে তা ধর্মীয় নেতা, বিশেষজ্ঞ ও ধর্মবিশারদগণ দ্বারা রচিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের ব্যক্তিগত আইন মানুষের জন্য আল্লাহর সৃষ্ট বিধান। ইসলামী আইনবিদ ও ধর্মীয় আইন বিশারদগণ কেবলমাত্র এর ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু ইসলামী আইন সৃষ্টি, বাতিল, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করতে পারেন না।

আমাদের দেশে ভরণপোষণ, খোরপোশ ইত্যাদি বলতে বিবাহবিচ্ছেদ জনিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে পুরুষের উপর মহিলাদের জন্য ব্যয় বহনের দায়িত্বকেই বোঝান হয়। ইসলামী বিধানে নারীর খোরপোশ বা ভরণপোষণ বলতে বিবাহ বিচ্ছেদের পরের অবস্থা বোঝায় না; বরং কন্যার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যে কটি স্তর আছে—প্রত্যেকটি স্তরে তার ব্যয় বহনের জন্য নির্দিষ্ট লোকের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কন্যার জন্মকাল থেকে বিবাহ পূর্ব জীবন পর্যন্ত ভরণপোষণ খোরপোশ ও ভোগ্যবস্তু দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব পিতামাতার। বিবাহকাল থেকে শুরু হয় নারীর জীবনের দ্বিতীয় স্তর, এই সময় ভরণপোষণ, খোরপোশ ও ভোগ্যবস্তু প্রদানের যাবতীয় দায়িত্ব স্বামীর। এর পরের স্তরে অর্থাৎ মাতৃজীবনে তাঁর যাবতীয় দায়িত্ব পুত্রের উপর বর্তায়। এইভাবে ভরণপোষণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধান ইসলামী আইনে বিধৃত। ইসলামের এই বিধান নিয়েও বিরোধ বা মত-দ্বৈধতা নেই।

মূল সমস্যা হলো তালাক প্রাপ্তা নারীর জন্য তার পূর্বস্বামীকে কতদিন খোরপোশ দিতে হবে তা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে। ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী-গণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু ধর্মে স্বামীবর্জিতা ও বিধবা মহিলাদের পুনঃ বিবাহের প্রথা ছিল না। দীর্ঘ আন্দোলনের পর বিধবা বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহ মহিলাদের জন্য আইনতঃ অনুমোদিত হলেও, সমাজে এখনও এ প্রথা আদৃত নয়। এরকম বিবাহকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। ফলে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য মহিলাগণ স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে পরবর্তী জীবনে ভরণপোষণ

সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ সমস্যায় পড়েন। এই সংকট থেকে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংসদ বিশেষ আইন রচনা করেছে। এই আইন ব্যতীত হিন্দু মহিলাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার কোন বিধান হিন্দু ধর্মে নেই। ফলে সর্বস্তরের হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের ভারতীয় মহিলাগণ ঐ ভারতীয় আইনকেই নিজেদের একমাত্র রক্ষাকবচ হিসেবে বিশেষ মঙ্গলজনক গণ্য করে থাকেন। এই মানসিকতা থেকেই তাঁরা মুসলিম মহিলাগণের বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও ঐ আইন অনুসরণ বিশেষ ভাবে দাবি করছেন। এই নিয়ে সংকট ঘনীভূত হয়েছে। এখানে আমরা দেখব মুসলিম মহিলাদের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত পরিস্থিতিতে ইসলাম খোরপোশ, ভরণপোষণ ইত্যাদিকে কিভাবে উপস্থাপন করেছে এবং এই বিধানগুলি সমাজের সুপরিবেশ সৃষ্টিতে কতটা সহায়ক বা প্রতিবন্ধক। সেইসঙ্গে ভারতীয় আইন কতটা মঙ্গলজনক এবং মুসলমানদের তা গ্রহণ না বর্জন কোনটা সমীচীন।

ইসলাম ধর্মে ত্বালাক প্রাপ্তা বা ত্বালাক অর্জিতকারিণী উভয় শ্রেণীর মহিলার জন্যই কয়েকটি বিশেষ অবস্থার বিন্যাস করে প্রত্যেক অবস্থায় খোরপোশ দেওয়া বা পাওয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। ত্বালাক প্রাপ্তা নারীর সাধারণভাবে তিনটি অবস্থা ১. নিঃসন্তান অবস্থা ২. গর্ভাবস্থা ৩. দুগ্ধপোষ্য সন্তান বর্তমান জনিত অবস্থা।

১. সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ গর্ভবতী না হলে বা দুগ্ধপোষ্য সন্তান না থাকলে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী ত্বালাক হলে তাকে তিনমাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হয়। এই ইদ্দতকাল অতিক্রম করলে চূড়ান্তভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ গণ্য হবে। এই ইদ্দতকালে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও খোরপোশ ইতাদি ব্যয়ভার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারিণী। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম মানলে এই সময়কালে স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজনই স্বামী বহন করতে বাধ্য[৭]। চূড়ান্তভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীর কোন সম্পর্কই থাকেনা। ইসলামী নীতিতে সম্পর্কহীন নারীর প্রতি কোন দায়দায়িত্ব অর্পিত হয় না। ফলে ইদ্দতের পরবর্তীকালে ত্বালাকপ্রাপ্তার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখা বা কোন দায়দায়িত্ব বহন ইসলাম পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক

করেনি। এই তিনমাস সময়সীমার জন্য কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুমতী হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত কাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে জেনে রাখ তাদের ইদ্দত কাল হবে তিনমাস এবং যারা এখনও রজঃস্বলা হয়নি তাদের ইদ্দত কাল অনুরূপ···।" (৬৫ : ৪)[১] পবিত্র কোর-আনে এই ঘোষণা থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে রজঃস্বলা মহিলার ইদ্দত কাল তিন মাস। এই তিন মাসের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ও ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। এরপর চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। বিবাহবিচ্ছেদের সময় স্ত্রী সংসার জীবনে যে সম্পদ নিজ পরিশ্রমে অর্জন করেছে তা তার নিজের অধিকার ভুক্ত সম্পত্তির মতই পাবে। এই অর্থে স্বামী বা পরিবারের অন্য কারও কোন অধিকার নেই। বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে তার আসল অভিভাবকদের নিকট সসম্মানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও স্বামীর।

আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণা ও আচার আচরণের সঙ্গে ইসলামী বিধানের মৌলিক পার্থক্য এক্ষেত্রেও স্পষ্ট। এদেশে স্ত্রী যখন ত্বালাকপ্রাপ্তা হন তখন সংসারে তাব অর্জিত সম্পদ যা থাকে, তা তাকে, ফেরৎ তো দেওয়া হয়ই না—বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেনমোহরের প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এটি চরম ইসলাম বিরোধী কাজ। এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের সামাজিক পরিকাঠামোয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাপকদের সক্রিয় হতে হবে যাতে এই অন্যায় ও ইসলাম বিরোধী কাজ না ঘটে এবং ত্বালাকপ্রাপ্তা নারী যাতে সংসারে নিজ পরিশ্রমে অর্জিত সম্পত্তি লাভ করতে পারে। ইসলামের ধর্মীয় নীতি আচার আচরণ সম্পর্কে মানুষকে সজাগ রাখতে যে সকল পীর সাহেব, আলেম, ওলামাগণ সারাবছর নানাভাবে উপদেশ প্রচার করে থাকেন এ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব সর্বাধিক। মানুষ যদি এ সব বিষয়ে সচেতন না হয় তাহলে ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ মানবিক আদর্শ যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একদিন একের পর এক জাতি ইসলামের বন্ধনে ধরা দিয়েছিল সেটাই হবে অপসৃত। আর তা যদি হয় এদেশের মুসলমানকে বরণ করে নিতে হবে মান-মর্যাদাহীন এক সামাজিক অবস্থান। ভারতের মত দেশ যেখানে ইসলামী আইন প্রচলিত নয় সেখানে মহিলাগণ নিজেদের হক আদায়ের জন্য শরীয়ত

১. আল-কোরআন—সূরা ত্বালাক : আয়াত ৪

বিরোধী আইনের আশ্রয় নিতে তো বাধ্য হবেনই। নিজেদের আত্ম-সমালোচনা না করে নিজেদের মধ্যে ইসলামী আইন কার্যকর না করে শুধুমাত্র 'ইসলাম বিপন্ন' শ্লোগান তুলে বেশীদিন মানুষকে আটকে রাখা সম্ভব নয়। তাই পুরুষ সমাজকে সচেতন ভাবে নারীকে দেওয়া ইসলামের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তিতে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন "এটা আল্লাহ্‌র বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দেবেন মহা পুরস্কার।" (৬৫ : ৫)[১] ইদ্দত কালে স্ত্রী স্বামীর মর্যাদানুসারে সব কিছু পাওয়ার অধিকারিণী। এটাই ইসলামী বিধান। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্‌তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ বাড়ীতে বাস কর, তাদেরকে সেরূপ বাড়ীতে বাস করতে দিও; তাদেরকে উত্যক্ত করে সংকটে ফেলোনা।" ...(৬৫ : ৬)[২]

কোরআনের এই নির্দেশ অমান্য করে শুধুমাত্র নামায রোযা পালন করে যদি মনে করা হয় প্রকৃত মুসলমানের কাজ করছি তাহলে তা হবে আত্ম-হননের মত কাজ। কারণ তিনিই প্রকৃত মুসলমান যাঁর জীবনের প্রতি আচরণে ইসলামের সর্বোন্নত আদর্শ অনুসরণ করার প্রচেষ্টা সদাজাগ্রত থাকে।

২. বিবাহ বিচ্ছেদের সময় কোন নারী গর্ভবতী থাকলে তাঁর ইদ্দত কাল প্রসবকাল পর্যন্ত। এই সময়কালে স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণ, খোরপোশ, ভোগ্যবস্তু প্রদানের দায়িত্ব স্বামীর। অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদের সীমারেখা হলো সন্তান প্রসব। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "...এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত কাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" (৬৫ : ৪)[৩] এই সময় তাদের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হতে ও তাদের পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ভরণপোষণের আয়োজন করার নির্দেশ পবিত্র

১. আলকোরআন—সূরা ত্বালাক, আয়াত ৫
২. ঐ ঐ ৬
৩. ঐ ঐ ৪

কোরআনে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে।" (৬৫ : ৬)[১]

৩. আবার যদি কোন ত্বালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত কালের পর অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পর ঐ সন্তানকে দুগ্ধ পান করান তাও কোরআনে অনুমোদিত। এজন্যেও স্বামীর উপর বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, "যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে, তাহলে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানদের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গত ভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে।" (৬৫ : ৬)[২]

আবার যদি পরস্পর দুগ্ধ পান করাতে বা করতে দিতে না চায় এক্ষেত্রে তাও বৈধ। যেহেতু স্বামীর সঙ্গে চূড়ান্তরূপে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে সেহেতু অনেকেই দুগ্ধ পান করাতে বা করতে দিতে রাজী নাও হতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক। ইসলামের নিয়মানুসারে পুত্রকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত এবং কন্যা রজঃস্বলা হওয়া পর্যন্ত মা নিজের কাছে রাখতে পারেন। কিন্তু রাখতে অস্বীকার করলে তাঁকে বাধ্য করা যাবে না। তখন পিতারই দায়িত্ব তাদের সুবন্দোবস্ত করা। দুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে যদি পরস্পর অনমনীয় হয় তাহলে পিতা অন্য নারীর কাছে সন্তানের দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করতে পারেন। এ সম্পর্কেও আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশ হলো, "তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী স্তন্য দান করবে।" (৬৫ : ৬)[৩]

এসব ক্ষেত্রে যে ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হবে তা যাতে নামমাত্র না হয় বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের রূপ না নেয়, তার জন্য পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, "বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে।

---

১. আল কোরআন—সূরা ত্বালাক আয়াত : ৬

২. ঐ ঐ ৬

৩. ঐ ঐ ৬

আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।" (৬৫ : ৭)[১]

এইভাবে ভরণপোষণের ক্ষেত্রে কোরআন অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নির্দেশ মানুষকে দান করেছে। কোরআনের এই নির্দেশ পালন ধর্ম পালনেরই অঙ্গ। এগুলি যথাযথ অনুসরণ না করা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার সামিল এই আদর্শ হৃদয়ে সদাজাগ্রত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত ইসলাম অনুসরণ। প্রকৃত মানবিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে মুসলমান হওয়ার সার্থকতা।

নারী সমাজ ও নারীমুক্তি নিয়ে আধুনিক ভাবনার সবটাই একটা বিরাট স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। নারী স্বাধীনতার শ্লোগানে আকাশ বিদীর্ণ করলেও নারীর একটা স্বাধীন সত্তা, তার স্বনির্ভরশীলতাকে প্রতিষ্ঠার জন্য বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা কোথায়? বিবাহবিচ্ছেদের পরে স্বামীর কাছ থেকে যাঁরা ভরণপোষণ আদায়ের জন্য এত শোরগোল করছেন, তাঁরাই বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর সকল ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করবেন, নিজের ও সাংসারিক অন্যান্য ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব স্ত্রীর নয় ইসলামের এই নীতির তীব্র সমালোচক। তাঁরা মনে করেন ইসলাম এভাবে স্ত্রীকে স্বামীর দাসত্বে বেঁধেছে। আসলে এঁরা কেউই ইসলামের দেওয়া অন্যান্য অধিকারগুলি সম্পর্কে অনুশীলন না করে কেবলমাত্র এদেশে প্রচলিত মুসলমান সমাজকে উপর থেকে দেখে সবকিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমরা আগের সবগুলি আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি ভারতীয় মুসলমান সমাজে সঠিকভাবে অনুসৃত না হলেও ইসলাম নারীর হাতে কতকগুলি শক্তিশালী অধিকার দিয়ে দিয়েছে। এই অধিকারগুলি হলো ১. পিতার সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তি ২. বিবাহকালেই দেনমোহরের অর্থ প্রাপ্তি ৩. স্বামী গৃহে স্বোপার্জিত অর্থ সম্পূর্ণভাবে নিজ আয়ত্তে রাখার অধিকার ৪. নিজের ও সংসারের অন্যান্যদের আর্থিক দায়দায়িত্ব থেকে নারীকে মুক্তিদান। ইসলামের দেওয়া নারীর এই অধিকারগুলি সমাজে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হলে একজন বিবাহ বিচ্ছিনা মুসলিম নারীর কোন অর্থনৈতিক সংকট উপস্থিত

---

১. আলকোরআন—সুরা ত্বালাক আয়াত : ৭

হওয়ার কথা নয়। সমগ্র ইসলামী আইনটি পর্যালোচনা না করে বিচ্ছিন্ন ভাবে একটি নীতি নিয়ে হৈচৈ করার মধ্যে দিয়ে কোন মানব কল্যাণ হতে পারে না।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ প্রাপ্তি স্বীকৃত হলেও, বাবা মৃত্যুর আগে অন্যের নামে সম্পত্তি উইল করে গেলে হিন্দুকন্যা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় হিন্দু পিতা সম্পত্তি উইল করে যান। তাই আইনতঃ অধিকার স্বীকৃত হলেও হিন্দু কন্যা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতই রয়ে যান। আমরা 'উত্তরাধিকার ও অংশবণ্টন' পরিচ্ছেদে দেখেছি উইল করে কোন মুসলিম কন্যাকে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যায় না। ইসলামী আইনে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বিবাহিত মহিলা, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা কিংবা বিধবা মহিলা খোরপোশ পাওয়ার অধিকারিণী।

দ্বিতীয়তঃ বিবাহকালে প্রাপ্ত দেনমোহরের অর্থ স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ হিসেবে গচ্ছিত রাখা ইসলামের স্বীকৃত নীতি। তৃতীয়তঃ দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী কর্তৃক অর্জিত আয়ে স্বামী বা সংসারের অন্য কারও বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। স্ত্রী উপার্জনশীলা হলেও স্বামী তাঁর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য। অর্থাৎ ইসলামী আইনমতে চললে স্ত্রীব স্বোপার্জিত অর্থের সামান্যতম ব্যয়ও হয়না। তাই কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ অবধারিত হয়ে পড়লেও ইসলামী আইন মতে কোন নারীর অর্থসংকটে পড়ার আশংকা থাকে না।

ইসলাম পুরুষের জন্য সম্পর্কহীনা নারীব ভবণপোষণ বহন কবার বিরোধী। সামাজিক পরিচ্ছন্নতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখাব জন্যই এরকম একটি সুদূব প্রসারী বিধান ইসলামে অনুসৃত। বঙ্গীয় সমাজে এককালে উচ্চ-বিত্তদের মধ্যে একাধিক সম্পর্কহীনা মহিলাদের ভরণপোষণ, ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি উচ্চ মর্যাদার স্মারক হিসেবে প্রচলিত ছিল। পরিবর্তে তাঁবা ঐসব মহিলাদের যথেচ্ছ ভোগ করতেন। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল একটি বিশেষ রক্ষিতা সমাজ। আজও সমাজের বুক থেকে এই রক্ষিতা সমাজের অস্তিত্ব মুছে যায়নি। মুসলমান সমাজে এই ধরনের রক্ষিতা প্রথা কোনদিন ছিল না এখনও নেই। বিবাহবিচ্ছেদের পর যে নারীর সঙ্গে কোন দাম্পত্য

সম্পর্ক রইল না তার ভরণপোষণ বহনের মাধ্যমে কি আমরা সেই রক্ষিতা প্রথার এক নবতম রূপ প্রচলন করার পথেই পা বাড়িয়ে দেব না ? তাছাড়া এটি নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠারও বিরাট পরিপন্থী। যার সঙ্গে একত্রে জীবনযাপন করাই সম্ভব হলো না, তারই অনুগ্রহের দানে সারাজীবন বাঁচতে হবে এটা কোন মর্যাদাসম্পন্না নারী স্বীকার করে নিতে পারেন না। একজন মর্যাদাসম্পন্না নারীর কাছে এরকম অনুগ্রহ গ্রহণ অপমৃত্যুর সামিল।

পৃথিবীর কোন মুসলমান দেশেই নারীর খোরপোশের নির্ধারিত সীমানা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। সবদেশই ইদ্দত কালকেই বাধ্যতামূলক সীমানা হিসাবে গণ্য করে। ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে স্ত্রীর প্রাপ্য খোরপোশের সময়সীমা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মূল বক্তব্য হলো বিচ্ছেদের পর স্ত্রী যতদিন না পুনর্বিবাহ করবেন ততদিন খোরপোশের অর্থ পাবেন। যদি সারাজীবন বিবাহ না করেন, তবে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ব স্বামী এ অর্থ দিতে বাধ্য থাকবেন। খোরপোশের এই সময়সীমাকে কেন্দ্র করেই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর মূলে রয়েছে ভারতীয় আইনের ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫, ১২৬, ১২৭ ধারা। ১২৫ ধারা মূলতঃ ৪৮৮ নং ধারার একটি সংশোধনী আইন। ঐ মূল ৪৮৮ নং ধারাতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী খোরপোশ পেতেন না। কোন বিরোধের পরিণতিতে মুসলমান স্বামীর কাছে স্ত্রী খোরপোশ দাবি করলে স্বামী ঘোষণা করে দিতেন যে তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এই উদ্ভূত পরিস্থিতিকে রোধ করার জন্যেই পরবর্তীকালে ঐ ৪৮৮ নং ধারাটিকে সংশোধন করে সৃষ্টি হয়েছে ১২৫ ধারা। ১২৫ নং ধারার ব্যাখ্যায় সংযোজন করা হয়েছে Wife includes a women who has been divorced and has not re-married. অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পুনর্বিবাহ না করা পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবেন। ইসলামী নীতির সঙ্গে ১২৫ নং ধারার বক্তব্যের বিরোধ এখানেই। ইসলাম কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া স্ত্রীকে স্ত্রী বলে গণ্য করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্জিতা স্ত্রীর জন্য পূর্ব স্বামী সম্পূর্ণরূপে পরপুরুষ। তাকে আর স্ত্রী কল্পনা করাটাও ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ বিশেষ। কোন আইন

কোন ভাবেই একজন মহিলার জন্য একজন পর পুরুষের উপর ভরণপোষণের দায় দায়িত্ব চাপাতে পারে না। সেজন্যই ইসলামী আইন বর্জিতা স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর ভরণপোষণের দায়িত্ব চাপায়নি।

অতএব দেখা যাচ্ছে আসল বিরোধ খোরপোশ দেওয়ার বা পাওয়ার ব্যাপার নিয়ে নয়, বিরোধ নীতির। কেউ তিনমাসের খোরপোশ পেল, না তিন বছরের পেল তা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন নৈতিক বিরোধ নেই। যাঁরা মনে করেন এই খোরপোশ দেওয়ার ভয় থেকেই মুসলমানগণ এর বিরোধিতা করেন তাঁরা দারুণ ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। আসলে বর্জিতা স্ত্রীকে স্ত্রী গণ্য করার ভারতীয় আইনের সঙ্গে ইসলামী নীতির বিরাট বৈষম্য হল মূল বিরোধ। এই জীবন ব্যবস্থা স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে অমুসলিম সম্প্রদায় সেটি অনুধাবন করতে পারছেন না। সেইসঙ্গে তথাকথিত মুসলিম প্রগতিপন্থীগণও একই ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন। তাঁরা অনেকে এ নিয়ে সুরা বাকারার ২৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতেও উদ্যোগী হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে একজন ইসলামী আদর্শে আস্থাবান মানুষের কাছে এঁদের এই উদ্যোগ এত হাস্যকর যে এ নিয়ে বিতর্কে যাওয়াও লজ্জাজনক। এঁরা অনেক কষ্ট করে খোঁজখবর করে অনেক মুসলিম দেশের উদাহরণও সংগ্রহ করেছেন। অথচ তালাক তথা বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর ঐ স্ত্রীর পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবেন এমন বিধান কোন মুসলিম দেশে আছে কিনা খোঁজ নিলেই বিষয়টি তাঁদের কাছে পরিষ্কার হতো। খুবই স্পষ্ট করে জানা দরকার ইসলামের সর্বশেষ সংস্কারক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ), চার খলিফার শাসনাধীন মুসলিম বিশ্ব, আব্বাসীয়, উমাইয়া খলিফাদের শাসনকাল এবং বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৪০টি মুসলিম দেশের কোথাও এমন বিধান নেই যে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত কালের পরেও পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্বামীরই স্ত্রী গণ্য হবেন। এটি ইসলাম ধর্মের মৌলিক আদর্শ বিরোধী। ভারতীয় আইনের ১২৫ ধারার সঙ্গে এটাই হলো মুসলমানদের আসল বিরোধ। বিবাহ বিচ্ছিন্না স্ত্রীর আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিচ্ছেদকালে এককালীন নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইন তৈরী হলে মুসলমানদের আপত্তি করার ব্যাপার থাকত না। সুতরাং যাঁরা একথা ভাবেন যে ১২৫

ধারার বিরোধীরা প্রত্যেকেই মৌলবাদী সংকীর্ণমনা, তাঁরাও বিষয়টির মৌলিক দিকটি বুঝতে না চাওয়ার ব্যাপারে মৌলবাদী। কোন মুসলমান নারীর পক্ষে এটা ভাবারও অবকাশ নেই যে ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি পূর্ব স্বামীরই স্ত্রী গণ্য হবেন, যতদিন না অন্য স্বামী গ্রহণ করেন। যে ধর্মে নারীপুরুষ উভয়ের জন্যই চারিত্রিক বিশুদ্ধতা রক্ষা ধর্মাচরণের অঙ্গ—সে ধর্ম এরকম নিয়ম তৈরী করতে পারেনা। এবং সে ধর্ম প্রকৃতই যাঁরা পালন করতে চান তাঁরা এরকম জীবনব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন না। আসলে অত্যন্ত সুচতুরভাবে মূল বিষয় এড়িয়ে খোর-পোশের মানবিক দিক নিয়ে অহেতুক শরীয়ত, মৌলবাদ ইত্যাদির দোহাই দিয়ে সমগ্র সমাজকে বিভ্রান্ত করার একটা ঘৃণ্য চেষ্টা চলছে।

এই চক্রান্ত থেকে নিজেকে ও সমাজকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে হবে নারীদেরই। ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ টাকা খোরপোশের দাবি উঠুক ক্ষতি নেই, কিন্তু চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও ঐ স্বামীর স্ত্রী গণ্য হওয়ার কল্পনা নিয়ে বাঁচার মত হীন দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কখনই যুক্তি গ্রাহ্য হতে পারে না। এই মানসিকতার ফসল থেকেই একদিন সমাজে জন্ম নিয়েছিল রক্ষিতা প্রথা যা আজও গ্রাম শহরে ছড়িয়ে রয়েছে। জন্ম নিয়েছে অসংখ্য জারজ সন্তান। সুতরাং ভারতীয় আইনের ১২৫ নং ধারাটি কোন ভাবেই মুসলমানদের গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। প্রাথমিক ভাবে ১২৫ ধারার সঙ্গে ইসলামী মতবাদের এটাই মূল বিরোধ, এরপর দেখতে হবে সারাজীবন খোরপোশ দাবীর মধ্যে ইসলামের কোন মৌলিক বিরোধ আছে কিনা।

পুনঃবিবাহ না করা পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোশ ঃ

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি তালাক দাতা স্বামীর সঙ্গে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি। আজীবন খেরেপোশ প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কি এবং নারীজীবনে তার গুরুত্ব কতটা সেটাই এখন আমরা দেখব।

পবিত্র কোরআনে বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা সম্পর্কে যে সব নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে তা আগেই আলোচিত হয়েছে। ভারত ব্যতীত পৃথিবীর কোন মুসলমান দেশ বা অন্যান্য দেশের কোন পণ্ডিতগণের মধ্যে এ ব্যাপারে বিশেষ বিতর্ক দেখা যায়নি। ভারতে এ প্রসঙ্গে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত হয়েছে। এখানে নারীদের সারাজীবন বা পুনঃবিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় ভরণপোষণ বহন করা তালাক দাতা স্বামীর বিশেষ দায়িত্ব, সর্ব-সাধারণের মধ্যে এমন একটা ধারণা তৈরীর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতিকে এর জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। সূরা বাকারার ২৪১ নং এই আয়াতটি হলো: ওয়া লীল মোতাল্লাকাতে 'মাতাউন'[১] বিল 'মাআরুফে'[২] হাক্কান আলাল মোত্তাকীনা।" অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা নারীদিগকে প্রথামত ভরণপোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য। (২ঃ২৪১)[৩]

এই আয়াতের বক্তব্যকে অনেকেই পূর্ব স্বামীর উপব আজীবন খোর-পোশের দায়িত্ব বলে মনে করেন। তবে এ পর্যন্ত কোরআনের যে সকল ভাষ্য পৃথিবীতে গৃহীত হয়েছে এবং যে সকল বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা (তফসীর) করেছেন তারা কেউই এমন কোন ব্যাখ্যা এই আয়াত সম্পর্কে করেননি। এমনকি আরব অনারব সহ পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান সমাজ যে 'তফসীরে বাইদ্বাবীকে' সকল বিতর্কের উর্ধ্বে সর্বতোভাবে গ্রহণীয় বলেছেন তাতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এধরনের আভাস নেই। ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু প্রগতিপন্থীর এই আয়াত সম্পর্কে যে ধারণা দেখা যাচ্ছে তার কোন সমর্থন বিগত দেড় হাজার বছর যাবৎ কোরআনের কোন ব্যাখ্যাকারের দ্বারা কল্পিত বা উচ্চারিত হয়নি।

ঐ আয়াতে বিশেষ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ রয়েছে। একটা হলো 'বিল মাআরুফে', অন্যটি হলো 'মোত্তাকীন।' বিল মাআরুফে' অর্থ হলো প্রথামত বা নির্ধারিত নিয়ম ও বিধিমত। বিশ্বব্যাপী কোরআনের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে এ নিয়ে কোন বিতর্ক বা মতপার্থক্য নেই। মোত্তাকীন শব্দের অর্থ হলো

১. খোরপোশ, ভরণপোষণ বা ভোগ্যবস্তু তথা জামাকাপড় ইত্যাদি।
২. ইদ্দত পর্যন্ত।
৩. আল কোরআন সূরা বাকারা আয়াত ২৪১।

'সাবধানী'। সাবধানী বলতে আল্লাহ্‌র ও রাসূলের নিয়মনীতি পালনের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সীমা রক্ষা করা বোঝান হয়। এই সাবধানতা ও সীমা রক্ষা করার বিষয়টি সমগ্র মুসলমান নর-নারীর জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা যে কেবলমাত্র তালাক দাতা স্বামীকে বোঝান হয়, এমন ধারণা আদৌ সংগত নয়। আবার স্বামী ছাড়া অন্যকাউকে বোঝানর ধারণাও ঠিক নয়। এটা সর্বস্তরের মানুষের জন্য একটি বহুমুখী সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সতর্ক বাণী। তবু এই উপমহাদেশে বিষয়টি নিয়ে বহু বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ নং ধারাটি যে কোরআনের পরিপন্থী নয় তা প্রমাণের জন্যও হাস্যকরভাবে এই আয়াতকে অবলম্বন করা হচ্ছে। এ সবই মারাত্মক ভ্রান্তি।

সামর্থানুসারে কারো উপর খোরপোশের বোঝা চাপান যেতেই পারে। কোন তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি সত্যই নির্দোষ হন ও স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হন সেক্ষেত্রে স্বামীর সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খোরপোশ বাবদ ক্ষতিপূরণ ধার্য করা যেতেই পারে। কিংবা কোন তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি একান্তভাবে আশ্রয়হীনা ও অসহায়া হয়ে পড়েন এবং তালাকদাতা স্বামীর যদি যথেষ্ট সামর্থ্য থাকে তাহলেও খোরপোশ বাবদ এককালীন ক্ষতিপূরণ ধার্য করলে অন্যায় কিছু নেই। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আজীবন ভরণ-পোষণের কম বা বেশীও হতে পারে। কিন্তু কখনই তালাক অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছিনা স্ত্রীকে মাসোহারা দেওয়া নৈতিক দিক থেকে গ্রহণীয় নয়। তেমনি পূর্বতন স্বামীর কাছ থেকে মাসোহারা প্রাপ্তি কোন মহিলার জন্য সম্মানজনকও হতে পারে না।

অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখা যায় মুসলমান সমাজের যে স্তরে বিবাহবিচ্ছেদের আধিক্য দেখা যায় সেই নিম্ন স্তরে আজীবন মাসোহারা প্রাপ্তির সুযোগ এক চরম অব্যবস্থা ডেকে আনছে। এমন অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা দারিদ্র্যভারে জর্জরিত। কন্যার পূর্বতন স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মাসোহারা তাদের কাছে একটা আর্থিক সুরাহার আকারে পরিণত হচ্ছে। পাছে এই আর্থিক সহায়তা বন্ধ হয়ে যায় এই আশংকায় অনেক অভিভাবকই তালাক প্রাপ্তা কন্যার পুনঃ বিবাহ দিতে চান না। তালাক প্রাপ্তার পুনঃ বিবাহ

করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই সকল অভিভাবকই তখন বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ান। অনেক অভিভাবক এমনও আছেন যারা কন্যাকে যথেচ্ছ অশ্লীল জীবনযাপন করতে ঠেলে দেন অথচ পুনঃ বিবাহে বাধা সৃষ্টি করেন এই ভেবে, যে বিবাহ হলেই পূর্ব স্বামীর কাছ থেকে মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার অনেক পুরুষও এমন আছেন যে আজীবন মাসোহারা দেওয়ার যথেচ্ছ সুযোগ গ্রহণ করেন, এই সকল পুরুষ গোপনে বর্জিতা স্ত্রীর সঙ্গে সংযোগ রাখার সুযোগ নেন এবং মাসোহারার বিনিময়ে গোপনে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে দেহভোগ করেন। এভাবে সমাজে জন্ম নেয় রক্ষিতা প্রথা। তাই ইসলাম ধর্ম চূড়ান্ত ত্বালাক হয়ে যাওয়ার পর ঐ স্ত্রীকে কোন ভাবেই স্ত্রীর মর্যাদায় রাখার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এরকম কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাছাড়া এই ভাবে আজীবন খোরপোশ বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও নারীদের অনেক বেশী স্বেচ্ছাচারী হতে সাহায্য করে। বিরোধ উপস্থিত হলে বিবাহ পরবর্তী জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে অনেক বেশী ধৈর্য্যশীলা ও সহনশীলা হয়ে সংযত ভাবে বিবাহিত জীবনকে টিকিয়ে রাখায় সাহায্য করে।

ত্বালাকদাতা স্বামীর কাছ থেকে মাসোহারা গ্রহণ আইনসিদ্ধ হলে এগুলির যে কোন একটি পরিণতি দেখা যাবেই। এর কোনটিই সুস্থ জীবনযাত্রার চিত্র নয়। সবগুলিই মানুষের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র অর্থাৎ একটি সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা এতগুলি ন্যায়নীতি বর্জিত সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করতে চলেছি। ইসলামের আবির্ভাবের যুগে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামাজিক অনাচার বন্ধ করে ইসলামী নীতিই এক নিষ্কলুষ সমাজব্যবস্থা তৈরী করেছিল। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষ কেউই নৈতিক অধঃপতনের শিকার হতো না, যে সমাজে রক্ষিতা-প্রথা উচ্ছেদ হয়েছিল, যে সমাজ জারজ সন্তানশূন্য হয়েছিল। তাই এমন কোন বিধান ইসলাম রচনা করেনি যার ছিদ্রপথে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিতে পারে। সেজন্যই ইদ্দত কালের পরে চূড়ান্ত বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর পূর্বতনস্ত্রীর সঙ্গে কোন আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কই ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি চরম গর্হিত ও নীতিহীন কাজ।

এই মূল দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখে দাবি আদায় বা খোরপোশ পাওয়ার বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। মনে রাখতে হবে খোরপোশ না দেওয়াটাও আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘনের মত পাপ আবার আল্লাহ্‌র বিধানের সীমারেখার বাইরে খোরপোশ চাওয়াটাও সমান পাপ। এই উভয় কাজই ধর্মাচরণের মতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং খোরপোশ চাওয়ার ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীসমাজকে সীমা রক্ষা করতে হবে, সাবধানী হতে হবে। আবার পুরুষ সমাজকে খোরপোশ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সীমারক্ষাকারী ও সাবধানী হতে হবে। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে ভারসাম্য রক্ষার দ্বারা সীমারক্ষা করে চলা সর্বস্তরের মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। •

ইসলাম তার নিজস্ব রূপরেখায় যে মহিমাময়ী নারীর স্বরূপ রচনা করেছে তা কোন দেশের বা সমাজের আইনের সমকক্ষ নয়। মুসলিম নারী হবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী যা বিশ্ব নারী সমাজকে আকৃষ্ট করবে। তাই ইসলাম ধর্ম বিশ্বের কোন নারীপ্রগতির অনুকরণের মাধ্যমে মুসলিম নারীর সমৃদ্ধ হওয়ার বিষয় মোটেই গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। যে কোন দেশে যে কোন আইন তৈরী হতে পারে তাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর কোন মাথাব্যাথা থাকার কথা নয়। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে সচেতন করেছে ইসলাম বিরোধী কোন আইনের সুযোগ গ্রহণ না করতে। ইসলাম প্রদত্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে ইসলামের রূপরেখার মাধ্যমেই নারীর অধিকারের সংগ্রাম করা সম্ভব। মুসলমান নারীদের মূল্যবোধ অর্জনে সচেতন হবে। সমগ্র নারী সমাজের সামনে তাকে শোষণ মুক্ত এক মহিয়সী নারী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে পার্থিব জীবনের পরে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে সকল প্রকার কৃত কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সেই স্থায়ী জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি হয়, এমন কোন পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে নিজেকে যুগের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রেখেই মুসলমান নারী হিসেবে নিজেকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পর পূর্ব স্বামীর কল্পিত স্ত্রী থাকার মত ঘৃণ্য প্রথা ও আইনকে পরিহার করে চলতে হবে।

॥ ইসলামে নারীর পারিবারিক স্বাধীনতা ॥

ইসলাম ১৪০০ বছর আগেই নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অস্ত্র নারী-সমাজের হাতে তুলে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে কন্যার উপর পিতার সর্বময় কর্তৃত্বকেও খর্ব করতে ইসলাম পিছপা হয়নি। নারীসমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সকল মানবিক অধিকারকে ইসলাম মেনে নিয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক যে নারীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গী কোন সন্দেহ নেই তা পশ্চিমী তুনিয়ার চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মানুষেব অবস্থানগত স্বীকৃতি নির্ভর করে মানসিক গতিপ্রকৃতির উপর। ইসলাম প্রথমতঃ স্বীকার করে নিয়েছে মনোগত কাঠামোর দিক থেকে নারীপুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক। পশ্চিমী ধ্যানধারণায় ইসলামী চিন্তার দ্বিতীয় পার্থক্য হলো ইসলাম কখনই নারীকে পুরুষ বিদ্বেষী করে তুলতে চায়নি। কিংবা পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেনি। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়ের স্ব স্ব ক্ষেত্রে মানবিক অধিকার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেছে।

ইসলাম পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কারও ক্ষমতা কিছুটা সীমিত করেছে —কাউকে দিয়েছে কিছুটা উচ্চাসন। যে কোন সংগঠন তৈরী ও সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষা করতে হলে বিভিন্ন পদমর্যাদার ব্যক্তি তো দরকার। পরিবারও একটি সংগঠন—সেখানে বিভিন্ন পদমর্যাদাব ব্যক্তিতো থাকবেই। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউ অপর কারও পদমর্যাদা পেতে পারেনা। পুত্র কন্যা যদি বাবা-মার প-মর্যাদা পেতে চায় তাহলে যেমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, স্বামী যদি স্ত্রীর পদমর্যাদা পেতে চায়, বা স্ত্রী যদি স্বামীর পদমর্যাদা পেতে চায় তাতেও তেমনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেরই রয়েছে পৃথক মর্যাদা, পৃথক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কোন বিভাগীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সমান অধিকার দাবি করলে যেমন সরকার চলেনা পরিবারও তেমনি চলেনা—ভেঙ্গে পড়ে। পারিবারিক জীবনের ভিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক, সমাজ ছন্নছাড়া হোক

তা ইসলাম ধর্মের কাম্য নয়। ইসলাম বিবাহ করা, মা হওয়া, সন্তান পালন করার ব্যাপারে নারীমনে কোন অনীহা, বিতৃষ্ণা কিংবা ঘৃণার অনুপ্রবেশ ঘটায়নি। অন্যদিকে দেখি আধুনিক নারীআন্দোলন তথা পশ্চিমী দুনিয়ার নারীস্বাধীনতা সম্পর্কে চিন্তাধারার মূল বক্তব্য এটাই। ইসলাম চায়না এমন সমাজ গড়তে যেখানে অবিবাহিত নারীদেহ লোলুপ মানুষের দল বিনা-ব্যয়ে তাদের শিকার সংগ্রহ করবে। তেমনি ইসলাম নারীকেও এমন আদর্শ নিয়ে তৈরী হতে শিক্ষা দেয়নি যে তারা তুচ্ছ আত্মঅহংকারের দ্বন্দ্বে বিচার বিবেচনাহীনভাবে স্বামীপুত্রকন্যা ত্যাগ করে চলে যাবে। কিংবা কন্যাকে এমন আদর্শে তৈরী হওয়ার নির্দেশ দেয়নি যে ধনাঢ্য অথবা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করার উদগ্র কামনায় নিজ পিতামাতার সদা-জাগ্রত শুভাকাঙ্ক্ষাকে পদাঘাত করে চলে যাবে। তেমনি পিতাকেও ক্ষমাহীন হওয়ার আদর্শ শেখায়নি।

স্বামীপুত্রকন্যা প্রত্যেকের খণ্ড খণ্ড অস্তিত্ব নিয়ে প্রতিনিয়ত ভাঙাগড়ার খেলা, পিতার উপর আস্থাশীল নির্ভরতার নির্বাসন, মাতা কর্তৃক সদ্যোজাত শিশুহত্যা, গর্ভপাত এসব অশুভ ঘটনাকে ইসলাম ডেকে আনেনি। কি করুণ চিত্র যেখানে দৈনিক ১০০টি শিশুসন্তানের ৪০টি জন্মায় অবৈধ সন্তান হিসেবে। এইসব অবৈধ শিশুদের পিতৃপরিচয়ের কোন ঠিকানাই নেই। আর এই হতভাগ্য শিশুদের মায়েরা যেহেতু কোন সুস্থ, সুখী, ভালোবাসার নীড়ে এদের জন্ম দেয়নি তাই জন্মদাত্রী হিসেবে কোন কোমল অনুভূতি তাদের মধ্যে থাকেনা। তাই জন্ম দেওয়ার আগেই অনাগত শিশুর জন্য অনাথাশ্রমের সন্ধান করে। জন্ম দিয়েই কর্তব্য শেষ করে। আর কোনদিনই তাদের খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব তারা নেয়না।

আমাদের নারীআন্দোলন তাই হওয়া উচিত নারীর সুরক্ষা-আন্দোলন। পশ্চিমী দুনিয়ার যে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাধারা সামাজিক ক্ষেত্রে এক সূচীভেদ্য অন্ধকার আর অস্থিরতা ডেকে এনেছে তা সর্বতোভাবে পরিহার করা দরকার। পৃথিবী জুড়ে আজ অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান, পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদের কারণে গৃহহারা, স্নেহহারা পুত্রকন্যাদের কান্না। পিতামাতার যে অপরিমিত লাগামহীন স্বাধীনতাবোধ নিজ সন্তানের প্রতি কর্তব্যকেও

ভুলিয়ে দেয়—সে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি যদি ঘটেও তাতে কোন্ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটে ? সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি নারীপুরুষের অধিকারের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রাস্তা, ফুটপাথ জুড়ে ছন্নছাড়ার দলে পরিণত হয় তাহলে কি লাভ সে স্বাধীনতায়। সমাজ যদি না বাঁচল স্বাধীনতা পেয়েই বা দাঁড়াবে কোথায় মানুষ।

নারীপুরুষ পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে পরস্পরের সহযোগিতা-তেই গড়ে তুলতে পারে সুস্থ সমাজ। তাদের সুস্থ সহবস্থানের মধ্য দিয়েই পরিবার তথা সমাজের আত্মজাগৃতি সম্ভব। যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সুখী গৃহকোণ। যে গৃহকোণ স্নেহ-প্রেম-মমতায় নিটোল হয়ে পৃথিবীর স্বর্গোদ্যান গড়তে পারে।

নারীআন্দোলন তাই হওয়া দরকার নারীগণেরই আন্দোলন। পুরুষের লালসাময় উৎসাহ নারীআন্দোলনের পিছনে যাতে কাজ না করে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে এমনি এক শুচি সুন্দর গৃহ পরিবেশ যেখানে নারী সর্বময় কর্ত্রী যেখানে নারীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশুর জীবন গড়ার গুরু দায়িত্বের আধিকারিণী। ইসলাম নারীর হাতে দিয়েছে সংযত সুখী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলার এক সুমহান দায়িত্ব। নারীর এই দায়িত্ব সার্থক ভাবে পালনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত নারী স্বাধীনতা ও উন্নত ভবিষ্যৎ রচনার মূল মন্ত্র।

তাই ইসলামের দেওয়া এই অধিকারকে বাস্তবায়িত করে মুসলিম নারীকে গৃহ ভিত্তিক কাজের পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। তাকে নৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে এক উজ্জ্বল জাতির জননী হতে হবে। তবেই হবে প্রকৃত অর্থে নারীর স্বাধীনতার সুন্দরতম প্রকাশ।

।। পারিবারিক সম্পর্ক ঃ একটি বিশ্বসমস্যা ।।

বর্তমান শতাব্দীতে পারিবারিক সম্পর্কের সমস্যাটি একটি জটিল আকার ধারণ করেছে। আমাদের দেশের পারিবারিক কাঠামো দ্রুত ভাঙনের পথে। টুকরো টুকরো পরিবারে স্বামী-স্ত্রী পুত্রকন্যার মধ্যেও যে তীব্র সমস্যাগুলি দেখা দিচ্ছে এবং তার থেকে জন্ম নিতে চলেছে যে বিরাট সামাজিক অন্ধকার তা শুধুমাত্র সভা, সেমিনার বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা দূর হওয়ার নয়। সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে।

বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা নারীজাতির মর্যাদাগত অবস্থার পরিবর্তন। ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত চমকপ্রদ পরিবর্তন কমই দেখা যায়। আমাদের সামাজিক কাঠামোর ভিত স্বরূপ ছিল শান্তির নীড় যে পরিবার, যে বিবাহ প্রথা ছিল মানুষের উদগ্র কামনা, আসক্তি ও স্বৈর্যের অভাবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ, যে নৈতিক অনুশাসন মানুষকে বর্বরতা থেকে রক্ষা করত, সেখান থেকে আমরা পৌঁছুলাম সভ্যতা ও শিষ্ঠাচারের জগতে। দ্রুত পট পরিবর্তনের প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বচিন্তায় সেই শিষ্টাচার ও নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ লাগল। হোক না তা মেকী, অন্তঃসারশূন্য।

আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছি। সভ্যতা বিকাশের স্বর্ণযুগে বসে আমরা কি দেখছি? দেখছি নূতনতর এক হাহাকার, সমাজের এক নিরুদ্ধ কান্না সারা পশ্চিমী দুনিয়ার আকাশ বাতাসকে মথিত করে তুলছে। সেখানে দ্রুত ভেঙে পড়ছে পারিবারিক বন্ধন—দাম্পত্য-জীবনের স্থায়িত্ব চরম অনিশ্চিয়তায় পূর্ণ। যুবসমাজ বিবাহিত জীবনের দায়দায়িত্ব থেকে কৌশলে পাশ কাটাতে চাইছে; নারীর মা হতে অনিচ্ছা, সন্তানের প্রতি পিতামাতার মমতা শূন্যতা, ভালোবাসার পরিবর্তে সাময়িক কামনা চরিতার্থ করার নেশা, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমানতা, অবৈধ শিশুর জন্মহারের দ্রুততম বৃদ্ধি—এত সব সমস্যায় পশ্চিমী সমাজ আজ জর্জরিত। সেখানকার বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদগণ তন্নতন্ন করে খুঁজে চলেছেন এ সংকট

থেকে নিষ্ক্রমণের পথ। তাঁদের এই উদ্বেগ কিন্তু আমাদের এতটুকু ভাবাচ্ছে না। আমরাও চলেছি পশ্চিমী সভ্যতার সেই সর্বনাশা আকর্ষণের দুর্নিবার টানে।

অনেকে মনে করেন উষ্ণ পারিবারিক বন্ধনের অবসান ও ধ্বংসই হলো নারী সমাজের স্বাধীনতা ও অবাধ মুক্তির ফসল। তাঁরা মনে করেন এই মুক্তি শিক্ষা সভ্যতা ও শিল্পভিত্তিক জীবনের পরিণতি। এটা ইতিহাসেরই একটি শক্তি—এর কোন পরিবর্ত নেই—এ ঘটবেই। তাঁদের মতে এ অব্যবস্থা ও হাহাকারকে আমাদের মেনে নিতে হবে। পারিবারিক জীবনের যে উৎকর্ষ ও মর্যাদা ছিল অতীত দিনের জীবনের মূল স্রোত—তাকে চিরকালের জন্য ভুলে যেতে হবে।

কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না এই নিশ্চেষ্ট নেতিবাচক চিন্তা ধারা। অস্বীকার করার উপায় নেই যে পাশ্চাত্ত্যের শিল্পবিপ্লবই পারিবারিক বন্ধনের উপর আঘাত হেনেছিল এবং আজও তা ফল্গু স্রোতের মত কার্যকরী। কিন্তু পারিবারিক জীবনের ভারসাম্য ও শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতায় আঘাত হেনেছিল আরও দুটি কারণ।

প্রথমতঃ ইউরোপে নারীদের জন্য আদিম, পীড়নমূলক ও অন্যায় আইন প্রচলিত ছিল। বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত এই আইন কার্যকরী ছিল। ইউরোপে নারীজাতির অধিকার কত সীমিত ছিল তা পরিমাপ করা যায় এই ঐতিহাসিক দলিল থেকে যে ইউরোপে মাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আইনগতভাবে সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয়তঃ যাঁরা সেদিন নারীজাতির উন্নতি বিধান এবং তাদের মর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা উদ্দাম বহির্মুখীতাকেই নারীজাতির মুক্তির মাইলস্টোন হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। নারীর অধিকার বঞ্চিত করা ইউরোপের অতীত আইন এবং তাদের মুক্তির জন্য নূতন সংশোধনী উভয়েই এই বিশৃঙ্খলার জন্য অনেক বেশী দায়ী!

মুসলমান সমাজের এই সভ্যতার পদানুসরণ করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকা উচিত। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহময় হাতছানিতে আকৃষ্ট হয়ে, তাদের পঙ্কিল পথে পদচারণা করে নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনা হবে।

পশ্চিমী জীবনযাত্রার সর্বনাশা চেহারা সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। তাদের আবিষ্কৃত, বিজ্ঞান অর্জিত, শিল্প ও প্রযুক্তি কৌশলের বিভিন্ন উপায় উপকরণ ভোগ, চর্চা ও অনুশীলন করতে গিয়ে আমরা যেন তাদের উদ্দাম জীবনযাত্রার শিকারে পরিণত না হই। তাদের সামাজিক প্রথা, অভ্যাস বিশেষ করে সামাজিক আইন অনুকরণের মোহ যেন আমাদের পেয়ে না বসে। মনে রাখতে হবে সামাজিক আইনগুলিই পাশ্চাত্ত্য সমাজের অগণিত দুঃখ-যন্ত্রণার উৎস।

সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র কর্তব্য রয়েছে। কারও কর্তব্য বিস্মৃত হওয়ার মধ্যে মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেনা—নারীরও নয়, পুরুষেরও নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে নিজ কর্তব্যে অবহেলা দেখানোর মধ্যেই যেন মানুষ গর্ববোধ করে। পুরুষের মধ্যেও অধিকাংশ সংসার পরিবার পরিজনের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা ঘটিয়ে চরম বহির্মুখী হয়ে চলেছে। নারীও পুরুষের সঙ্গে স্বাধিকারের দ্বন্দ্বে মেতে উঠে উদ্দাম বর্হিজীবনকে মনে করছে মুক্তির চরম প্রকাশ। তাই বর্তমানকালের অধিকাংশ নারী উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা অতি উচ্চাভিলাষের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে সংসারজীবনকে মনে করেন উটকো ঝামেলা। এরকম একটা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে গিয়ে মেয়েরা ভুলে যাচ্ছেন কেবলমাত্র মুক্তির মধ্যেই নারীর মোক্ষ নেই, নেই পরম আনন্দ। কারন নারী কেবল একটি ব্যক্তিত্বই নয়—নারী একজন ভবিষ্যৎ নাগরিকের মাতা। যে ভাবী নাগরিক সুস্থ সুন্দর হয়ে গড়ে উঠলে—একটা জাতির সমৃদ্ধ বিকাশ ঘটে। এখানেই নারীসমাজের সর্বোচ্চ গৌরব যে তাদের হাতে সৃষ্টি হয়, গড়ে ওঠে গোটা জাতি। প্রতিটি নারী যদি নিজ সন্তানকে সুস্থ আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারেন তাহলে সেই ভবিষ্যৎ পুরুষ কিভাবে নারীর প্রতি অত্যাচারী হয়ে উঠবে। এই ইতিবাচক লক্ষ্য সামনে রেখে একটি সুস্থ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে সমাজকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। এটাই প্রকৃত সুস্থ সভ্য সচেতন মানুষের লক্ষণ।

।। শিক্ষা ও মুসলিম নারী ।।

জ্ঞানের আলো ব্যতীত সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে তাই জ্ঞান অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনের প্রথম বাক্য, বিশ্বমানবের কাছে বিশ্বস্রষ্টার সর্বপ্রথম বাণী হলো 'একরা' অর্থাৎ পড়। মূর্খতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব অন্তরকে আলোকিত করার একমাত্র পথ জ্ঞান অর্জন করা। এজন্যই বিশ্বমানবকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের প্রথম শিক্ষাই হলো 'পাঠ কর'। বিশ্বমানবের প্রতি বিশ্ব স্রষ্টার সর্বপ্রথম দানও হলো ইলম বা জ্ঞানের আলো। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে, "এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলি ফেরেশ-তাদের সামনে প্রকাশ করলেন ও বললেন, "এগুলির নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (২ ঃ ৩১)[১]

আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত [২] প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষাগ্রহণ করে।" এখানে জ্ঞান ও কল্যাণকে একে অপরের পরিপূরক বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান সেখানেই কল্যাণ নিহিত। পৃথিবীর ইতিহাসও সেই সাক্ষ্যই দান করে। যে জাতি শিক্ষায় জ্ঞানে যত উন্নত সেই জাতি তত সমৃদ্ধ। জ্ঞানই মানুষকে বিংশ শতাব্দীর কমপিউটর বিজ্ঞানের জগতে পৌঁছে দিয়েছে।

বিদ্যাশিক্ষা ও অজানাকে জানার সেই অদম্য স্পৃহা নিয়েই শুরু হয়েছিল নবকলেবরে ইসলামের জয়যাত্রা। জ্ঞানে বিজ্ঞানে চরম উন্নতি ঘটিয়ে মুসলমানগণ পৃথিবীর মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। প্রতিটি মসজিদ হয়ে উঠেছিল জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র। ধর্ম ও শিক্ষা ইসলামে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ইসলাম শুধুমাত্র পারলৌকিক মুক্তিপথের দিশারী

---

১. আল কোরআন—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৩১

২. ১১৫ পৃষ্ঠার ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

হয়ে মধ্যযুগের সূচীভেদ্য অন্ধকারে আসেনি, পার্থিব জীবনের অন্ধকার ঘোচানোর আলোকবর্তিকা নিয়েও এসেছিল। জ্ঞানই আলো—শিক্ষা ঘোচায় মানুষের মনের অন্ধকার। মূর্খতার সেই অন্ধকার ঘোচানোর স্বীকৃতি কোরআনের ঘোষণায় পাওয়া যায়, "শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" অর্থাৎ অজানাকে জানার সাধনাও ধর্ম সাধনা।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সারা জীবনে বারবার শিক্ষার সুমহান আদর্শ এবং শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ করে সে আল্লাহর পথে চলে।" তিনি আরও বলেছেন, "স্বর্গেমর্ত্যে যা কিছু আছে এবং অতল জলে যে সকল মৎস বিরাজ করে, সকলেই শিক্ষিত লোকের জন্য প্রার্থনা করে।" সমাজে শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত রাখার জন্য কোরআনে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "বিশ্বাসীদিগের সকলের অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। ওদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হোক। অবশিষ্টরা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক…।" (৯ঃ ১২২)[১]

শিক্ষা ব্যতীত ইসলাম সার্থকভাবে মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে না। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) শিক্ষাকে এতদূর মর্যাদা দিয়েছেন যে, বলেছেন, "এক ঘণ্টা শিক্ষা ও বিজ্ঞানের নির্দেশ শ্রবণ করা এক সহস্র শহীদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান অপেক্ষা এবং এক সহস্র রাত্রি উপাসনা অপেক্ষা প্রশংসনীয়।" বোখারী শরীফের একটি হাদিসে আছে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ জ্ঞানানুসন্ধানীকে পরম সুখের অধিকারী করেন, প্রতি পদক্ষেপে সে পায় পবিত্রতা, প্রতিটি অনুশীলনীতে তার জন্য আছে চরম পুরস্কার।" হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) জাতির উপকারের জন্য জায়েদ বিন সাবেতকে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "যে বিদ্যা ও বিদ্বানকে সহযোগিতা করে আল্লাহ্‌তাআলা পরকালে তার সহায় হন।"

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার

---

১. আল কোরআন—সূরা তাওবা—আয়াত ১২২

দিয়েছেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্বের যুদ্ধে যে সব শিক্ষিত মানুষ যুদ্ধবন্দী হয়ে আসত, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁদের সঙ্গে শর্ত করেছিলেন মুসলমানদেরকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে তারা স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে ইসলাম সর্বপ্রকার নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করে নারীজাতির মর্যাদা ঘোষণা করেছিল! ঘোষণা করেছিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে নরনারীর পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকারের বাণী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিক্ষা সর্বত্র নরনারীর অংশ গ্রহণ হয়েছিল স্বীকৃত। শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) শিক্ষাক্ষেত্রে নরনারীর পার্থক্য নির্দেশ তো করেননি বরং বলিষ্ঠ ঘোষণা করেছেন, **ত্বালাবুল এলমে ফারী-দ্বাতুন আলা কুল্লে মুসলেমিনা ওয়া মুসলেমাতিন**। অর্থাৎ 'প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।'

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর এই ঘোষণার বাস্তব সাক্ষর রয়েছে তাঁর সময়ের মহিলাগণের পাণ্ডিত্যে। ইসলাম তার বিকাশের প্রাথমিক যুগেই জন্ম দিয়েছিল অসংখ্য বিদুষী নারীর। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। বিখ্যাত সাহাবীগণও ছিলেন তাঁর ছাত্র। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন জ্ঞানে মহিয়সী, উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্না ও স্বচ্ছ সাবলীল বাচন ভঙ্গীর অধি-কারিণী। হযরত উম্মেসালমা ছিলেন ইসলামী শরীয়তের নিয়মনীতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষক ও গবেষক। ইসলামের বিখ্যাত আইনবিদগণের মধ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ), কন্যা হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ), জয়নাব বিনতে আবি সালমা, শিমা প্রভৃতি নারীগণের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানপিপাসা সঞ্চারিত হয়েছিল সর্বস্তরের নরনারীর মধ্যে। হযরত রুবাইয়া বিনতে মুআউবেয বিন আফরা (রাঃ)-এর কাছে হযরত আব্বাস ও হযরত জয়নাল আবেদীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যেতেন।

ইমাম রাবেয়া ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর শিষ্য ছিলেন ইমাম মালেক ও হাসান বসরী (রাঃ)। রাবেয়া মসজিদে মসজিদে কোরআন

হাদিসের অর্থ ও ব্যাখ্যা শোনাতেন। হযরত হাফসা (রাঃ) শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ), হামযা বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ), হারেসা বিন ওয়াহাব (রাঃ), আবদুর রহমান বিন হারেস এবং নারীদের মধ্যে সাফিয়া বিনতে আবু ওবায়দা, উম্মে মুবাশ-শারা আনসারী (রাঃ) প্রভৃতি তাঁর ছাত্রছাত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-র খেলাফতকালে মদিনার বাজার ছিল লায়লা বিনতে আব্দুল্লাহ্ নামীয়া একজন মহিলার তত্ত্বাবধানে। তৃতীয় খলিফা ওসমান (রাঃ)-র নির্বাচনের সময় ফাতেমা বিনতে কায়েস সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পালিতা ভগ্নী শিমা (রাঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। হযরত হোসেন (রাঃ)-এর কন্যা সাকিনা সে যুগের সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ পারদর্শিনী ছিলেন।

খলিফা হারুণের সহধর্মিণী 'জোবায়দা'র নাম শিক্ষা ও সমাজসেবার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বাগদাদের ক্যাথিড্রাল মসজিদের বিপুল জনসমাবেশে ফখরুন নেসা অলংকার ও কাব্য সাহিত্যের উপর বক্তৃতা করতেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে ওলামাগণের সমান পদমর্যাদা পেয়েছেন। জাতুল হেমা, যিনি জেমা নামে পরিচিতা, অসাধারণ সাহসিনী ছিলেন। তিনি বহু যুদ্ধে নেতৃপদে অধিষ্ঠিতা থেকে সম্মানীয় সামরিক পদে উন্নীত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সমভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। পৃথিবীর শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) নারীর পদমর্যাদা উন্নত করে পক্ষপাতশূন্য ভাবে স্বীকার করেছেন তাদের স্থান সাধনাকে।

অথচ এই বিংশ শতাব্দীতে মুসলমান নারীর অশিক্ষা, মূর্খতা ও পশ্চাৎ-গামীতার জন্য দায়ী করা হয় ইসলামকে। বিশ্বমানবের মহান নেতা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উক্তি, কোরআনের ঘোষণা প্রমাণ করে এই ধারণা কত ভ্রান্ত। ইসলামই নারীকে মধ্যযুগের চরম অবমাননা ও অন্ধকারময় জীবন থেকে নিষ্ক্রান্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল অসাধারণ মর্যাদায়। বিংশ শতাব্দীতে সেই মুসলমান নারীর ভারতীয় উপমহাদেশে এই করুণ পরিণতি কেন? কে বা কারা এর জন্য দায়ী?

ভারতের মুসলিম ইতিহাসও বহু বিদুষী নারীর জীবনকথায় সমৃদ্ধ।

এঁরা হলেন রাজিয়া, চাঁদবিবি, নূরজাহান জাহানারা, জেবুন্নেসা প্রভৃতি। প্রথম দুজন নারী ছিলেন সম্রাজ্ঞী। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনাও করেছেন। চাঁদবিবি মোগল সম্রাট আকবরের সৈন্যবাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। নূরজাহান ছিলেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাত্রী। তিনি একবার এক বিদ্রোহের সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে জাহাঙ্গীরকে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন। সম্রাট হুমায়ুনের ভগ্নী গুলবদন বেগম ছিলেন প্রতিভাময়ী লেখিকা। তিনি তাঁর ভ্রাতা হুমায়ুনের এক অপূর্ব জীবনী রচনা করেন। শাজাহান কন্যা জাহানয়ারাও ছিলেন বিখ্যাত কবি।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, 'বিদ্বানের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা উত্তম।' তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, "চীন দেশেও যদি জ্ঞান বিজ্ঞান পাওয়া যায়, সেখানে তা অন্বেষণ কর।" তিনি বলেছেন, "নবীগণ রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা ত্যাজ্য সম্পত্তি রূপে রেখে যাননি, তাঁরা রেখে গেছেন জ্ঞান। সুতরাং যে তা অর্জন করে, সে প্রভূত সৌভাগ্য অর্জন করে।" তিনি আরও বলেছেন, "জ্ঞানসন্ধানীকে স্বর্গে স্বাগত জানাবে স্বর্গীয় দূত।" "বিদ্বানের বক্তব্য শ্রবণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষা ধর্মচর্চা অপেক্ষা শ্রেয়…এবং সহস্র শৃঙ্খলিতকে মুক্তিদান অপেক্ষা উত্তম।"

মধ্যযুগে ইসলাম নারীকে সর্বক্ষেত্রে যে সম্মান দানে মহিমান্বিত করেছিল আজও কোন নীতি তা পারেনি। হযরত (সাঃ)-এর যুগে নারী পুরুষের সঙ্গে গৃহ, সমাজ, যুদ্ধক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্র, সর্বত্র সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। নারী সমাজের শোচনীয় দুর্গতি ও অবমাননা বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে করেছিল মর্মাহত, বিচলিত। তাই তাঁর জীবনের একটি মহান শিক্ষা হলো 'নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।' তিনি অসম্মান অবমাননায় ক্ষতবিক্ষত নারীকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে ঘোষণা করলেন, "মাতার পদতলে স্বর্গ।" বললেন, "নারী স্বামীগৃহের সর্বময় কর্ত্রী।" হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর এই জীবন-দর্শন খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ও অনুসৃত হতো।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল বাহক ছিলেন সে যুগের নারীসমাজ।

আব্বাসীয় যুগে খায়জুরাণ, ওয়ালিয়াহ, জোবেদা এবং বুরাণ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আবুল ফারেজ এসপাহানি বর্ণনা করেছেন 'জোবেদা মোসতাসিমের যুগে নৈতিক উৎকর্ষে ও অগাধ পাণ্ডিত্যে মহিয়সী ছিলেন। মোতাওয়াককিলের সময় ফাজেলা ছিলেন বিখ্যাত কবি। সাকিনা ও সাহুদা ছিলেন ধীশক্তি সম্পন্না নারী। তাঁরা বাগদাদে ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। জয়নাব ও উম্মুল-মোয়াইয়াদ ছিলেন আইনজ্ঞা নারী। আবুল ফারেজ কন্যা বিখ্যাত কবি সম্মানে ভূষিতা ছিলেন।

মুসলিম স্পেনের নারীগণও অন্দর মহলে আবদ্ধ ছিলেন না। স্পেনের সাহিত্য একদিন নাজহুন, জয়নাব, হামদা, হাফসা, আলকালাইয়াহ, সাফিয়া ও মারিয়ার রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই সময়ে মহিলা সাহিত্যিক, কবি ও ডাক্তারের অভাব ছিলনা। অল্ ওয়ালেদার' গৃহ ছিল সে যুগের বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞ, কাব্যকার ও বিদ্বানদের আলোচনাস্থল। আলআরিজা ছিলেন নাম করা বৈয়াকরণিকা ও অলংকারিকা। হাফসা ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিকা। সিভিলির মরিয়ম ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষিকা। তিনি অলংকার ও কাব্য-সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। আসমাল আম্বিয়াহ, উম্মুল হিনা, ইমতিয়ার-রামিকিয়া এবং বুসিনা প্রভৃতি মহিলা সে যুগের নারীশিক্ষার কর্ণধার হিসেবে প্রখ্যাত ছিলেন।

ভারতের মধ্যযুগেও অভিজাত মুসলমান পরিবার শিক্ষাদীক্ষায় ছিলেন অত্যন্ত অগ্রসর। বিশেষতঃ অভিজাত অবাঙালী মুসলমান পরিবার মেয়েদের অশিক্ষার কথা চিন্তাই করতেন না। অশিক্ষার ঘনায়মান অন্ধকার গ্রাস করেছিল মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মুসলমানদের। আর বাঙালী মুসলমানদের ব্যাপারটি অন্ধকারের আরও এক ধাপ উপরে। এখানে অভিজাত পরিবারগুলিও মেয়েদের উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞান কিংবা উন্নত ধর্মীয় শিক্ষা থেকেও সযত্নে দূরে রেখেছিলেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, নুরুন্নেসা খাতুন, শামসুন নাহার প্রভৃতি প্রখ্যাত মহিলাদের শিক্ষালাভের জন্য সংগ্রামমুখর জীবন অভিজাত বাঙালী মুসলমান পরিবারে নারী শিক্ষা সম্পর্কে এককালের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ই বহন করে। যে ইসলাম ধর্মের অনুসারী তাঁরা, সে ধর্মে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা

হয়েছে তা ভেবেও দেখেননি। নিজেদের অপরিসীম অজ্ঞানতার বেড়াজালে এ উপমহাদেশের মুসলমান পুরুষ সমাজ ইসলামের প্রাথমিক যুগের সর্বাত্মক শিক্ষা আন্দোলনে নারী সমাজের অংশগ্রহণের ইতিহাস ভুলে গেলেন। প্রতিটি মসজিদ একদিন পরিণত হয়েছিল শিক্ষাকেন্দ্রে, গড়ে উঠেছিল অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল হেকমাত' (বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র)। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ এই সমৃদ্ধ পূর্ব-পুরুষের উত্তরাধিকারী হিসেবে তেমন কোন ভূমিকা পালন করেনি; নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তো উল্টোটাই করেছে। নারীজাতির শোচনীয় দুর্গতি ও অবনতিতে ব্যথিত, মর্মাহত মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছিলেন, "মাতার পদতলে স্বর্গ, নারী তাঁর স্বামী গৃহের সর্বময় কর্ত্রী ও প্রেরণাদায়িনী।" তাঁর অন্যতম মহান শিক্ষা ছিল 'নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।' এত শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও যাঁর পদতল স্বর্গ সেই ভাবি জননীকে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ চরম মূর্খতার অন্ধকারে বিসর্জন দিয়েছিল। সেই অশিক্ষা আর মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মাতৃক্রোড়ে যে সন্তান লালিত হলো—তারাও অশিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়েই তুললো! বিংশ শতাব্দীতে যখন পৃথিবীর সমস্ত সমাজনেতা ও চিন্তানায়কগণ সমাজ ও শিক্ষাজীবনে নারী-জাতির অগ্রগতির কথা ভাবছেন তখন মুসলমান সমাজের এক শ্রেণীর নেতা ও সমাজ দরদীর দল নবী (সাঃ), তাঁর শিক্ষা ও তাঁর যুগকে ভুলে গিয়ে নারীদের যাতে শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠান না হয় তার জন্য জেহাদ শুরু করেন। অর্থ না বুঝে কোরআন পাঠই নারীর একমাত্র শিক্ষায় পরিণত হয়। আত্ম-শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় অর্জন করার মত শিক্ষার দ্বার নারীর জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে নারীজাতির জীবন শিক্ষা ও স্বাধীনতার অধিকার বঞ্চিত চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। একমাত্র ইসলামী সমাজই ছিল এই অভিশাপ থেকে মুক্ত। মুসলমান ব্যতীত বিশ্বের প্রায় সব জাতিই নারীদের জ্ঞানার্জনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। অন্যদিকে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান মণীষীগণ অসীম উৎসাহ দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের নারীদের শিক্ষার্জনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইসলামের আবির্ভাবই ঘটেছিল নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের

কাছে **'পাঠ কর'**-এই বাণী নিয়ে। স্বয়ং হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে অসাল্লাম সকল অনুগামীকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশের মধ্যে নারীপুরুষের কোন পার্থক্য চিহ্নিত হয়নি। তৎকালীন মুসলমান নারীগণ জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। জ্ঞানার্জনের জন্য সবরকম দুঃখ কষ্ট ও প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন মনীষীর বক্তৃতা শুনেছেন; নিজেরাও জনসমক্ষে বক্তৃতা করেছেন।

ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে তৎকালে বহু পণ্ডিত মহিলার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনার জন্য দেশের বিভিন্ন অংশ থেকেই পণ্ডিত ব্যক্তি বর্গের সমাবেশ ঘটত। আরবের বিখ্যাত জীবনীসাহিত্যগুলি থেকে অসংখ্য বিদুষী মহিলাদের জীবনী পাওয়া যায়। প্রখ্যাত জীবনীকার এবনে সাআদ তাঁর 'তাবাক্কাত' গ্রন্থে ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম তিন শতকের প্রায় দুশত বিদুষী মুসলিম মহিলার জ্ঞানসাধনা ও জীবনী সংযোজন করেছেন। এবনে আসাকীর (১১০৫—১১৭৫ খ্রীঃ) দামেস্কের হাদিস-বেত্তাগণের জীবনীর উপর আশি খণ্ডের এক অভূতপূর্ব জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনি আশীজন মহিলা শিক্ষিকাকে উৎসর্গ করেন। এই আশীজন শিক্ষিকার জীবনী নিয়ে আর একটি পৃথক খণ্ডও তিনি রচনা করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় ঐ বিদুষী মহিলাগণের জ্ঞান সাধনার পরিধি কত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল। বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক এবনে হাযর (১৩৭২—১৪৪৯ খ্রীঃ) তাঁর **'দোররুল কামিনা'** গ্রন্থে অষ্টম হিজরীর ১৭০ জন বিদুষী মহিলার উল্লেখ করেছেন। এঁদের অগাধ পাণ্ডিত্যের কাছে তিনি নিজের ঋণ স্বীকার করেছেন। আল-শাখারী (১৪২৭—১৪৯২ খ্রীঃ) তাঁর **'আল দাউউল লামী'** গ্রন্থে একশত বিজ্ঞ মহিলা শিক্ষিকার কথা বলেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনি নিজেই এঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন। **'উমর বিন ফাহাদ'** তাঁর 'মুজাম আশ শায়উখ' গ্রন্থে ত্রিশজন বিখ্যাত হাদিসবেত্তা মুসলিম মহিলার জীবনী সংযোজন করেছেন। ইতিহাসে পাওয়া যায় বার তেরো হিজরী পর্যন্ত বহু মুসলিম মহিলা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ করেছেন। আরব জীবনীকারগণ এমন বহু মুসলিম মহিলার উল্লেখ করেছেন যাঁদের ডিপ্লোমা বয়ে নিয়ে যেতেই উটের প্রয়োজন হতো।

ইসলাম প্রসারের পর থেকে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা, সাহিত্য,

বিজ্ঞানচর্চা সর্বক্ষেত্রে এক বিশেষ উন্মাদনা জন্ম নেয়। পরিচারিকা, সাধারণ গৃহস্থ পরিবার, শিক্ষিত পরিবার, রাজ পরিবার প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের নারীদের মধ্যেই বিদুষী মহিলার জন্ম হয়। দশম হিজরীর পূর্বে এর হ্রাস ঘটার নজির বিশেষ একটা নেই বললেই চলে। ঐ সময় হাদিসশাস্ত্র অধ্যয়ন ছিল জ্ঞানার্জনের এক বিশেষ শাখা। সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে হাদিসশাস্ত্রে মহিলাগণ বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। বহু পুরুষ পণ্ডিত এই সকল বিদুষীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মোহাম্মাদ বিন ইয়েজিদের এক ক্রীতদাসী ছিলেন—নাম আবিদা। এই ক্রীতদাসী মহিলা মদিনায় হাদিস অধ্যয়ন করে হাদিস শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদিস শাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত 'হাবিব দাহুন' হজ উপলক্ষে একবার মদিনায় আসেন। আবিদার প্রভু তাঁকে ঐ হাদিসবিদের কাছে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। হাবিব দাহুনের মত তৎকালীন বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত আবিদার জ্ঞান ও শিক্ষার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বিবাহ করে স্পেনে নিয়ে চলে যান। রাজ পরিবারের মহিলাগণও বিলাসবৈভব ছেড়ে জ্ঞানার্জনের দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছিলেন। সোলায়মানের কন্যা জয়নাব তৎকালীন বিখ্যাত হাদিসবিদ-গণের অন্যতমা ছিলেন। আহম্মাদ কন্যা শাহুদা কৈশোরেই ক্যালিওগ্রাফি (হস্তলেখা) বিদ্যা, ইসলামী বিজ্ঞান ও হাদিসে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বহু গ্রন্থের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করতেন। এই মহিলা শিক্ষা-জগতে এত খ্যাতিসম্পন্না হয়ে ওঠেন যে ঐ সময় বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁর শিষ্যত্বের দাবি করতেন। সপ্তম হিজরীতে ফখরুদ্দিনের কন্যা উম্মেহানী মরিয়ম বাল্যকালেই সমগ্র কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন। তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য সহ একাধিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'ফাতেমা আল ফুদায়লিয়া' নামে এক আরব মহিলা ক্যালিওগ্রাফি, ইসলামী বিজ্ঞানসহ একাধিক বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। নিজ পড়াশোনার জন্য তিনি বাড়ীতেই বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। ঐ সময় বহু আরব মহিলাই বিজ্ঞান, আরবী ব্যাকরণ, কোরআনের ব্যাখ্যা, ফেকাহ ও হাদিস শাস্ত্র, ভূমিরাজস্ব ও ইসলামের বিধি বিধানের উপর জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা করতেন। বিশ্বখ্যাত ভ্রমণকারী এবনে বতুতা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তিনি নিজে দামেস্ক শহরে মোহাম্মাদের কন্যা আয়েশা এবং কামালুদ্দিনের কন্যা জয়নাবের বক্তৃতা শুনতেন। এইভাবে ইসলামের উদার

শিক্ষানীতি সমগ্র ভূভাগে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের উন্মাদনার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। অথচ সেই সময় ইসলামী সাম্রাজ্য ছাড়া পৃথিবীর সকল প্রান্তে নারীদের জীবন লাঞ্ছনা ও দুর্দশায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলছিল। নারীর গুমরানো কান্না আকাশবাতাসকে ভারি করে তুলছিল।

পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশের ফতোয়া প্রদানকারীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রচুর নারী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু এই নব্য শিক্ষিতাদল এক অসত্য ধারণা নিয়ে বহির্জগতে বের হলেন যে ইসলাম তাঁদের স্বাধীনতা ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। বিশেষতঃ বর্তমান শতকের শিক্ষিত মুসলমানমহিলাগণ নিজ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জানার চেষ্টাই করেন না। একবার জানারও চেষ্টা করেন না কে তাঁদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ করেছিল ইসলাম না এ উপমহাদেশের কিছু অ জ্ঞ অযোগ্য সমাজনেতা। অযোগ্যের হাতে পড়ে ইসলামের মহতী আদর্শের এদেশে এই পরিণতি। আজও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের হাজার হাজার গ্রামে মহিলাগণ শিক্ষাবিহীন হয়ে এক করুণ জীবনযাপন করছেন ও অন্যদের জীবনও করুণ করে তুলছেন। অন্যদিকে আধুনিক চলচ্চিত্র-টিভি নির্ভর সংস্কৃতির বিকৃত প্রভাবের জালে জড়িয়ে পড়ছে গ্রামগঞ্জের অশিক্ষিত মেয়েরা। তাদের জীবনে ইসলামী মূল্য-বোধের কোন প্রভাব কোনদিন পড়তে পারেনি। পাখী পড়ানোর মত কোরআন পড়ার মধ্যে তা কোনদিন সম্ভবও নয়। ফলে সমাজে যে দ্রুত ভাঙন আসছে, তা চরম বিকৃতিতে পূর্ণ। সমাজকে এই কলুষ কালিমা থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় উপযুক্ত ইসলামী মূল্যবোধ শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দান। অশিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে সমৃদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কোন প্রভাবই নেই; এ প্রভাব কমবেশী শিক্ষিতা নারীদের মধ্যেও বর্তমানে বিরল প্রায়। ফলে ইসলামে শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষিত মুসলমান সমাজও অজ্ঞ। আসলে মুসলমান সমাজের সবরকম দীনতা, অজ্ঞানতা, সংস্কারাচ্ছন্নতার দায় ইসলামের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই অধুনা প্রগতিশীল শিক্ষিত মুসলমানগণ নিজেদের দায়িত্বমুক্ত হন।

শিক্ষিত মুসলমানদের ইসলামের ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার অবসান ঘটানোর সময় এসেছে। নিজ ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা আর ঘৃণা দ্বারা প্রকৃত সম্মান অর্জন করা যায়না। ইসলামের মহত্তর জীবনাদর্শকে অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত রেখে আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় অর্জন করার মধ্যেই রয়েছে আত্মমর্যাদা।

জন্মনিয়ন্ত্রণ

ভারতীয় মুসলমান সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। দারিদ্র্য ও নানান সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতে সরকারীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। বুদ্ধিজীবীগণ জন্ম নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে তাঁদের মতামত জোরালো ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেগুলি ছিলনা। পৃথিবীর বিভিন্নদেশের মত আরব দেশেও তখন শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি বিভিন্ন পথে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের বোঝা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চাইত। বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এরকম হত্যার প্রয়োজন ঘটেনা—পূর্ব থেকে জন্ম ও মাতৃজঠরে ভ্রূণের অস্তিত্ব সৃষ্টিই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আরবদেশের ব্যাপক শিশুহত্যা প্রথাকে ইসলাম সেইযুগে তার কঠোর নৈতিক অনুশাসন ও মানবিক নীতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করেছিল। শিশুহত্যার মত নিষ্ঠুর ঘটনা ও সামাজিক অনিষ্ট থেকে সমাজ এবং মানবতাকে রক্ষার জন্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ মানুষকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, "ওয়ালা তাকতোলু আওলাদাকুম মিন এমলাক্বিন।" অর্থাৎ "দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি।" (৬ঃ ১৫১)[১] পবিত্র কোরআনে শিশু-হত্যা সম্পর্কে এই যে নিষেধাজ্ঞা তা আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সেটাই বিবেচ্য। কারণ আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে সন্তান হত্যা ও ভ্রূণহত্যার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ এই পদ্ধতিতে সন্তানের অস্তিত্বই সৃষ্টি হয়না। জনসংখ্যা সীমিত রাখার জন্য কোরআন হাদিস থেকে কোন সমর্থন মেলে কিনা সে সন্ধান করে আধুনিক যুগে নিজেদের পন্থা ঠিক করতে হবে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এদেশে মানুষ সবসময়ই শিশুসন্তানের জীবন নিয়ে আতঙ্কিত থাকে। চিকিৎসাবিদদের মধ্যেও ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া এই আশংকার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁরাও দুটি

---

১. আল কোরআন—সূরা আনআম ঃ আয়াত ১৫১।

সন্তানের পরই ছোটটি পাঁচবছর হওয়ার আগে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণে দম্পতিদের বাধা দেন। তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি অনুসরণের উপদেশ দেন। এই একই আশংকায় বহু পিতামাতা তিনটির বেশী সন্তানের পর তবেই জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেন। আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে যে স্থায়ী ও অস্থায়ী কোন পদ্ধতিতেই শিশুহত্যা কিংবা ভ্রূণহত্যার ব্যাপার ঘটছে কিনা। দেখতে হবে এরকম ক্ষেত্রে হাদিস কিংবা কোরআনে কোন সমর্থন মেলে কিনা কিংবা বাধা দেওয়া হয়েছে কিনা।

যাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে তাঁরা নিজেদের সপক্ষে যে হাদিসটি ব্যবহার করেন তা হলো "বিবাহ কর স্নেহময়ী ও ফলপ্রসূ নারীকে যাতে অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।" ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর এই বাণী যথেষ্ট যৌক্তিকতা পূর্ণ। সে সময় সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুগামী বৃন্দের। কিন্তু অন্যান্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্য কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সকল উক্তি করেছেন সেখান থেকে এ ব্যাপারে কতটা সমর্থন মেলে আমাদের বিচার করা প্রয়োজন।

বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ ও দার্শনিক আমীর গাজ্জালী উল্লেখ করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন : "ছোট পরিবার সমৃদ্ধির প্রতীক, বৃহৎ পরিবার কষ্টের আকর।" আর একটি হাদিস থেকে জানা যায় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলেছিলেন : "২০০ বছর পরে পারিবারিক দিক থেকে কম ঝঞ্ঝাট পূর্ণ মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন।" এখানে কম ঝঞ্ঝাট পূর্ণ বলতে হযরত (সাঃ) কম সংখ্যক সন্তান সন্ততিকেই কি বোঝাননি ? অন্য এক সাহাবী কথিত একটি হাদিস থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন, "তোমরা চাইলে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পার ; কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক সৃষ্টি হওয়া (আল্লাহ্ তাআলার নিকট) নির্ধারিত রয়েছে তার প্রত্যেকটি লোক অবশ্য জন্মলাভ করবে।" এই হাদিস থেকে এটাই ইঙ্গিত মেলে যে যত সংখ্যক মানুষ সৃষ্টি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত আছে তা জন্মাবেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অন্যতম সাহাবী হযরত জাবির বলেছেন, "হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময় কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কালে আমরা

আযল [১] করে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ্ এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে শুনেও কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করেননি ; কিংবা সে সময় কোরআনেও এ সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়নি।”[২]

এই হাদিসটি থেকে এটুকু অন্ততঃ পরিষ্কার হচ্ছে যে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপরে কোন নিষেধাজ্ঞা সে সময় জারী হয়নি। নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল শিশুহত্যা ও ভ্রূণহত্যার উপরে। আমাদের ইসলামী শাস্ত্র অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে কোন্ পর্যায়ে ভ্রূণহত্যা হয়। কোরআনে মানুষের জন্মরহস্য এইভাবে উন্মোচিত হয়েছে, “আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে ; পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে ; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা ; অবশেষে ওকে আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান ! (২৩ : ১২, ১৩, ১৪)[৩]

মানব শিশু মাতৃ গর্ভে কিভাবে ধীরে ধীরে রূপলাভ করে এবং তার দেহে যে প্রথমেই প্রাণ সঞ্চারিত হয়না তা কোরআনই সমর্থন করেছে।

গর্ভপাতকে অনুমোদন করে সর্বপ্রথম রায় দেন হযরত আলী (রাঃ)। তিনি বলেছেন “ভ্রূণ সপ্তম স্তরে পৌঁছানোর আগে কখনই তাতে জীবন সঞ্চারিত হয়না।” তাঁর এই মতকে ভিত্তি করেই ইসলামী আইনবিদগণ বলেন গর্ভসঞ্চারের দিন থেকে পঞ্চম মাসের মধ্য স্তরে পৌঁছে এই সপ্তম স্তর শুরু হয়। এই সময়ের আগে গর্ভপাত শিশুহত্যার পর্যায়ে পড়েনা। হানাফী গোষ্ঠির মতবাদ অনুসারে ১২০ দিনের মধ্যে গর্ভপাত করা প্রাণ হত্যা নয়।

ভারতে সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে একটি আইনগ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থটি হলো ‘ফতোয়া-ই-আলমগিরী’। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একমত হয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। আওরঙ্গজেব রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বক্তব্যের সদর্থক ব্যাখ্যা

---

১. ‘আযল’ বলতে গর্ভনিরোধের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন কালে বাইরে বীর্যপাত করাকে বোঝায়। ২. হাদিস ৩. সূরা মুমেনুন—আয়াত ১২, ১৩, ১৪।

গ্রহণ করেছিলেন, বর্তমান কালেও বহু ইসলামী পণ্ডিত ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইরাণ, টিউনিশিয়া প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুমোদন লাভ করেছে। মায়ের শারীরিক অসুস্থতা জনিত অবস্থায় সৌদি আরবেও জন্ম নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে অনুমোদিত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কোন সমস্যা আবব দেশে এখনও সৃষ্টি হয়নি। এখনও এ সব দেশে জনশক্তি যথেষ্ট কম। তাই সাধারণ ভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এখানে নেই। যাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতিকে মেনে নিতে চাননা তাঁরা কোরআনের এই নিষেধাজ্ঞাকে তুলে ধরেন, "দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা করোনা। আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি।"[১] আল্লাহ্‌র উপর আস্থাবান হলে এই সত্যকে অবশ্যই মানতে হবে যে যত প্রাণীই পৃথিবীতে আসুক না কেন তাদের আহারের দায়িত্ব আল্লাহ্‌ই গ্রহণ করেন। অতএব দারিদ্র্য আর ক্ষুধার চিন্তায় সন্তানের জন্ম রোধ করার চিন্তা নিশ্চয়ই 'আল্লাহ্‌র উপর আস্থাহীনতা প্রকাশ পায়। মানুষের জন্য ইসলামের দেওয়া মুখ্য বিধানগুলির মূল সুর, মানবতার কল্যাণের জন্য যে সকল নৈতিকতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলির উপর ভিত্তি করেই জন্মনিয়ন্ত্রণকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। এছাড়াও লক্ষ্য করতে হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে কোনটি কল্যাণময়—অধিক সন্তান না সীমিত সন্তান। ভারতীয় উপমহাদেশে সকল ধর্মাবলম্বীরই আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীর কাছে সন্তান একটি বিশেষ ভরসা। সন্তান তাদের কাছে ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তা এবং বার্ধক্যের সর্বোত্তম সহায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এই শ্রেণীর মানুষের কাছে সন্তান একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। তাই সাধারণ নিম্নবিত্ত, কায়িক পরিশ্রমই যাদের একমাত্র সম্বল তারা অধিক সন্তান কামনা করেন। এই শ্রেণীর মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব অপেক্ষা জীবনজীবিকার প্রয়োজন অনেক বেশী। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান সমাজ এক চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। অধিকাংশকেই কৃষি ও কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করে জীবনজীবিকা চালাতে হয়। এরা বাস্তব কারনেই

১. আল কোরআন—সুরা আনআম : আয়াত ১৫১

জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি পরিহার করে চলেন—কোন ধর্মীয় কারণে নয়। এই শ্রেণীর আর্থিক অবস্থানই তাদের অনুপ্রাণিত করে জন্মনিয়ন্ত্রণ না করতে। এসব ক্ষেত্রে বাস্তব কারণে মুসলমান জনগণ জন্মনিয়ন্ত্রণকে পরিহার করলেও সাধারণভাবে মনে করা হয় ইসলাম ধর্মের মৌলবাদীদের প্রভাবে তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থেকে দূরে থাকছেন। আসলে যাঁদের উপর এই জনগোষ্ঠির আর্থিক উন্নয়নের দায়িত্ব বর্তায় সেই গোষ্ঠিই এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত হিসেবে মুসলমানদের এভাবে অভিযুক্ত করে দায়িত্ব পালন করেন।

যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি নিষেধাজ্ঞারই নামান্তর হয় তাহলেও তিনি সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারী করেননি কেন সে প্রশ্ন থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে কোনভাবেই স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করেননি। এর পিছনে রয়েছে সর্বকালের জন্য এক সুদূর প্রসারী চিন্তা। এরকম ব্যাপারকে নিষিদ্ধ করে দিলে স্বাস্থ্যগত কিংবা দারিদ্র্য ব্যতীত অন্য কোন সংকটজনক অবস্থা উপস্থিত হলে মানুষের সামনে আরোগ্য লাভের বা মুক্তির কোন পথ থাকত না। বর্তমানে অপুষ্টিজনিত দুর্বল স্বাস্থ্যের মায়েরা অধিক সন্তানধারণের ফলে করুণ অবস্থায় পৌঁছান। এঁরা সকলেই জন্মনিয়ন্ত্রণ চান কিন্তু কখনই স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন না। অধিক সন্তান ধারণের ফলে স্বাস্থ্যহীনতা ও সন্তান লালন-পালনের জন্য যে দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধন তা মাকেই বহন করতে হয়। সেজন্য অধিক সন্তানের জননীগণ স্বাস্থ্য ও লালনপালনের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সাগ্রহে সমর্থন জানান। ইসলাম জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ না করে সর্বকালের নারীজীবনের জন্য সুদূর প্রসারী কল্যাণের ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ্র অসীম করুণার উপর আস্থাশীল মানুষকে দারিদ্র্যের ভয়ে, সন্তানের মুখে আহার তুলে দেওয়ার ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা থেকে নিশ্চয় বিরত থাকতে হবে; কিন্তু নারীকে স্বাস্থ্য ও সন্তান লালনপালনের কঠোর নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ অবলম্বন করাতে ইসলামের কোন বাধা নেই। একথা মনে রেখেই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অবলম্বন করে নারীজীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার মত মানসিকতা তৈরী হওয়া প্রয়োজন। তেমনি মুসলমান

মহিলাগণকেও অন্ধধারণার শিকার না হয়ে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। যাতে তাঁরাও নিজ স্বাস্থ্য ও সুসন্তান তৈরী করার জন্য অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিরতি পেতে পারেন। একটা চরম সত্য ও লক্ষ্য আমাদের সমাজের পুরুষ ও নারী উভয়ের থাকা উচিত যে কেবল সংখ্যায় বাড়লে চলবেনা আমাদের সন্তানদের গুণগত মান বাড়াতে হবে। গুণগত উৎকর্ষের উপরই ধর্ম ও সমাজের অগ্রগতি নির্ভরশীল।

সর্বোপরি আধুনিক কালের জন্মনিয়ন্ত্রণপ্রথা কোনভাবেই শিশুহত্যার পর্যায় ভুক্ত যে নয় এসম্পর্কে মনের জড়তা কাটিয়ে ওঠা দরকার। বিজ্ঞানের অবদান মানুষের কল্যাণ করতে যে সক্ষম তাও স্বীকৃত—পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে "যাকে হিকমত দান করা হয়েছে তাকেই সর্বাধিক দান করা হয়েছে।" প্রাণ হত্যা, প্রাণ নিধন, ভ্রূণ হত্যা ইত্যাদিকে বর্তমান কালের জন্ম নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এক করার যুক্তিকে গ্রাহ্য করার পিছনে বিবেকবানদের সমর্থন থাকা সম্ভব নয়। কারণ আধুনিক কালের জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা কোন ভাবেই প্রাণী হত্যা করা হয়না। এই সকল পদ্ধতি দ্বারা প্রাণ বা প্রাণী কোনটাই সৃষ্টি হয়না। সুতরাং সেখানে স্বাস্থ্যগত বা সামাজিক ও শিক্ষাগত সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা স্বীকার করার মধ্যেই কল্যাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা অনেক বেশী।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যে অবাধ গর্ভপাত ঘটানর পদ্ধতি রয়েছে এবং শল্য চিকিৎসার স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ ইসলামের মৌলিক আদর্শের বিপরীত। গর্ভপাতকে পরিহার করে চলার মধ্যে নারীর শারিরিক ও মানসিক নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত থাকে। মুসলিম মহিলাদের গর্ভপাত ঘটানর মত বিপদজনক পদ্ধতি থেকে বিরত থাকাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য যদি গর্ভ টিকিয়ে রাখতে গেলে গর্ভবতী মায়ের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটানর অনুমতি ইসলাম স্বীকৃত। কায়রো ও মক্কা মদিনার ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট। গর্ভপাত ছাড়া যদি ধর্ম, ও সমাজ সংসারকে সুন্দর ও সুস্থ করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে অস্থায়ী গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে তা ইসলাম সম্মত পন্থার পরিপন্থী হওয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই।